amaj Foundation Chenn

রবীন্দ্র-চর্যা / দেবীপদ ভট্টাচার্য

omain. Gurukul Kangri Co

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

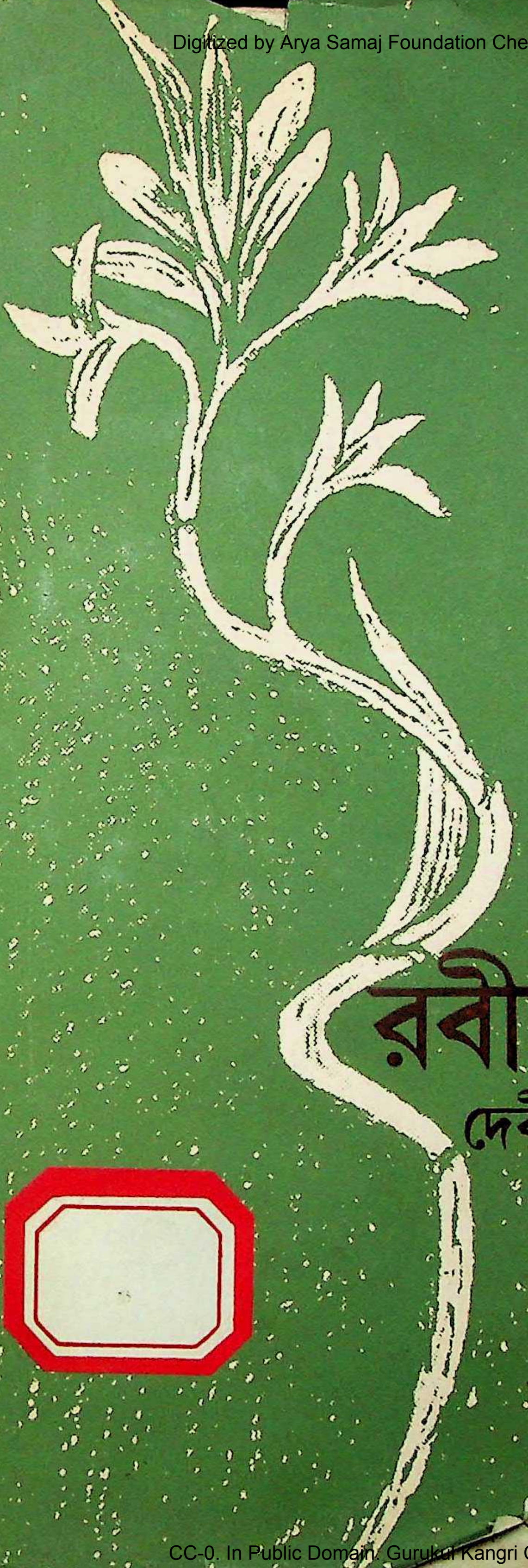

রবীন্দ্র-চর্যা

দেবীপদ ভট্টাচার্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

D 7008

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

बर्ग संख्या......... आगत संख्या..............

पुस्तक—वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब—दण्ड लगेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রবীন্দ্র-চর্যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রবীন্দ্র-চর্যা

DONATION

দেবীপদ ভট্টাচার্য

FORWARDED WITH COMPLIMENTS FROM
THE DEPARTMENT OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলকাতা-৭০০ ০০৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Rabindra-Carya (Essays on Tagore's life & literature.)
by Dr. Devipada Bhattacharya

প্রথম জি. এ. ই. সংস্করণ : রবীন্দ্র-জয়ন্তী ১৩৯২

গ্রন্থস্বত্ব : রেবা ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : বিজন ভট্টাচার্য

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ-এর ক্যাটালগ কার্ডের প্রতিলিপি

৮৯১.৪৪ দেবীপদ ভট্টাচার্য
দেবী/র রবীন্দ্র-চর্যা ; পরিবর্ধিত নূতন সং।
কলিকাতা, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৮৫।
২৭২ পৃ.। চিত্র, প্রতিকৃতি। ২২ সেমি। ৪০·০০

জি. এ. ই. পাবলিশার্স-এর পক্ষে সুনন্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত, বাণী আর্ট প্রেস-এর পক্ষে কালাচাঁদ ঘোষ কর্তৃক ৩১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত এবং মুখার্জী বাইন্ডিং ওয়ার্কস-এর পক্ষে মানস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১২ হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৫ থেকে গ্রন্থিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক
পুণ্যশ্লোক গোপালচন্দ্র মজুমদার
স্মরণে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাসের কথা

বাংলা চরিতসাহিত্য

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান

রবীন্দ্র-চর্যা

সম্পাদিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ

গিরীশ রচনাবলী

শরৎ রচনাবলী

আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ

মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী'

রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লেখকের নিবেদন

'রবীন্দ্র-চর্যা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। প্রকাশক ছিলেন জেনারেল্ প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো জি. এ. ই. পাবলিশার্সের আগ্রহে। এবার তিনটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করা হলো, 'শুন নলিনী', 'অচলায়তন প্রসঙ্গ' ও 'আয়ার্ল্যান্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ'। শেষোক্ত প্রবন্ধটি রচনায় আমার শিক্ষাগুরু প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপদেশ-নির্দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর লিখিত প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হলো।

'রবীন্দ্র-চর্যা' প্রথম প্রকাশিত হলে রোমানিয়ায় বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপিকা আমার প্রাক্তন ছাত্রী ডক্টর অমিতা বসু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য পত্রিকায় (Revista de istorie si teorie literara) 'শকুন্তলা : গ্যেটে, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭৯) এবং 'ডন কুইক-সোট, রবিনসন ক্রুশো ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৮০) প্রবন্ধ দুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রকাশিত Socialist Perspective পত্রিকায় 'মাধবপুরের ধনঞ্জয় ও মহারাষ্ট্রের টিলক' প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Tilak and Tagore' নামে। এই অনুবাদ করেন আমার প্রাক্তন ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী অমিতা বসু ও শ্রীমান্ অমল মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব পালন করে আমার রচনাগুলিকে ভারতে ও ভারতের বাইরে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নলিনী' অর্থাৎ অ্যানা তড়খড়কর-এর ফটোটি আমাকে দিয়েছেন আমার অনুজপ্রতিম প্রখ্যাত সাংবাদিক, রবীন্দ্র-গবেষক শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী এবং অ্যানার মৃত্যুর সার্টিফিকেট এডিনবরা থেকে এনে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা কিটি দত্ত।

'আয়ার্ল্যান্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি রচনার সময় আমার প্রাক্তন ছাত্রদ্বয় অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী ও অধ্যাপক বরুণ দে-র সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ নরেশ গুহ ও স্পেশাল অফিসার দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা দান করেছেন। আমার প্রাক্তন ছাত্র 'রবিজীবনী'র রচয়িতা অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পাল কয়েকটি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট রচনা করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী গ্রন্থাগারিক শ্রীমান্ প্রদীপ চৌধুরী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নানা গ্রন্থ ও পত্রিকাদি দিয়ে প্রভূত সহায়তা করেছেন কলিকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার ভট্টাচার্য, সেন্টার ফর স্যোসাল স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত অরুণ ঘোষ।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ পরীক্ষাকার্যের ও সৌষ্ঠবসাধনের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত সমর নন্দী। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৫ বৈশাখ ১৩৯২ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
১/১ মহারাজা ঠাকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকা

রবীন্দ্র-চর্যার লেখক আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ দেবীপদ ভট্টাচার্য আমাকে তাঁর এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লেখার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এই অনুরোধে পরম পরিতোষ ও আনন্দ অনুভব করেছি ; তার একটু বিশেষ কারণ আছে। 'পুত্রে মিত্রবৎ আচরেৎ' বলে একটি কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অনুরূপ ভাবে বলা যেতে পারত, 'ছাত্রে পুত্রবৎ আচরেৎ'। কারণ এ-জাতীয় কোনো উক্তি প্রচলিত না থাকলেও এ-জাতীয় আদর্শ আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল সক্রিয়ভাবে অনুসৃত হতো। প্রাচীন ভারতীয় গুরুশিষ্য-সম্পর্কের কথা স্মরণ করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এই আদর্শ মধ্যযুগেও বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু আধুনিক কালে ক্রমে ক্ষীয়মান হয়ে বর্তমানে তা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অবলুপ্ত। কেন এমন হলো তা শিক্ষানায়কদের বিবেচ্য। শ্রীমান্ দেবীপদর জীবনচর্যায় এই আদর্শের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ করেছি তার ছাত্রাবস্থা থেকেই। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইস্কুলের পড়া শেষ করে কলেজ-জীবনের প্রথম পর্বেই সে আমাকে অলক্ষিতে তার প্রতি আকর্ষণ করে নিল। তখন তার বয়স পনের-ষোল বছরের বেশি নয়। শুধু তাই নয়, সে যে কখন আমাদের পরিবারে পাকাপাকি ভাবে নিজের স্থান করে নিল তা বোঝাই গেল না। তার অফুরন্ত জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি, এই দু-এর মিলিত জাদুশক্তিতেই সে যেন এক নূতন আত্মীয়তার মায়াজগৎ তৈরি করে নিল। উত্তরকালে সে নিজে যখন শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত তখনও তার ব্যক্তিত্বের জাদুক্রিয়া নিবৃত্ত হয়নি, যে ছিল আদর্শ ছাত্র সেই এখন আদর্শ শিক্ষক। এটা আমার পক্ষে বিশেষ পরিতৃপ্তির বিষয়।

রবীন্দ্র-চর্যা গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে আমার মনে যে এসব কথা ভিড় করে এলো, তার মূলে আছে আমার অন্তরের একটি গভীর বেদনা। সে কথাটা একটু খুলে বলা প্রয়োজন। শিক্ষাজগতের সঙ্গে আমার পরিচয়ের পরিধি খুব সংকীর্ণ নয়। দৈবক্রমে আমাকে বারবার স্কুল-কলেজ বদলাতে হয়েছে। তিনটি স্কুল, তিনটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এই সাতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমাকে বহু ছাত্র ও শিক্ষকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। অতীতের দিকে তাকিয়ে আমার সুদীর্ঘ ছাত্রজীবনের কথা যখন স্মরণ করি তখন পরম বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, আমার এই বহুসংখ্যক সহপাঠীর মধ্যে মাত্র তিন-চার জনের জীবনে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পেরেছে। অথচ আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রখর ধীশক্তি ও মেধার অধিকারী আর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের সাফল্যেও তাঁরা খ্যাতিমান্ হয়েছিলেন।

শিক্ষক হিসাবে আমার নিজের অভিজ্ঞতার চিত্রও ভিন্ন প্রকার নয়। প্রায় চার দশক-ব্যাপী শিক্ষক জীবনে শতশত ছাত্র এসে চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথে। তাদের অনেকের মধ্যে জ্ঞান নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয়ও পেয়েছি। কিন্তু তাদের প্রায় সবাই ভেসে গেছে ব্যর্থতার স্রোতে। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা যাদের জীবনে সার্থক হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাদের সংখ্যার হিসাব নিতে গেলে নৈরাশ্যে ও বিষাদে মন ছেয়ে যায়। গর্বের সঙ্গে নাম করতে পারি আমার এমন ছাত্রের সংখ্যা বোধ করি দশের বেশি হবে না। কেন এই বিপুল ব্যর্থতা? আমার মনে হয় তার প্রধানতম কারণ, অধ্যাপনাকে আমরা গ্রহণ করি জীবিকা হিসাবে, ব্রত হিসাবে নয়। শুধু জ্ঞানদান নয়, চরিত্রদানও যে শিক্ষাব্রতীর অবশ্যকৃত্য সে কথা আভাসেও আমাদের মনে দেখা দেয় না। তাই আমাদের শিক্ষা কিছু পরিমাণে ধনপ্রসূ হলেও জ্ঞানপ্রসূ হয় না আর আমাদের জীবনও চরিত্রমহিমায় ভাস্বর হতে পারে না। এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে আমাদের লক্ষ্যহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা। তারই ফলে "আমাদের দেশে শিক্ষা যতটুকু হয়, পণ্ডশ্রম শতগুণ বেশী হয়"।

তবু যে আমাদের দেশে মাঝে মাঝে প্রতিভার বিকাশ ঘটে তা শিক্ষা-ব্যবস্থার গুণে নয়, তা প্রকাশ পায় আপন শক্তিতে। শিক্ষাব্যবস্থার দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতাকে লঙ্ঘন করেই দেখা দেয় এই বিরলসংখ্যক ব্যতিক্রম। যাদের সহজাত ধীশক্তি আছে অথচ সংগ্রামশক্তি নেই, আমাদের শিক্ষানীতির জারক রসে জীর্ণ ও বিনষ্ট হওয়াই তাদের ললাটলিপি। আমার ছাত্রদের মধ্যে যে-কয়জন নিজের শক্তিতে শিক্ষাকারার প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরের জ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমান্ দেবীপদর স্থানই সকলের পুরোভাগে। ছাত্রের পরিচয়ে শিক্ষকের পরিচয়, এই নীতিসূত্র অনুসারে আমি তাঁর গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। কিন্তু তাতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আমি তাঁকে কাছে টেনে নেবার পূর্বে তিনিই আমাকে আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন নিজের চরিত্রগুণে, আর উত্তরকালে তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানজগতে যে প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছেন তাও অর্জিত হয়েছে তাঁর নিজেরই প্রতিভার শক্তিতে। যদি তাতে আমার কোনো পরোক্ষ প্রভাব থেকেও থাকে তাও হয়েছে তাঁরই আগ্রহে, আমার দানের ফলে নয়। তবে এমন একটি ক্ষেত্র আছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেখানে আমরা উভয়ে সমভাবে মিলতে পেরেছি প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে শিক্ষাজগতের এই চিরস্বীকৃত নীতির ক্ষেত্র।—যে শিক্ষক ছাত্রকে স্নেহ করেন না, মিত্ররূপে গ্রহণ করেন না, তাঁকে শিক্ষকই বলা যায় না, আর যে ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না, হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে না, সেও ছাত্র নামের অযোগ্য। এই আদর্শই আমাদের সম্পর্ককে চিরমধুর করে রেখেছে। আমার পক্ষে এর চেয়ে সার্থকতার বা গৌরবের বিষয় আর কিছু নেই। এই স্নেহসম্পর্কের অভাবে জ্ঞানের আদানপ্রদানের ক্রিয়াটাই ব্যর্থ হয়। যে গাছের গোড়ায় জলসেচ হয় না, শুধু সারসংযোজনের কাজই চলে সে গাছ শুধু নিষ্ফল নয়, নিষ্প্রাণ হতেও সময় লাগে না।

শিক্ষানীতির আর একটি আদর্শ হচ্ছে—'শিষ্যাৎ পরাজয়ম্ ইচ্ছেৎ'। গুরুকে ছাড়িয়ে যাওয়াতেই শিক্ষার সার্থকতা। নতুবা জ্ঞানের অগ্রগতি হবে কেমন করে? শিষ্যের এই অগ্রগামিতাই হওয়া উচিত গুরুর পরম কাম্য, কেননা তাতেই সূচিত হয় তাঁর শিক্ষাব্রতের সার্থক পরিণতি। কিন্তু তার জন্য চাই শিষ্যের মনীষার প্রতি গুরুর আন্তরিক শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। শ্রদ্ধাহীনের যেমন জ্ঞানলাভ হয় না, শ্রদ্ধাহীনের জ্ঞানদানও তেমনি নিষ্ফল হয়। যে-গুরু শিষ্যের মনীষার প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা আস্থাহীন, যিনি তার বিকাশোন্মুখ প্রতিভাকে সযত্নে লালন করেন না, সে গুরুর নীরস জ্ঞানদানের প্রভাবে ওই প্রতিভা একেবারে শুকিয়ে না গেলেও তার বিকাশ বিঘ্নিত হয়। গুরুর পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর কি হতে পারে? আজ আমি সবিনয়ে জানাতে পারি যে, এ অপরাধ আমি কখনও করিনি। ছাত্রদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতেই সচেষ্ট হয়েছি, পরীক্ষা পাসের তথ্যাদি জোগান দেবার কাজ করিনি। প্রমাণ হিসাবে ছাত্রোত্তম শ্রীমান্ দেবীপদর নাম করতে পারি। প্রথম পরিচয়েই বালক দেবীপদর আলাপ-আচরণে যে স্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাবৃত্তি, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও বহুমুখী ঔৎসুক্য লক্ষ করি তাতেই তাঁর প্রতি আমার সস্নেহ শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয়। ফলে তাঁর নিরন্তর সংস্পর্শে আমি বহুলভাবে উপকৃত হয়েছি, বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। শিক্ষা কখনও একতরফা হয় না। যে-শিক্ষক মেধাবী ছাত্রের কাছ থেকেও জ্ঞানসংগ্রহ করতে জানেন না তাঁর শিক্ষাদানও নিষ্ফল হয়। যিনি আজীবন শিক্ষার্থী তিনিই যথার্থ শিক্ষক। তাঁকে প্রয়োজন মতো ছাত্রের কাছ থেকেও নানা বিষয় শিখতে হয়। দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে যেসব ছাত্রের সহায়তায় আমার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, দেবীপদর স্থান তাঁদের সকলের পুরোভাগে। সে প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত আছে। বরং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার প্রকৃত প্রমাণ এই রবীন্দ্র-চর্যা গ্রন্থ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখাই আমার পূর্বপরিচিত। এখন সংকলিত রূপে আবার পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জীবন, মনন ও সাহিত্যের কত বিচিত্র ও স্বল্পালোকিত ক্ষেত্রে লেখকের উৎসুক চিত্র বিচরণ করেছে তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। এই গ্রন্থে এমন একটি প্রবন্ধ নেই যাতে কিছু না কিছু নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট বা পূর্বাগত ধারণা সংশোধিত হয়েছে। তাছাড়া অনেক স্থলে এমন অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করা হয়েছে যাতে রবীন্দ্রনাথকেই নতুন করে চেনা যায়। লেখকের সন্ধানক্ষেত্রও সুবিস্তৃত। স্বদেশ ও বিদেশের নানা সাহিত্য, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট তিনি রবীন্দ্র-তথ্যের জন্য সন্ধান করেছেন। কিছুতেই যেন তাঁর ক্লান্তি নেই। এরকম অক্লান্ত অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষাজগতে বিরল।

এই অশ্রান্ত ও ব্যাপক সন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের দৃষ্টির সামগ্রিকতা ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্য। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়েই এই চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তাছাড়া সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে ইতিহাসদৃষ্টি সমন্বিত হয়ে বইখানিকে একটি রমণীয় অপূর্বতা দান করেছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে এসব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া ভূমিকা-লেখকের কাজ নয়। তবু 'মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ছবির ঘর' বা জীবনস্মৃতি শুধু এ দুটি অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাতেই তাঁর চিন্তার বিচিত্র গতি ও বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাবে। অবিচল তথ্য ও যুক্তি-নিষ্ঠা এই রচনাগুলির আর-একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সব মিলিয়ে একথা বলতে পারি যে, ভাবী রবীন্দ্র-গবেষকদের কাছে এটি একটি অপরিহার্য উৎসগ্রন্থ বলে স্বীকৃত হবে। তাছাড়া স্বচ্ছ চিন্তা ও প্রাঞ্জল ভাষার গুণে সমগ্র বইখানি পড়ে যেতে কিছুমাত্র আয়াসবোধ হয় না। এরকম অনায়াস পাঠ্যতা যে-কোন গবেষণা গ্রন্থের পক্ষেই একটি অতি কাম্য অথচ দুর্লভ গুণ। ফলে সাধারণ পাঠকরাও এই বই পড়ে শুধু যে রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে চেনার সুযোগ পাবেন তা নয়, পাঠস্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দও পাবেন।

এই গ্রন্থকারের রচিত ও সম্পাদিত আরও কয়েকখানি বই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু তাঁর মননশীলতার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে এই বইটিতে, এ কথা আশা করি বিবেচক পাঠকমাত্রই অসংকোচে স্বীকার করবেন। পরিশেষে একটা ক্ষোভের কথাও না জানিয়ে পারছি না। এই বইটিতে রবীন্দ্রনাথের মনন-পরিবেশ ও সাহিত্যকর্মের উপরে নানা দিক্ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নূতন আলোকপাত করা হয়েছে। তাতে আমাদের রবীন্দ্র-পরিচয়ের পরিধি যেমন বিস্তৃততর হয়েছে, তার গভীরতাও তেমনি বেড়েছে। কিন্তু তবু বইখানি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শেষ করে মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। সে অতৃপ্তি শুধু লব্ধ বিত্তের স্বল্পতা-জনিত নয়, সামগ্রিকতার অভাবজনিতও বটে। মনে হয় গ্রন্থকার যদি রবীন্দ্র-নাথের জীবন ও সাহিত্যের কোনো একটি বিশেষ দিক্ নিয়ে সামগ্রিক বিচারে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করতেন তবে কতই না ভাল হতো। আশা করি অদূর-ভবিষ্যতে তিনি আমাদের সে প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন। আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে কি দুর্জেয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর মনের প্রসন্নতা হারাননি, নিজের সংকল্প থেকেও বিচ্যুত হননি। তাই তাঁর কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। এখন তিনি তাঁর মধ্য-জীবনে উপনীত, তাঁর সংকল্পিত কর্মক্ষেত্রও সুপ্রশস্ত। আশীর্বাদ করি তাঁর সব শুভসংকল্প সিদ্ধি হোক, তাঁর সাধনায় বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ হোক। ছাত্রের কৃতিত্বেই শিক্ষক জীবনের চরিতার্থতা। ভাবীকালেও তাঁর কৃতিত্বের ফলে আমার এই চরিতার্থতা উত্তরোত্তর পূর্ণতা লাভ করুক, এই কামনা করি।

॥ রুচিরা ॥ — প্রবোধচন্দ্র সেন

শান্তিনিকেতন

৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার	১
রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবী	১৫
ব্রাইটন ও 'মেদিনা ভিলা'র বাসিন্দা	২২
হেনরি মরলি, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র	২৫
তিন সঙ্গী	
১. লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫-১৯১৫)	৩২
২. প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬)	৬১
৩. আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)	৭৭
'শুন নলিনী'	৯১
শকুন্তলা : গ্যেটে, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ	৯৭
বাল্মীকির কবিত্ব লাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা	১০;
মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ	১১১
ডন কুইকসোট, রবিনসন ক্রুশো ও রবীন্দ্রনাথ	১৩২
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি : বন্ধুর যুদ্ধ	১৩৯
'ছবির ঘর' বা জীবনস্মৃতি	১৪৭
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত	১৫৭
মাধবপুরের ধনঞ্জয় ও মহারাষ্ট্রের টিলক	১৬৭
'অচলায়তন' প্রসঙ্গ	১৭৯
আয়ার্ল্যান্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ	১৮৫
উল্লেখপঞ্জী	২১৭
নির্দেশিকা	২৪১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে বাংলাদেশের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসরে। যে-বৎসরে তাঁর জন্ম সেই ১৮১৭ সালে বাংলাদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অগ্রদূত 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার অন্যতম উৎস এই হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল "the tuition of the sons of respectable Hindus in English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia."[1] সে উদ্দেশ্য বহুলভাবে সার্থক হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)-র পদত্যাগের অব্যবহিত পরে হিন্দু কলেজে কয়েক বৎসর শিক্ষালাভ করেন।[2] প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষা তাঁর জীবনকে সার্থকতা দান করেছে। অন্যদিকে তাঁর মর্ত্যবন্ধন ছিন্ন হয় ১৯০৫ সালে, আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তখন ঘটেছিল। কার্জনী বঙ্গভঙ্গ-বিধানের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল 'স্বদেশী আন্দোলন'। সেই আমাদের বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম যুগ, বিদেশী পণ্য ও শিক্ষালয় বর্জন করে দেশীয় শিল্প তথা 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠন করার যুগ। ১৮১৭ থেকে ১৯০৫ এই প্রায়-শতাব্দীকালের বাংলার ইতিহাস তাঁর জীবনের দুটি প্রান্তকে ধারণ করে আছে। তাঁর জীবনে এই সমগ্র যুগটি নানাভাবে প্রতিবিম্বিত। 'নবজাগরণ' ও 'স্বদেশী আন্দোলন' উভয়ের তাৎপর্যই তাঁর জীবনে ও কর্মে প্রকাশিত হয়েছে।

নিজ-দেশের অতীত সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা শুধু নয়, তার পুনরাবিষ্কার ও নব-মূল্যায়ন নবজাগরণের একটি প্রধান অঙ্গ। 'ভারতপথিক' রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) এই মহৎ কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। উইলকিন্স, উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলসন্ বা প্রিন্সেপের মতো বিদেশী ভারত-তত্ত্ববিদ্‌গণের দানের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয়।

দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রচারিত আদর্শকে কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও নিজের চিন্তায় ও কর্মে বহুলাংশে বহন করেছেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শন পরবর্তী কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নবৈশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রোদ্ধার ও শাস্ত্রচর্চায় অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে 'মহাবরাহ' অবতার সংজ্ঞায় উপমিত করেছেন।[৩]

রামেন্দ্রসুন্দর দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে 'স্বদেশীয়তা'র দীপ্ত প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একদিকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনশ্চর্চা অপরদিকে বাংলাদেশের ভাষা, শিল্প প্রভৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর সকলের মধ্যেই এই বঙ্গ-ভারতী সংযোগ কার্যকর ছিল। রামমোহন বাংলা ভাষায় পাঁচখানি মুখ্য উপনিষদের বঙ্গভাষানুবাদ প্রকাশ করেন, এবং সহমরণ প্রভৃতি সমাজসংস্কার-মূলক বিতর্কিত প্রশ্ন বঙ্গভাষায় খাঁটি নৈয়ায়িক রীতিতে আলোচনা করেন। আর একটি বড়ো কাজ তাঁর 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' (১৮৩৩) প্রণয়ন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে 'বঙ্গভাষাভিধান' সংকলন করেন তারও পিছনে ছিল রামমোহনের অনুপ্রেরণা। তাঁর স্থাপিত 'আত্মীয় সভা' (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮১৫) সেকালে শিক্ষিত সমাজে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নানাবিষয়ক মতামতের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে।[৪] দেবেন্দ্রনাথও বাংলা ভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার যে খসড়া প্রকাশিত হয়েছে তার কথাও স্মরণীয়।

বাংলা ভাষার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগের প্রথম সুস্পষ্ট পরিগৃহীত রূপ দেখি 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপনের মধ্যে (১৮৩২)। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বৎসর। এই সভা 'গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় সেখানে 'উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক'।[৫] এর থেকেই বোঝা যায় বাংলা ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে যৌবনের সূচনা থেকেই দেবেন্দ্রনাথ কী রকম সচেষ্ট ছিলেন। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র ঐতিহ্যানুসরণে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা (পরে তার নাম হয় তত্ত্ববোধিনী সভা) স্থাপিত হলে (১৮৩৯) তার মধ্য দিয়েও বহুলভাবে বাংলা ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই সভার অধীনে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলির সম্পর্কে বিরূপ ছিলেন। তার প্রধান কারণ মিশনারীদের হিন্দু ছাত্রদের ধর্মান্তরিত করবার প্রচেষ্টা। ডেভিড হেয়ারও ঠিক এই কারণে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। "ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করা”—এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল।[৬] মাতৃভাষা বাংলার সাহায্যে শিক্ষাদান দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার লক্ষণ। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন, গুরুদাস, রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ সকলেই এই আদর্শের কথা ঘোষণা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে 'ব্রহ্মচর্য-আশ্রম বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন (১৯০১) তার আদর্শের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র আদর্শগত মিল লক্ষণীয় নয় কি? এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থির হয় ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর সেখানে যোগ দেবেন। ১৩০৮ সালে ১ অগ্রহায়ণ তারিখের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহিম ঠাকুরকে লেখেন: "পিতাঠাকুর রাজকুমারের আগমন সংকল্পে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এ কয়দিন প্রত্যহ প্রাতে এই বিদ্যালয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পাছে শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ না হইলে তাঁহার জীবিতকাল অতিক্রান্ত হয় এই তাঁহার আশঙ্কা। এই কাজটিকে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কার্যরূপে দেখিয়া যাইতে চান"।[৭]

দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা ও আলোচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতার বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলায় চিঠিপত্র লেখা পছন্দ করতেন এবং এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন নিকট-আত্মীয়ের ইংরেজিতে লেখা চিঠির তিনি জবাব দেন নি। ইংরেজি ভাষা তিনি নিজে খুব ভালো জানতেন, কিন্তু এই যে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতি টান, এ তাঁর চিত্তের দৃঢ়মূল স্বদেশীয়তার লক্ষণ। মাতৃভাষায় সর্ববিষয়ের চর্চা হয়, এই ছিল দেবেন্দ্রনাথের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, "চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পার।"[৮]

এই সূত্রে স্মরণীয় পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে (১৯০৮) সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ পড়েন।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পাঠশালার সঙ্গে যুক্তভাবে নামোল্লেখ করতে হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৮৪৩)। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, "আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার"—কিন্তু ঐ সভায় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা হত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে তৎকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষী সকলেই প্রায় যুক্ত ছিলেন। 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার' মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, সমাজনীতি, কখনো বা রাজনীতিও স্থান লাভ করত। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭২) পত্রিকার ঐতিহ্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খুঁজতে গেলে প্রধানত 'তত্ত্ববোধিনী'-র কথাই মনে পড়ে। পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে লঙ্ সাহেব লিখেছিলেন—

"To those who wish to know what the expressiveness of the Bengali language mean, we would recommend the perusal of the Tattabodhini Patrika, a monthly publication in Bengali, which yields to scarce any publication in India for the ability and originality of its articles."[৯]

শিক্ষা-প্রসঙ্গে দেখা যায় দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। 'জনশিক্ষা'র ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন পরম উৎসাহী ব্যক্তি। ১৮৫৯ সালে ৮ অগস্ট তারিখে শিক্ষাবিভাগের জুনিয়র সেক্রেটারি ই. এইচ. লাসিংটনের কাছে দেবেন্দ্রনাথের লিখিত পত্র সেই সূত্রে স্মরণীয়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত সকলেই জনশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বার বার চেয়েছেন অশিক্ষার মরুভূমির আক্রমণ রোধ করতে, শিক্ষার বিকিরণ ঘটাতে।

এই সূত্রে আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম জগৎ এবং ব্যাবহারিক জগৎ উভয়কে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, মূল যাত্রাপথটি ছিল ব্রহ্মমুখীন। যেমন ধর্মাদর্শে, তেমনি শিক্ষাদর্শেও দেখা যায় তিনি 'পরাবিদ্যা'র সঙ্গে 'অপরাবিদ্যা'র যোগ বজায় রাখা সমর্থন করেছেন। [পরা-অপরাবিদ্যার কথাটি পাই মুণ্ডকোপনিষদে (১.১.৫)] তিনি 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সভ্য ছিলেন, 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ,' 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পরা-অপরাবিদ্যার সংযোগের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৮) ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসে ভারতে গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১-২২) পটভূমিতে লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১)। ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞান কবলিত, যন্ত্রশাসিত সমাজ জীবনকে তিনি 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকে জাল-ঘেরা 'রাজা'র মত মনে করেছিলেন। নিউইয়র্কের সত্তর তলা বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন করেছিলেন, অর্থাৎ 'তোমরা সুখ পেয়েছ, শান্তি পেয়েছ কি'—তার উত্তর মেলে নি। তিনিও পাশ্চাত্ত্যের যন্ত্রবিজ্ঞানের 'অপরা' বিদ্যার সঙ্গে প্রাচ্যের অর্থাৎ ভারতের আধ্যাত্মিক 'পরা' বিদ্যার মিলন, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন খুঁজেছেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বিশ্বভারতীর স্থায়ী রূপ দিলেন ১৯২১ সালে। মহর্ষি একখানি চিঠিতে লিখেছেন রাজনারায়ণকে তাঁর ভাইদের লেখাপড়া সম্পর্কে—"অপরাবিদ্যার সহিত তাহারদিগকে পরা-বিদ্যার উপদেশ দিতে অবহেলা করিবে না।" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জিজ্ঞাসু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাঠকের কাছে দেবেন্দ্রনাথের অভিমতের পরিণত রূপ বলে প্রতীয়মান হবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়দ্বয়ের নাম সবচেয়ে সুপরিজ্ঞাত। পরবর্তী কালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ রচনা তারই প্রকৃষ্ট ফসল। এ প্রসঙ্গেও মহর্ষির কথা না এসে পারে না। তিনি বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রক্‌টরের লিখিত সরল-পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ থেকে অনেক বিষয় মুখে মুখে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ-পর্বে ঠাকুরবাড়ির বালক-বালিকাদের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের সাধারণ কথা সহজ ভাবে বলতেন। এই আলোচনাগুলি পরে 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (১৮৯৩) শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তিনি অতি সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

"এই সৌরজগৎ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সূর্য যদি আরেকটু নিকটে থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী জ্বলিয়া যাইত; যদি আরও দূরে যাইত, তাহা হইলে পৃথিবী শীতল হইয়া পড়িত। এই জন্য সূর্যের তেজ ঠিক উপযুক্তভাবে আসিতেছে, তাই প্রাণ বাঁচিতেছে।"[১০]

অপিচ

"এইরূপে যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল। ক্রমে কীটাণু শঙ্খ প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহার পরে যখন স্থলভাগ অরণ্যময় হইয়া উঠিল, তখন আবার সেই অরণ্যের উপযুক্ত সুপ্রকাণ্ড হস্তী (mammoth) প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু তখনও অগ্ন্যুৎপাতের বিরাম নাই—ভূগর্ভস্থিত দ্রব ধাতুসমূহের আলোড়নে উচ্চস্থান নিম্ন হইতে লাগিল, নিম্নস্থান উচ্চ হইতে লাগিল··· হিমালয় সমান অভ্রভেদী পর্বতের উন্নততম চূড়ায় আজও আমরা সমুদ্রজাত জলজন্তুর অস্থি আবরণ বিস্তর দেখিতে পাই।"[১১]

'Protoplasm' এবং 'moss' শব্দ দুটির প্রতিশব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, যথাক্রমে 'প্রাণপঙ্ক' ও 'শৈবালক'। এ ধরনের আরো কিছু শব্দ ঐ বইয়ে আছে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব লক্ষণীয়। সীতানাথ ঘোষকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য সাত হাজার টাকা দান এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের 'Indian Association for the cultivation of Science'-এ অকুণ্ঠ সাহায্য প্রেরণ দেবেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহের দৃষ্টান্ত। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' গ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে রচিত ও তাঁর দ্বারাই সংশোধিত হয়ে পরে প্রকাশিত হয়। মহর্ষি ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি শেষ বয়সেও বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ দুটি বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথেরও আকর্ষণ ছিল সমধিক। 'শেষ কথা' গল্পের নায়ক নবীনমাধব তাই ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী।

'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' পড়তে পড়তে আর একটি জিনিস চোখে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য 'পেট্রিয়টিজম' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ অভিমতের কথা আমরা জানি—

> "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ! ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি-সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়দের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লেখেন।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে 'জাতিপ্রেম নাম ধরি বলের অন্যায়'-কে ধিক্কার দিয়েছেন। মহর্ষিও পাশ্চাত্ত্য জাতিদের প্রসঙ্গে বলেছেন "পরের স্বাধীনতা লোপ করা, এই একটা প্রবল অন্তরের রিপু আছে। [যাহারা] অধর্মকে আশ্রয় করিয়া অন্যের অধিকারে লোভবশতঃ অন্যায় পূর্বক যুদ্ধ করিতে যাইবে তাহাদেরই অধোগতি হইবে।"[১৩] এই উক্তির পিছনে 'মনুসংহিতা'র (মানবধর্মশাস্ত্র) সেই বিখ্যাত "অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি। ততো সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥" —শ্লোকের 'সংস্কার' অবশ্যই ছিল। রবীন্দ্রনাথও কি রাষ্ট্র ও সমাজসঙ্কটের ক্ষেত্রে বার বার এই শ্লোকটি উৎকলন করেন নি?

দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে (১৮৫০) প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বেদ, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, মনুসংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি থেকে যে শ্লোকগুলিতে তাঁর অন্তরের সায় ঠিক ঠিক মিলেছে সেইগুলি সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে এই গ্রন্থখানির দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের, গীতার বা মনুস্মৃতির যে-শ্লোক বা শ্লোকাংশ বার বার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন দেবেন্দ্রনাথ সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থই তাদের প্রকৃত উৎস। দেবেন্দ্রনাথের জীবন-পথের শূন্যতা ভরে গিয়েছিল ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্য মিদং সর্বং' শ্লোকটির দ্বারা। রবীন্দ্রমানসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি প্রেম ও সৌন্দর্যতত্ত্ব, ধর্ম ও নন্দনতত্ত্ব, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেছেন। সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণতঃ তাঁর নিজের। রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'র ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের জীবনদর্শন অনুযায়ী দুঃখবরণ অর্থাৎ ত্যাগের মধ্য দিয়েই মহৎ জীবনকে ভোগ করা যায় এই ব্যাখ্যা করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবেন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত পথে বা মতে তাঁর ধর্মসাধনায় অগ্রসর হন নি। তাঁর সাধনা মূলতঃ নিজস্ব, একান্তভাবে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। তিনি তাঁর অন্তরের গভীরে যে অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা বোধ করেছিলেন, ভাগবত-ব্যাখ্যা বা শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যাত 'অদ্বৈতবাদ' দ্বারা তার পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে নি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) একদা ঘোষণা করেছিলেন 'autonomy of thinking self'—দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তার প্রকাশ লক্ষিত হয়। তিনি লিখেছেন—

"এতদিন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' ব্রহ্ম 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' এই দুই মহাবাক্য ছিল; ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্' যোগ হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল।" আবার, তিনি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্মস্তোত্রের সন্ধান মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোকে পেয়ে খুশি হলেও 'তাহাতে অদ্বৈতবাদ আছে বলিয়া' তিনি তাকে 'সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে' পারেন নি। তাকে তিনি সংশোধন করে নিলেন।[১৪] কাজেই তিনি তাঁর নিজের 'আত্মপ্রত্যয়'-কেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন, সেই 'প্রত্যয়'-পরিপোষক শ্লোক-সংগ্রহ ও সংশোধন কার্য প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেই করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মাচার আনয়নের বিরোধী হলেও ফরাসী ব্রহ্মবাদী ফেনেলাঁ রচিত স্তোত্রের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছেন দেখা যায়। ১৮৪৯ সালের ১১ মাঘ-উৎসবে তিনি রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক অনূদিত, 'ফরাসিস্ ব্রহ্মবাদী ফেনেলন মহাত্মার,' রচিত স্তোত্রটি গ্রহণ করে "তাহার মধ্যে মধ্যে…উপযোগী উপনিষদ্-বাক্যসকল প্রবিষ্ট" করান। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন "পূর্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।" কাজেই দেখা যায় দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা কোনো একটি স্থলে নিশ্চল হয়ে ছিল না। 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য-ধর্ম" থেকে তিনি নিজেই বহুদূর সরে এসেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার এই বিবর্তন ঘটেছে নিজেরই পথখোঁজার তাগিদে। উপনিষদের বাণী ও হাফিজের কবিতা, যা সুফী প্রেম সাধনার প্রকাশ, দেবেন্দ্রনাথের চেতনায় সমন্বিত হয়েছিল এ তথ্য সর্বজনবিদিত। সুফী সাধনায় 'পরমাত্মা পূর্ণ সত্য পূর্ণ মঙ্গল পূর্ণ সুন্দর। তাঁহার প্রতি প্রেমই সত্য প্রেম, আর সকল পদার্থের প্রতি প্রেম, অসত্য প্রেম'। দেবেন্দ্রনাথ এই ধারণা অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের (১৮৩৮-৮৪) ধর্মাদর্শগত বিরোধ এইখানে। কেশবচন্দ্রের ধর্মাদর্শে ব্রাহ্মমতের পর পড়েছিল পাপ, অনুতাপ ও করুণাতত্ত্ব অর্থাৎ Sin, Confession ও Grace এই খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের প্রভাব। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে খ্রীষ্টধর্মমত আনয়নের বিরোধী ছিলেন। ১৮৫৮ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তাঁর আলোড়ন-সৃষ্টিকারী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বক্তৃতা 'Jesus Christ : Europe & Asia' ১৮৬৬ সালের ৫ মে তারিখে প্রদত্ত হয়। এর ফলে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কেশবচন্দ্র পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬)-প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব সঞ্চার করেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেই ঈশ্বরের মাতৃভাব সাধনার প্রকাশ দেখা যায়। ১৮৫৭ সালে ১১ জুন তারিখে সিমলা শৈলে ভ্রমণকালীন পর্বতগাত্রে নানা বর্ণের পুষ্পের সমারোহ দেখে দেবেন্দ্রনাথের মন-প্রাণ মোহিত হল, তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন—

> এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম।[১৫]

অপিচ—

> আমি তো এতটা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি তো এতটুকু দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি আরও দিতে চাহেন। মাতার ন্যায়, তিনি আরও দিতে চাহেন।

দশ বছর পরে ১৮৬৭ সালের নভেম্বরে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' কর্তৃক সংবর্ধনার উত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মজীবনোন্মেষের যে বিবরণ দেন সেখানেও মাতৃভাবের উল্লেখ আছে—

> প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম। যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বরের এই মাতৃভাব রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতেও আছে। তাঁর রচিত 'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক' গানটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগের আগের রচিত গান। তখন রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ১৮০৭ শক (১৮৮৫) সালে ১১ মাঘের উৎসবে আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিন ব্রাহ্মসমাজের প্রধানগণ সমবেতভাবে উৎসব পালন করেন। তদুপলক্ষে এ গানটি রচিত ও গীত হয়েছিল। পরে গানটি 'স্বদেশী' গানে পরিণত হয়। ১৮০৮ শকে (১৮৮৬) মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও গীত হয়েছিল রামপ্রসাদীসুরে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'।

কেশবচন্দ্রের বহু পূর্বে ঈশ্বরের পিতৃভাবের সঙ্গে মাতৃভাবের কথা দেবেন্দ্রনাথ নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন—

> তখন মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি যে 'মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চপ্রজাঞ্চ বিধেহি ন ইতি।' মাতার ন্যায় আমারদিগের রক্ষা কর,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুমি আমারদিগকে শ্রী দেও, প্রজ্ঞা দেও। যখন সেই অভয়দাতা পিতা, জ্ঞানদাতা গুরু, স্নেহদাতা মাতার ভাব আমরা একত্রে গ্রহণ করি, তখন তাঁহার প্রতি কি গাঢ় নির্ভয়ের ভাব হয়।

(ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ৩২ শ্রাবণ, ১৮৬০)

আরো জানা দরকার যে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী গ্রন্থে মূল পাণ্ডুলিপির গোড়ায় আছে—"এখন আমি বিশ্বপিতার নিখিলমাতার ক্রোড়ে বসিয়া আছি।" (পৃ-২) এই প্রশ্ন উঠেছিল যে দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্বের বিরোধী ছিলেন কিন্তু সর্বতোভাবে ছিলেন কি? হিমালয় প্রত্যাগত ব্রহ্মোপলব্ধ দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান করতে গিয়ে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলেন তখন কি উপনিষদের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকে তিনি মেলান নি—

যে ব্যক্তি তাঁহার রুদ্রমূর্তি দেখিতেছে—তাঁহার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, সে যদিও এক একবার মনে করিতে চাহে আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন; কিন্তু তাহার আত্মা হইতে কি কখন এ প্রকার গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হয় না, 'তুমি কোথায় পলায়ন করিবে; পরে কাহার আশ্রয়ে যাইবে?' তুমি পাপেতে ভীত হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কর, ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন কর, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তোমার কি হইবে? পাপময় আত্মাও তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। গিরিগুহা কানন সমুদ্র যেখানেই যাউক, পাপী তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে পারে না। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে অন্তরে ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব পাপ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইও না, ব্যাকুল অন্তরে, গ্লানিযুক্ত মনে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। বল 'আমি আপনাকে জঘন্য করিয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর; আমার হৃদয় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। তুমি সহস্র দণ্ড দাও, তাহা আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাকে কুটিল পাপ হইতে মুক্ত কর এবং তোমার প্রসন্ন মুখ আমার নিকট প্রকাশ কর।' এই প্রকার গ্লানিযুক্ত ব্যাকুল চিত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহার করুণাবারি অবশ্যই পতিত হইবে, তিনি তোমার দগ্ধ আত্মাকে অবশ্যই শীতল করিবেন। যাহারা পাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয়, এই মনে করে ঈশ্বর না থাকিলে পরকাল না থাকিলেই ভাল এবং তদনুরূপ মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে—সেই আত্মঘাতীরা এই ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি।

(ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ৩২ শ্রাবণ ১৮৬০)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপিচ—

আমরা অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হই তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কোন ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ?

'পাপী তাপী সাধু অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গলছায়া—কেবা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃতনিকেতনে।'

(একাদশ ব্যাখ্যান)

১৭৮২ শক (১৮৬০) ১১ শ্রাবণ থেকে ১৭৮৩ শক (১৮৬১) ১৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে এই 'ব্যাখ্যান'গুলি তিনি দেন। পাপ, অনুতাপ, ক্রন্দন, শরণ, মার্জনা—এগুলির সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের খুব তীব্র বিরোধ নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

আমারেও করো মার্জনা।
আমারেও দেহো, নাথ, অমৃতের কণা ॥
গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি ম্লানবেশে,
আমারো হৃদয়ে করো আসন রচনা ॥
জানি জানি আমি তব মলিন সন্তান—
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরমবেদনা ॥

(৪৪, পূজা ও প্রার্থনা, গীতবিতান)

এ সব কথায় কি দেবেন্দ্রনাথের উক্ত ব্যাখ্যানের প্রতিধ্বনি নেই ?

অতএব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় যে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মতোই একেশ্বরবাদী (Unitarian) খ্রীষ্ট পন্থার অনুকূল ছিলেন, তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর যে রচনাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে থিয়োডোর পার্কার (১৮১০-৬০) ও কার্ডিনাল নিউম্যানের (১৮০১-৭০) বক্তব্যের প্রতিধ্বনি যেন শ্রুত হচ্ছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি পড়েছিলেন এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৪৩) সভ্যদের মধ্যে 'ইউনিটারিয়ান' খ্রীষ্টান অনেকে ছিলেন। 'সভা'র ১৮৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আয়-ব্যয়-স্থিতির নিরূপণ পুস্তকে মিঃ বিটসন্, মিঃ চ্যাপম্যান, মিঃ স্যামুয়েল হিল প্রভৃতি সভ্যের নাম পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-প্রত্যয় বা ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁর গদ্যকে এমন এক অনন্য রূপ দান করেছে, যার সঙ্গে আমরা বাংলা সাহিত্যে পূর্বে পরিচিত হই নি। তার কারণ দেবেন্দ্রনাথের মতো অন্তর্লোক যাত্রী ব্রহ্মবাদীও আমরা পূর্বে দেখি না,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরে তাঁর ধারা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, যখন তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছেন, তাঁর 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা, 'নৈবেদ্য' (১৯০১) ও 'শান্তিনিকেতন' রচনাকালে। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি সৌন্দর্য-রসিক মুগ্ধ চিত্ত ছিল, নিভৃত-নীরব কবি-প্রাণ ছিল, ব্রহ্মমুখী সাধক-আত্মা ছিল—এই তিনের দুর্লভ সমন্বয় পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্ণভাবে পাই, আর পাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরে। 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে বাংলা গদ্যের বিস্ময়কর ঐশ্বর্যময় প্রকাশ লক্ষ্য করি। আধুনিক কালের প্রখ্যাত দার্শনিক-সমালোচক বেনেদেতো ক্রোচে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন যে 'উন্নত সাহিত্যসৃষ্টির মূলে ইণ্টুইশনের স্থান।' মহর্ষির রচনায় তার সার্থক দৃষ্টান্ত পাই—অন্তরের গভীর অকম্পিত উপলব্ধি সেখানে গদ্যে সমর্পিত রয়েছে—

> আমি দেখি যে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য অস্ত গিয়াছে; আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি বন কানন, সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড়্ খড়্ করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল।··রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম—আমার উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া রাত্রি ৮টার মধ্যে বাসাতে পহুঁছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই।[১৬]

'রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল'—কিংবা 'অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল'—এ ধরনের অপূর্ব কাব্যধর্মী চিত্রসময় গদ্য বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

উচ্চকোটির কবিমন না হলে আকাশের অর্ধচন্দ্র 'অন্ধকারের দীপ' বলে প্রতীয়মান হয় না। আর সেই অন্ধকারের দীপ যখন করুণাঘন ঈশ্বরের অতন্দ্র নয়নের উপলব্ধি বহন করে, সে-উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে মিস্টিক বা মরমিয়া সাধকের। কবিসাধকের এই আনন্দময় সাযুজ্য 'আত্মজীবনী'র পাতায় পাতায় আঁকা রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যরসিক ছিলেন, অন্তরে কবি ছিলেন, মর্ত্য-ভূমি তাঁর কাছে 'মায়া' মাত্র ছিল না—'সত্য' ছিল। তাঁর অন্তরের এই সৌন্দর্য-বিমুগ্ধ পরিচয় চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলিতে—

> আগ্রায় আসিয়া 'তাজ' দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটি মিনারের উপরে উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে ; নীচে নীল যমুনা, মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।[১৭]

কিম্বা—

অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম তখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসে রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধুবহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের এক তলায় বসিত এবং তাহাদের চিত্রবিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত।...

একদিন মেঘ উঠিল আর দেখি যে ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিত লাগিল। এ কি আশ্চর্য দৃশ্য। আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে বাজাইতাম।...[১৮]

তারপর—

ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্রমুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল।[১৯]

এই চিত্রময় সুরবাহন গদ্য রোমাণ্টিক কবির রচনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই কাব্যধর্মী চিত্ররূপময় গদ্য বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এরই পূর্ণতা। দেবেন্দ্রনাথের কবিমনের সঙ্গে কাব্যরসগ্রাহী মনের পরিচয়ও মেলে। মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হলে (১৮৬১) খুব কম ব্যক্তি তার প্রকৃত রসগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। যাঁরা পেরেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লেখেন "your friend Baboo Devendranath Tagore I hear, is quite taken up with it. S—told me the other day that he

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can 'stand near this man' meaning your fat friend of No 6 Lower Citpur Road and that his imagination goes as far as imagination can go"[২০]

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যেমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বাংলা দেশের সামাজিক আচার সম্পর্কেও তাঁর মমত্ববোধ লক্ষণীয়। তিনি জাতকর্ম থেকে শ্রাদ্ধকার্য অবধি অনুষ্ঠানগুলি পালন করতেন প্রধানত বেদবিহিত পন্থায়। কিন্তু বাঙালীর সামাজিক জীবনের কোনো কোনো লোকাচার তাঁর ভালো লাগত। তিনি সেগুলিকে বর্জন করেন নি। তাঁর বড়ো মেয়ে সৌদামিনী দেবী 'পিতৃস্মৃতি' নামক রচনায় জানিয়েছেন যে দেবেন্দ্রনাথ বিবাহকালে 'স্ত্রী আচার,' বা 'জামাইষষ্ঠী'-র পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যে 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেন, তারও পিছনে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এখানে বাংলাদেশের সংগীত, কুটীরশিল্প-প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। তিনি শান্তিনিকেতনের যে ট্রাস্ট-ডীড করে গেছেন সেখানেও দেখা যায় 'মেলা'র ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের স্বদেশ-চিন্তাকে 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে রূপ দিলেন, সেখানে দেখি তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'মেলা' বসাবার পর জোর দিয়েছেন। মনে হয় এখানে দেবেন্দ্রনাথেরই 'মেলা' আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর ছিল। 'হিন্দুমেলা'র কুটীরশিল্প প্রদর্শনী পরবর্তী কালে জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

দেবেন্দ্রনাথকে তাই 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁর ছেলেদের মধ্যে দেশাত্মবোধের যে প্রকাশ দেখি, তার পিছনে ছিল তাঁরই দীপ্ত স্বদেশীয় আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'স্বাদেশিকতা' অংশের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে দেখতে পাই—

"আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই ; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।"[২১]

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব (Lobb) সাহেব বলেছেন "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans".

দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের আর একটি উজ্জ্বল দিক রুচির আভিজাত্য। এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আভিজাত্য উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর মানস-সন্ততিরূপে আমরা লাভ করেছি। 'নব্যভারত' পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনূদিত 'মেঘদূত' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে (১৩০৯, শ্রাবণ) সমালোচক মহর্ষির রুচি সম্পর্কে একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

'প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাহারও মুখে কিছুমাত্র অশ্লীল কথা শুনিলে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন "ভদ্রং ব্যাহরেম, ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম।"

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে দেবেন্দ্রনাথের কর্মী কবি ও সাধক সত্তা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মত মিলিত হয়ে তাঁর জীবনকে পরবর্তীদের বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি উজ্জ্বল উত্তরাধিকার স্বরূপ তুলে ধরেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রবীন্দ্র জননী সারদা দেবী

দেবেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী সারদা দেবী (১৮২৬-৭৫) জোড়াসাঁকো বাড়ির অন্তঃপুর মহলের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বহু সন্তানবতী হয়েও বৃহৎ সংসারের বিরাট কর্মভার তিনি দীর্ঘকাল বহন করেন। তাঁর পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রকল্প অনেকে তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন। সেগুলির মধ্য দিয়ে মোটামুটি তাঁর একটি পরিচয় গড়ে ওঠে।

১৮৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে সারদা দেবী দ্বারকানাথের পুত্রবধূরূপে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে প্রবেশ করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের 'পিরালী' পরিচয় থাকায় খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রাম থেকে কন্যা আনয়ন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সারদা দেবীর বাবা রামনারায়ণ চৌধুরী 'পিরালী' শাখাশ্রিত ছিলেন।

সারদা দেবীর জগৎ অন্তঃপুর এবং সে-কালের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুর, যখন ঘেরাটোপ পাল্‌কি সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান সারা হত। তবুও তার মধ্যে তিনি মোটামুটিভাবে খানিকটা লেখাপড়া শিখেছিলেন। কেন না অন্দর মহলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার চল ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> মাতাঠাকুরাণীও কাজকর্মের অবসরে একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁর বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল। প্রায়ই বইখানি হাতে লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোনো না কোনো দাদার ডাক পড়িত।[১]

এরকম ডাক যে পড়ত তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আছে—

> পৃথিবী সুদ্ধ লোক কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ্‌ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিলেন, আচ্ছা বাছা সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি···মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়াছে ; তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি। তখন মনে মনে সমূহ বিপদ গণিয়া প্রচুর আপত্তি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন,' রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন্ না'। পড়িতেই হইল।...

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মায়ের চেয়ে কাকিমার (গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী) কাছে বেশি থাকতেন রবীন্দ্রনাথেরা। তিনি তাঁদের আদর ও প্রশ্রয় দিতেন। মায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথেরা বেশি থাকতে পেতেন না। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার বাল্যকথা' বইটিতে লিখেছেন একমাত্র 'ব্যামোর সময়ে' তাঁরা মায়ের কাছে যেতেন। (রবীন্দ্রনাথ মায়ের আরো একটু কাছে থাকতে পেতেন, মায়ের বায়ু-সেবন সভায় বক্তার আসনও পেয়েছিলেন)। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে প্রার্থনায় বলেছিলেন—

> আমাদের স্নান ভোজনের এতটুকু বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য তেমন আগ্রহ আর দেখিতে পাইব না। কোন বিষয়ে অনিয়ম করিলে তেমন উজ্জ্বল হাস্যমুখ আর দেখিতে পাইব না। পীড়ার সময় তেমন হস্তের স্পর্শ আর আমাদিগকে আরোগ্য প্রদান করিবে না।[২]

—এই উক্তিতে সারদা দেবীর স্নেহবৎসলা রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি ছিল। স্বামীর অপ্রিয় কোনও কাজ তিনি করেন নি। স্বামীর মঙ্গল ও কল্যাণ-চিন্তা সর্বদা তাঁর মনে জাগরূক থাকত। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০) লিখেছেন—

> মা আমার সতীসাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে তিনি সর্বদাই চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। [পিতা] পূজার সময় কোনোমতেই বাড়িতে থাকিতেন না। এই জন্য পূজার উৎসবে যাত্রা, গান, আমোদ যতকিছু হইত, তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন, কিন্তু মা তাহার মধ্যে যোগ দিতেন না। কাকীমারা আসিয়া কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।[৩]

হিমালয় ভ্রমণরত দেবেন্দ্রনাথের জন্য মায়ের উদ্‌বেগের একটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে—

> বেশ মনে আছে আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন।...এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তা লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো। মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি।[৪]

মহর্ষি যখন কলকাতায় থাকতেন এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উপাসনা ও প্রার্থনা করতেন সে-সময় সারদা দেবী ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন। তাঁর পুত্রবধূ, সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১) লিখেছেন—

> আমাদের বাড়িতে রোজ উপাসনা হত। মহর্ষি থাকলে তিনিই উপাসনা করতেন, তখন মা-ও গিয়ে বসতেন।

বীরেন্দ্রনাথের পত্নী প্রফুল্লময়ী দেবীও লিখেছেন—

> আমার শ্বশুর যখন পূজার দালানে বসিয়া উপাসনা করিতেন তখন তিনিও তাঁহার পাশে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন।

অন্তঃপুরের খবর অন্তঃপুরচারিণীদের লেখাতেই ধরা পড়ে বেশি। সারদা দেবীর দুই পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং বীরেন্দ্রনাথের পত্নী ও বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁদের শাশুড়ীঠাকুরাণীর সামান্য পরিচয় দিয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন—

> আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ী ননদ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। প্রথম বিয়ের পরে শাশুড়ী-মা আমাদের রূপটান মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। আমরা মেয়েরা বউরা সকলেই ঠিক তাঁর কথা মতো চলতুম। আমি বডড রোগা ছিলুম তাই তিনি আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর তাঁর সেই সুন্দর চাঁপাকলির মতো হাত ভরে দিয়ে খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি রেলিঙের ধারে গিয়ে বমি করব।[৫]

প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন 'আমাদের কথা' স্মৃতিচারণে—

> [বিবাহের পর] বাড়ির ফটকের সামনে গাড়িখানি থামিল সেই সময় আমার শাশুড়ী জলের ধারা দিয়া পান-সন্দেশ মুখের মধ্যে দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দোতালায় আনিয়া আমাদের দুজনকে মসলন্দের উপর বসান হইল এবং সেইখানেই বিবাহের নানারকম অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইল। বিবাহের আটদিন পরে যখন বাপের বাড়ি যাই সেইদিন শাশুড়ী নিজে গহনা পরাইয়া আমাকে সাজাইয়া দিলেন। তাঁর নিজের একটি চুণী মুক্তোর নথ ছিল সেইটি আমার নাকে পরাইয়া দিবার জন্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেটি এত ভারি ছিল যে পরিতে গিয়া আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

[বলেন্দ্রনাথের জন্মের পর] আটদিনের দিন আমার শাশুড়ী ছেলের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য বাড়ির যত দাসদাসী ছিল সকলকেই তেল দিয়া এক একটি কাঁসার বাটি দান করেন। শাশুড়ী বলুকে বড় ভালবাসিতেন। বলু যখন ছোট ছিল, তখন আমার শ্বশুরের চলার নকল করিত। আমার শাশুড়ী তাই দেখিতে খুব ভালোবাসিতেন এবং ডাকিয়া আনিয়া দেখিতেন।... আমার শাশুড়ীর মৃত্যুতে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। শাশুড়ীর মতো শাশুড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁহার মতন সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তি-পরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মে মতি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কেহ যদি তাঁহার সাক্ষাতে পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিত, তখন তিনি মাথা নত করিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁহার অহঙ্কার জাগে।... অতো বড়ো বৃহৎ পরিবারের সমস্ত সংসারের ভার তাঁহারই উপরে ছিল। তিনি প্রত্যেককে সমানভাবে আদর যত্নে অতি নিপুণভাবে সকলের অভাব দুঃখ দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কোনো বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মনটি শিশুর মতো কোমল ছিল। অত বড়লোকের পুত্রবধূ ও গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মনে কোনোরকম জাঁক বা বিলাসিতার ছায়া স্থান করিতে পারে নাই। যতদূর সম্ভব সাদাসিদা ধরনের সাজ-পোষাক পরিতেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার দেহের সৌন্দর্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিত।[৬]

সারদা দেবীর একটি চমৎকার ছবি কথার তুলি দিয়ে এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। আত্মীয়-পরিজনদের, ছোট ছেলেমেয়েদের কেমন যত্ন করে খাওয়াতেন তিনি, তার বিবরণ সেখানে মেলে—

আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তাদিদিমার সে ছবি, ভিতরের দিকের তেতলার ঘরটিতে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা, সেকেলে মশারী সবুজ রঙের, পংখের কাজ করা মেঝে, কার্পেট পাতা, এক পাশে একটি পিদিম জ্বলছে—বালুচরী শাড়ি পরে, সাদাচুলে লাল সিঁদুর টকটক করছে—কর্তাদিদিমা বসে আছেন তক্তাপোশে। রামলাল শিখিয়ে দিত, আমরা কর্তাদিদিমাকে পেন্নাম করে পাশে দাঁড়াতুম; তিনি বলতেন, আয় বোস্ বোস্। কর্তাদিদিমা রামলালের কাছে সব তন্নতন্ন করে খবর নিতেন। তিনি ডাকতেন, ও বউমা ওদের এখানেই আমার সামনে জায়গা করে দিতে বলো।...কর্তাদিদিমা কাছে বসে বলতেন, বউমা, ছেলেদের আরো খানকয়েক লুচি গরম গরম এনে দাও, আরো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মিষ্টি দাও। এই রকম সব বলে খাওয়াতেন, বড়োদের মতো আদরযত্ন করে। আমরা খাওয়া-দাওয়া করে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে আসতেম।[৭]

এই পরিপূর্ণ সুখের ভরা সংসার ফেলে স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে সারদা দেবী পঞ্চাশ বছরে পা দেবার পূর্বেই স্বর্গলোকে চলে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> কর্তাদিদিমা আঙুল মটকে মারা যান। বড়ো পিসিমার ছোট মেয়ে সে তখন বাচ্ছা, কর্তাদিদিমার আঙুল টিপে দিতে কেমন করে মটকে যায়। সে আর সারে না—আঙুলে আঙুলহাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠল। জ্বর হতে লাগল। কর্তাদিদিমা যান-যান অবস্থা। কর্তাদাদামশায় ছিলেন বাইরে—কর্তাদিদিমা বললেন, তোরা ভাবিসনে, আমি কর্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরব না, তোরা নিশ্চিন্ত থাক। কর্তাদাদামশায় তখন ডালহৌসি পাহাড়ে…অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় কর্তাদাদামশায় এসে উপস্থিত। খবর শুনে সোজা কর্তাদিদিমার ঘরে গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন, কর্তাদিদিমা হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।[৮]

সৌদামিনী দেবীর প্রদত্ত মায়ের মৃত্যুবর্ণনার দৃশ্য অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে—

> যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে ক্ষণে ক্ষণে মা চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন 'বসতে আসন দাও'। পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন 'তবে আমি চললেম'। আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল স্বামীর নিকট বিদায় লইবার জন্য এ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম'।[৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন—

> যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কতরাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে"! তখনই বউঠাকুরানী [কাদম্বরী দেবী] তাড়াতাড়ি তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গনে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না ও সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।[১০]

সেদিন মায়ের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুল বেদনা অতি সংযত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'তে।

মায়ের মৃত্যুর পর একবার রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে তাঁকে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বাল্যকালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কি হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন! তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন 'তুমি এসেছ'! এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।[১১]

দেবেন্দ্রনাথও স্বপ্নে তাঁর মাতৃদেবীর দর্শন পেয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করবার সংকল্পে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।

রবীন্দ্রনাথ ১৩২৬ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী' নামক বার্ষিকীতে 'মাতৃবন্দনা' শীর্ষক কয়েকটি কবিতা লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবধর্মে 'বিশেষ' থেকে 'নির্বিশেষে' চলে গেছেন, নিজের জননীর মধ্যে দেখেছেন বিশ্বজননীকে—

ওগো মা তোমারি মাঝে বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিণী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ মা চলি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহারি পূজায় দিনু তব পূজাঞ্জলি।[১২]

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'রাজকন্যা'-র নাট্যরূপ 'দিব্যকমল' (১৯৩০) নাটকখানি স্বর্গতা মাতৃদেবীর স্মরণে উৎসর্গ করেন—

ফুটেছিল এ কমল
মানস কনক-সরে
যতনে এনেছি তুলে
তোরে মা স্মরণ করে।
যদিও নিকটে নেই
স্মৃতিপূর্ণ তোমাতেই
একবার নেমে এসো
দেখা দাও ক্ষণতরে।

70008

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় 'পরেশবাবু' চরিত্রে পিতাকে, 'বৈকুণ্ঠ' চরিত্রে বড়োদাদাকে, 'বিভা' চরিত্রে বড়োদিদিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁর মায়ের রূপকে কোথায় ফুটিয়ে তোলেন নি। গোরা-র 'আনন্দময়ী' Ideal ও চোখের বালির মহেন্দ্রের মা 'রাজলক্ষ্মী' Real, কোনোটিই যথার্থ 'বাস্তব' নয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসে এই Ideal ও Real চরিত্ররূপ উপস্থাপিত হওয়ায় চরিত্রসৃষ্টিতে শিল্পোচিত বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

থেকে থেকে নিজের মায়ের কথা রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই মনে পড়ত—সেই মনে-পড়া ভাবটিই কি রূপ পেল কর্ণের উক্তিতে—

কতবার
হেরেছি নিশীথ স্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায় ;
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
"জননী গুণ্ঠন খোলো দেখি তব মুখ"।
অমনি মিলায় মূর্তি তৃষ্ণার্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি।[১৩]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাইটন্ ও 'মেদিনা ভিলা'র বাসিন্দা

"বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টিমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল।" —১৮৭৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে আঠারো বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা, প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস্ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) সঙ্গে বিলেতে যাত্রা করলেন। সেখানে লেখাপড়া শিখবেন, ব্যারিস্টারি পাশ করবেন এসব বাসনা তাঁর অভিভাবকবর্গের ছিল। জাহাজে ভেসে চলা, ইটালি (ব্রিন্দিশি) থেকে রেলগাড়িতে চড়া, প্যারিসে পৌঁছনো, 'বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী' ইংলণ্ডে পদার্পণ এবং পরে ব্রাইটনে গমন ও অবস্থানের কথা আমরা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের প্রথম তিনখানি পত্র পড়েই জানতে পারি। ব্রাইটনে যে বাড়িটিতে তাঁরা ছিলেন তার নাম 'Medina Villas'। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০।২৫টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হচ্ছে Medina Villas।

বাড়িটা দেখে রবীন্দ্রনাথ বেশ নিরাশ হয়েছিলেন, কেননা তাঁর মনোভাব অনেকটা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'না-দেখা ইয়ারো' ও 'দেখা-ইয়ারো'র মনোভাবের মতো হয়েছিল। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

> Villas শুনলে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগানবাড়ি। আমি লণ্ডনে থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে আমরা মেদিনা ভিলায় বাস করতে যাচ্ছি, তখন কত কী কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই—বাগান, গাছপালা, ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই বাড়ি, ঘর, রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া—'ভিলা'ত্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু চার হাত জমিতে দু চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া (knocker) লাগানো আছে, সেইটে টেনে ঠক্ ঠক্ করলেম, আমাদের landlady এসে দরজা খুলে দিলে।

আরেকটি চিঠিতে তিনি লণ্ডন ও ব্রাইটনের আবহাওয়ার তুলনা করে লিখেছেন—

> আমরা লণ্ডনে দুই-এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে—একটা বড়ো শৌখিন (fashionable) শহর। দেখতে শুনতে আকারে ইঙ্গিতে লণ্ডনেরই মতো, কেবল লণ্ডনেরই মতো সে রকম অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন ভ্রূকুটি কুটিল মুখ নয়। —নবম পত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'জীবনস্মৃতি'র বিবরণ থেকে জানতে পারি তাঁর "মেজোবউঠাকরুণ তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না"। সত্যেন্দ্রনাথ ফর্লো নিয়ে বিলেতে কাটিয়ে আসেন ২০.৯.৭৮ থেকে ১৮৮০র ফেব্রুয়ারি অবধি। তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কিছু আগে সুরেন্দ্র ও ইন্দিরাকে নিয়ে ওখানে যান। তাই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পরে ছেলেপিলেদের নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মতো বিরাজ করছেন— —নবম পত্র

রবীন্দ্রনাথ অতঃপর জানান—

> কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভরতি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন— "বাহবা তোমার মাথাটা তো চমৎকার।" (What a splendid head you have !) এ ইস্কুলেও আমার বেশীদিন পড়া চলিল না—সেটা ইস্কুলের দোষ নয়।[১]

এখন প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনে কোন্ পাবলিক স্কুলে কতদিন পড়েছিলেন। 'রবীন্দ্র জীবনী' প্রথম খণ্ডে তার কোনো নির্দেশ নেই। 'জীবনস্মৃতি'র বক্তব্যই সেখানে উৎকলিত হয়েছে। এখানে বলা দরকার 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। ব্রাইটন থেকে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা চিঠির সন্ধান এখনো পর্যন্ত মেলে নি। ব্রাইটনের তথ্য-কর্তা (ইন্‌ফরমেশন অফিসর)-কে চিঠি লিখে জানতে পারি ১৮৭৮-৭৯ সালে ব্রাইটনে যে দুটি মাত্র পাবলিক স্কুল ছিল, তাদের ছাত্র-ভর্তির রেজিস্টারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কোনো ছাত্রের নাম নেই। এই পত্রোত্তরে খুশি না হয়ে ব্রাইটন্-বাসিনী আমার ছাত্রী শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনকে এ সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলি। তিনি ও তাঁর স্বামী রবার্ট (পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক) এ বিষয়ে যা-যা খোঁজ নেওয়া দরকার সবই নিয়ে আমাকে জানান যে পূর্বোক্ত তথ্য-কর্তার উক্তি সত্য। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। তিনি যে স্কুলে পড়েছিলেন সে ধরনের কয়েকটি ডে-স্কুল (day school) তৎকালীন ব্রাইটন ও হোভ অঞ্চলে ছিল। 'মেদিনা ভিলাস,' ব্রাইটনের গা ঘেঁসে হোভ নামে যে শহরটি তার অন্তর্গত। ব্রাইটন্ ও হোভ কার্যত দুটি মিলে একটি শহর। ঐ ডে-স্কুলগুলি 'small privately owned'— পাবলিক স্কুল নয়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর নামটি বলেন নি, তাহলে সহজেই তিনি কোন্ স্কুলে পড়েছিলেন সেটা জানা যেত। দেখা যায় বেশীর ভাগ প্রাইভেট স্কুলগুলির স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন মহিলারা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনে হয় রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন 'Brighton Proprietory School for Boys'-এ এবং এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন P. Capon। স্কুলের ঠিকানা 7 Ship Street[২] রবীন্দ্রনাথ যে বিলিতি গান ও নাচে দীক্ষা লাভ করেছিলেন সে বোধকরি এখানকার স্কুল থেকে। উক্ত প্রাইভেট স্কুলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত-প্রায়। সেজন্য তাদের প্রত্যেকটির রেকর্ড অনুসন্ধান করা সম্ভব হল না। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এসম্পর্কে কেউ কৌতূহল দেখান নি এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছ থেকেও হয়ত জানা যেতে পারত কিন্তু সে সূত্রও ব্যবহার করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-বইটিতে তাঁর লণ্ডন, ব্রাইটন্, টনব্রিজ ওয়েলস ওটর্কি—এই চারটি স্থানে বসবাসের নানা খবর ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর আলাপী পুরুষ বা মহিলা কারোর পুরো নাম দেন নি, শুধু তাঁদের নামের আদ্যক্ষর দিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের পরিচয় স্থানীয় Directory থেকে বার করা যায় নি। কিন্তু ব্রাইটনের স্কুলের একটি মধুর স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের ১৯১১ সালেও জাগরূক ছিল—

> ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে।[৩]

কিন্তু ব্রাইটনের খেলা ফুরোলো। এই খেলা ভাঙলেন ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত (১৮৪১-১৯১৪)। তিনি তাঁর বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকে বলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে তখন তাঁর ছেলেরা পড়াশুনা করতেন। এই সময়ে লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব হয় য়ুনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডনে।

'মেদিনা ভিলাস' এখনো রয়েছে। এ সম্পর্কে শ্রীমতী কেতকী পত্রে লিখেছেন—

> Medina Villas-এর যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে বর্তমান চেহারা হুবহু মিলে যাচ্ছে। বর্তমানে মুখোমুখি করে দাঁড়িয়ে আছে ৪৩।৪৪টি বাড়ি—অর্থাৎ এক এক দিকে ২০।২৫টি—ঠিক যেমন বর্ণনা তিনি দিয়েছেন; সমুদ্রের খুব কাছে, নিরিবিলি, এখনো তেমনি। এই বাড়িগুলিই ১৮৭৮-৭৯ সালে বর্তমান ছিল। ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম, প্রত্যেকটা বাড়ি তখন যেমন ছিল, তেমনই আছে। শুধু জানা গেল না ঠিক কোন বাড়িটায় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হেনরি মরলি, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র

১. আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান-দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে, প্রাণ পেয়ে উঠত—আমাদের সেই মরমে পেঁছিত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক—মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হত না। —ছেলেবেলা

২. বয়স যদি পর্যবসিত-প্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্য-শিক্ষকতা করা তবে এই আদর্শ-অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। —ভাষণ, ডিসেম্বর ১৯৩২

'ছেলেবেলা' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনশেষের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আচার্য হেনরি মরলির (১৮২২-৯৪) একটি চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। যৌবনে সদ্য উপনীত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্থী মনকে তাঁর অধ্যাপনাশিল্প দ্বারা কী গভীরভাবে উদ্‌বোধিত করেছিলেন তার স্বচ্ছ স্বীকৃতি শীর্ষে উৎকলিত ছত্রগুলিতে লক্ষণীয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "বহুবার মরলির নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি।"[১] সাহিত্য-রসকে শিক্ষার্থীর মরমে পেঁছে দিতে পারা দুরূহ কাজ। মরলি সেই দুরূহ ব্রতে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। মরলির অধ্যাপনাগুণে যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের রসতীর্থে যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত।

মরলি সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি বলেছেন—

> হেনরি মর্লির মতো শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের বড়ো একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নূতন ধরণের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে পড়াতেন না। পাঠ্য বিষয় তিনি ক্লাসে এমন ভাবে আবৃত্তি করে যেতেন, যাতে ক'রে তার বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। তাঁর আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তার পরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম ; পাঠ্যবিষয় বুঝতে আমাদের কোথাও কোনো কষ্ট হত না। এমনিই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি।[২]

অন্যত্র বলেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাতড়ে চলি মাত্র। সেই সময়ে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে মাস তিনেকের জন্য সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেনরি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্‌সপীয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের আরণ বেরিয়ল এবং মিলটনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থগ্রহণের জন্য। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোটবইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষ সাধন সাহিত্য-শিক্ষার আর একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়—আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ-বিভাগ, শব্দ প্রয়োগের সূক্ষ্মত্রুটি বা শোভনতা সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটাই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলাম।[৩]

দিলীপকুমার রায়কে কবি বলেছিলেন—

দল পাকিয়ে শিক্ষা হয় না, শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে ছোটখাটো শ্রেণীবিভাগের পরে জোর দিতে হবে। বিলেতে থাকতে আমি এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলুম Henry Morley। দেখেছি কী অপূর্ব তাঁর শিক্ষাপ্রণালী। তাঁর সঙ্গে আমার মনের সম্পর্ক এ জীবনে ঘুচবার নয়। আমাদের দেশে তেমন শিক্ষক মেলে কই? শুধু মাত্র নাম করা যেতে পারে একজনার, তিনি হচ্ছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।[৪]

—এর থেকে বোঝা যায় মরলির সাহিত্য-অধ্যাপনার নিজস্ব বিশিষ্ট রীতিটিকে। তিনি সাহিত্যের আলোচনায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, শ্রোতা শিক্ষার্থীর তরুণ চিত্তে সাহিত্যরসের উদ্‌বোধনই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু শুধু সাহিত্যের অধ্যাপক রূপেই নয়, ভারতবাসীর উপর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গভীর সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরূপের পরিচয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে।

সাধারণ ইংরেজের মধ্যে আত্ম-অহঙ্কার এবং ভারতবাসী সম্পর্কে অশ্রদ্ধার যে ঔদ্ধত্য দেখা যেত সেকালে, মরলি ছিলেন সেই সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন সত্যিকারের 'বড়ো ইংরেজ'। মরলির চরিত্রের সেই মহৎ দিকটির পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি ঘটনার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন—

"তিনি আর একটা করতেন—সপ্তাহের একটি বিশেষ নির্ধারিত দিনে ছেলেরা নাম না দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু লিখে তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ দিনে ক্লাসে সেই সব লেখার সমালোচনা করতেন। আমরা সবাই সেই দিনটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতুম। তিনি কখনো কারো লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না, কারণ তাঁর মনে করুণা ছিল। শুধু একদিন তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। একটি ভারতীয় ছাত্র ইংরেজদের স্তুতিবাদ করে ও সেই তুলনায় স্বজাতীয়দের নিকৃষ্টতা দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে রেখে আসে। হেনরি মর্লি সেই প্রবন্ধ প'ড়ে খুব রেগে যান। তিনি সেদিন ক্লাসে এসে সেই প্রবন্ধটির খুব নিন্দা করেন এবং তিনি বলেন, এতে যে ইংরেজদের স্তুতি করা হয়েছে, তাতে যেন কোন সত্যিকারের ইংরেজ খুশি না হয়। সেদিন তাঁর মন অপ্রসন্ন ছিল বলে সেই প্রবন্ধটির ভাষার ও রচনার সমালোচনা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল। ভয় হচ্ছিল আমরাই না তাঁর লক্ষ্যগোচর হই। তারপর বাধ্য হয়ে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় সেই লজ্জা ঢাকবার জন্য। মেজদা একবার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষে ইংরেজ'[৫] সম্বন্ধে। তাতে ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে সব তথ্য। আমি অনেকটা তারই উপর লক্ষ্য রেখে ও কিছু রং চড়িয়ে ইংরেজদের নিন্দে করে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে চালান করে দিলুম। তার পরের দিনগুলি ভয়ে ভয়ে গণনা করতে লাগলুম। যেদিন সেই বিশেষ দিনটি এল, সেদিন আমি পলাতক। ভয়, কী জানি কী হয় আজ। সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালুম। বিকেলে এক জায়গায় বসে আছি হঠাৎ দেখি পিঠে এক চাপড়। আমার বন্ধু লোকেন পালিত[৬] উল্লসিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ওহে তোমার আজ জয়জয়কার। হেনরি মর্লি তোমার প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিষয়বস্তুর, কী তোমার লেখার ভঙ্গীর, কী তোমার ভাষার।' এবং তিনি ক্লাসে যে সব ইংরেজ ছাত্র ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বললেন 'তোমরা হয়তো অনেকেই পরে ভারতবর্ষে যাবে কিন্তু আজকের দিনে এই ভারতীয় ছেলেটি ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বললে তা যেন কোনদিন ভুলো না। আর তাদের সম্বন্ধে যেন কোনো অসম্মান না থাকে।' সেদিনের মতো এমন সত্যিকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাইনি।"[৭]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই প্রশংসার কারণ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। ভারতবর্ষে গিয়ে অধিকাংশ ইংরেজ শাসক ও কর্মচারী ভারতবাসীদের প্রতি যে অনুদার ব্যবহার করতেন, তার জন্য মরলি মনে মনে লজ্জিত ছিলেন। সেই পোষিত লজ্জাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির উদ্দেশ্যে ঘোষিত প্রশংসার মূল।

রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পকাল পড়েছিলেন লণ্ডনে য়ুনিভার্সিটি কলেজে। তিনি তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেতে যাত্রা করেন ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়া বেশি কিছু করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে পাশ্চাত্য নৃত্য গীতে কিছু দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু তারকনাথ পালিতের (১৮৪১-১৯১৪) আগ্রহে ও চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করা হয়। তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৭৯ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে। শুধু ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসই তিনি করেছিলেন স্বল্পকালের জন্য, কেননা দেখা যায় তিনি একবারই মাত্র ফি জমা দিয়েছিলেন ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং। তিনি ঠিক কতদিন ওখানে পড়েছিলেন বলা যায় না।[৮] লণ্ডনে থাকবার সময় তাঁর বাসস্থান ছিল ১০ ট্যাভিসটক স্কোয়ার। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন, রবীন্দ্রনাথও সেই সঙ্গে ফেরেন। কাজেই তিন মাসেরও কম সময় তিনি ছাত্র ছিলেন হেনরি মরলির।

মরলি (১৮২২-৯৪) য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৯ কাল পর্বে। তাঁর বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। বিহারীলাল গুপ্ত এবং লোকেন পালিতও তাঁর ছাত্র ছিলেন কিন্তু মরলি সম্পর্কে তাঁদের লেখা কিছু পাই নি।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলেতে যান। প্রাথমিক পরীক্ষা হয় ১৮৬৯ সালে এবং শেষ পরীক্ষা হয় ১৮৭১ সালে। ইংলণ্ড থেকে তাঁর অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্তকে লেখা পত্রগুলি গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে 'Three years in Europe' নামে। রমেশচন্দ্র তাঁর একখানি চিঠিতে হেনরি মরলি সম্পর্কে লিখেছেন—

"আমরা লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ক্লাস করতাম এবং কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে পড়াশুনার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য নিতাম। তাঁদের সেই সহৃদয় ব্যবহার আমরা কখনো বিস্মৃত হতে পারি না। তাঁরা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে দুজনের নাম উল্লেখ করতেই হবে, কেননা তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি মরলির মতো সদয়, বড়ো মনের খাঁটি মানুষ আর আমি দেখিনি। আমরা তাঁর ক্লাশ করেছি, ব্যক্তিগত সাহায্য নিয়েছি, তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি এবং নানা বিষয়ে তাঁর মূল্যবান বন্ধুজনোচিত উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়েছি। তাঁর গৃহ আমাদের জন্য অবারিত-দ্বার ছিল—সেই ঘরের দেয়ালে চারিদিকে থরে থরে বই সাজানো। সেই পড়ার ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে আমরা আনন্দে কত সময় কাটিয়েছি।"

রমেশচন্দ্র যে দ্বিতীয় অধ্যাপকের কথা লিখেছেন তিনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ আচার্য গোল্ডস্টুকর।[৯] অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে এখানে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হল না।

রমেশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে পুনরায় লণ্ডনে যান। তাঁর হৃদয়ে অতীত ছাত্রজীবনের মধুর স্মৃতি জেগে ওঠে। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"লণ্ডনের কোনো স্থানই আমার মনে ঠাঁই জুড়ে নেই, যেমন আছে য়ুনিভার্সিটি কলেজ, যেখানে আমি পড়েছি শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের কাছে, পরিচিত হয়েছি কয়েকজন মহৎ মানুষের সঙ্গে।···কতো শরতের আঁধার-করা বৃষ্টিমুখর দিন, অথবা শীতের তুষার-ঝরা প্রহর এই বাড়িগুলোর ছায়ায় আমার কেটেছে। কতো বছর পরে আমি আবার তাদের দেখলাম। সবার উপরে মনে পড়ল আমার সেই ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস আর সেই সৌম্য উদারমনা মহৎপ্রাণ অধ্যাপক মহাশয়কে, যিনি এখনো সেই বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন।

"তিনি ছিলেন আমাদের সত্যিকারের বন্ধু বলতে যা বোঝায় তাই, তখন বিদেশে আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল ঐ রকম একজন মানুষের সাহচর্য ও উপদেশ। তাঁর চেয়ে ভালো লোক জীবনে আমি আর দেখিনি।

"বলা বাহুল্য তাই এবার লণ্ডনে এসে প্রথমেই আচার্য হেনরি মরলির সঙ্গে দেখা করে আমার হৃদয়পোষিত গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁকে নিবেদন করবার সুযোগ নিলাম। আমার এক সহপাঠী বন্ধু[১০] ফর্লো নিয়ে তখন লণ্ডনে এসেছিলেন, আমরা দুজনে মিলে অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ি গেলাম এবং যার-পর-নাই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম ঠিক আগেকার মতোই তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন।

"মাথার চুল অবশ্য তুষারশুভ্র হয়ে উঠেছে, মুখেও বার্ধক্যের বয়োরেখা দেখা দিয়েছে কিন্তু আননের পবিত্র সরলতা ও সৌম্যশ্রী সেই পূর্বেকার মতো দীপ্যমান। তিনি আমাদের সেই আগের দিনের মতোই অভ্যর্থনা করলেন, আমাদের ছাত্রজীবনের কতো কথার আলোচনা হল। আঠারো বছর আগে আমি তাঁর কাছে পড়েছিলাম এবং এখনো তাঁর সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। কাজেই খুব মজার ব্যাপার হল, যখন ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বোকার মতো একটা ভুল করে বসলাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"তিনি সহজ কৌতুকের হাসি হেসে আমার ভুলের জন্য বকলেন এবং বললেন যে দেখা যাচ্ছে তাঁর পড়ানো আমি সব ভুলে মেরে দিয়েছি। এই সস্নেহ তিরস্কার আমি কখনো ভুলতে পারব না।

"তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যায় আসতে বললেন এবং মিসেস মরলি আমাদের ঠিক আগেকার মতো আপ্যায়ন করলেন। আমরা অধ্যাপক মহাশয়ের গ্রন্থ-পরিপূর্ণ পাঠাগারে গেলাম। এই সেই ঘর যেখানে কত শীতের রাত্রি আমরা কাটিয়েছি। সেদিনকার সন্ধ্যাটি চমৎকার কেটেছিল।"

হেনরি মরলির ব্যক্তিরূপটি রমেশচন্দ্র দত্তের পত্রবর্ণিত ছত্রগুলিতে অনবদ্য-রূপে ধরা পড়েছে। আঠারো বছর পূর্বেকার একজন ভারতীয় ছাত্রকে চিনতে তাঁর বিলম্ব হয় নি; তাঁর হৃদয়ের দরজা তিনি পরম স্নেহে খুলে ধরেছেন সেই ছাত্রকে স্বাগত জানাতে।

মরলির সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের সহপাঠী ও বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) যে বিবরণী রেখে গেছেন তাঁর আত্ম-জীবনীতে[১১] তার মূল্যও কম নয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনিও লণ্ডনে য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হন। তিনি লিখেছেন—

"লণ্ডনে পেঁছে শীঘ্রই আমরা য়ুনিভার্সিটি কলেজের কয়েকটি ক্লাসে যোগ দিই এবং কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে বাড়িতে পড়তে থাকি। তাঁরা আমাদের সঙ্গে সুন্দর সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক গোল্‌ডস্টুকর ও অধ্যাপক হেনরি মরলির স্নেহপূর্ণ ব্যবহার বিশেষ করে স্মরণীয়। তাঁরা বোধ হয় পিতামাতা ও আত্মীয়বিচ্ছিন্ন এই প্রবাসী ছেলেদের মনের অবস্থা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। হেনরি মরলি আমাদের তাঁর নিজের পরিবারের লোকের মতোই দেখতেন। গোল্‌ডস্টুকর খঞ্জ ও অকৃতদার ছিলেন, ঠিক ভারতীয় 'গুরু'র মতো যুগপৎ স্নেহ ও কঠোরতা তাঁর মধ্যে ছিল।"

এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, গোল্‌ডস্টুকর ম্যাক্‌সমুলারের খ্যাতিতে ঈর্ষা বোধ করতেন। তাঁর মেজাজ বেশ গোলমেলে ছিল। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"একদিন আমরা সবাই চেয়ারিং ক্রসের পাশ দিয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ কী একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে গোল্‌ডস্টুকর একেবারে রেগে ফেটে পড়লেন। অধ্যাপক মরলিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'ব্যানার্জী, তুমি মনে কিছু কোরো না। ওঁর একখানা বুটের তলা খুলে গেছে, সেজন্যই মেজাজ বিগড়ে গেছে'। তাই শুনে আমরা হেসে ফেললাম।"

মরলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন—

"হেনরি মরলির সকল কর্মের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম জীবনের প্রতি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকৃত ভালোবাসা। জীবন তাঁর কাছে ছিল সূর্যালোকের মতো ; নিজের বাড়ির খুশির হাওয়া তাঁকে আরও উজ্জ্বল করে তুলত। তিনি সর্বদাই কাজ নিয়ে থাকতেন অথচ সবসময় হাসিখুশী।

"আমার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ে যখন গোলমাল চলছিল[১২] তখন তিনি আমার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন এবং বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেনস্‌কে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলেন। ডিকেনস্ আমার পক্ষ নিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'Good Words'[১৩] পত্রিকায় কড়া প্রবন্ধ লেখেন। আমার সেই দুর্যোগের দিনে সর্বদাই তাঁর কাছ থেকে পেতাম উৎসাহ ও আনন্দ। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'ব্যানার্জী তুমি যে লড়াই চালাচ্ছ, তার জন্য ওরা একদিন তোমার প্রতিমূর্তি গড়বে'।[১৪]

এই 'বড়ো ইংরেজ' মরলি পাণ্ডিত্যে ও চারিত্রে সমুজ্জ্বল একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

তারকনাথ পালিতের ছেলে লোকেন পালিত য়ুনিভার্সিটি কলেজে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লোকেন সম্পর্কে লিখেছেন—

"বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরাজী-সাহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় বছর-চারেকের ছোটো…। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে-বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ, বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

"য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে ; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে-কাজটা চুপিচুপি সারিলে কাহারও আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না—কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত।…

"এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম।"

কিন্তু লোকেন পালিতের হেনরি মরলি সম্পর্কে কি ধারণা ছিল জানবার কোনো উপায় নেই। তিনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে পুরো তিন সেসন পড়েছিলেন।[১৫] কিন্তু তাঁর সেদিনকার স্মৃতি কোথাও লিপিবন্ধ হয়ে নেই। থাকলে হেনরি মরলি সম্পর্কে হয়তো নতুন অনেক কথা জানা যেত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিন সঙ্গী

১. লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫-১৯১৫)

রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার বিলেত যাত্রা, ব্রাইটন্ বাস, তারকনাথ পালিতের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে আগমন ও ১০ ট্যাভিস্টক স্কোয়ারে থেকে য়ুনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডনে অধ্যাপক হেনরি মরলির কাছে ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষা গ্রহণের কথা আগের রচনাটিতে বলা হয়েছে। তারকনাথ পালিত (১৮৪১-১৯১৪) বিখ্যাত ব্যারিস্টার, রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রের বন্ধুত্বের সূচনা হয়। লোকেন্দ্র ১৮৭৯-৮০, ১৮৮০-৮১, ১৮৮১-৮২ পুরো তিনটি সেসন য়ুনিভার্সিটি কলেজ লণ্ডন-এ পড়েছিলেন। লোকেন্দ্র ল্যাটিন, ইতালীয়ান, ফ্রেঞ্চ, পদার্থবিদ্যা, দর্শনবিদ্যা প্রভৃতি ভাষা ও বিষয় পড়েছিলেন। লোকেন্দ্রের ভাইয়েরা সত্যেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ওখানে পড়েছিলেন। লোকেন্দ্র ১৮৮৬ সালে ১৮ অকটোবর তারিখে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৩ ডিসেম্বর ভারতে এসে সরকারি কর্মভার গ্রহণ করেন।

প্রথমে তিনি রাজশাহী জেলার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রূপে কর্মভার নেন ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ তারিখে এবং ১৯১২ সালে ৩১ মার্চ অবধি বাঁকুড়ার জেলা ও সেসন জজ রূপে কাজ করেন। চাকরি জীবনের বইয়ে এই তাঁর শেষ পৃষ্ঠা। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস রেকর্ডস্ থেকে জানা যায় লোকেন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে ১৫ মে তারিখে সরকারি কর্মভার পরিত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করেন ও ঐদিনই ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হন। তিনি ১৯১৩ সালে ৬ জুন তারিখে ইংলণ্ডে পৌঁছান। তাঁর বার্ষিক প্রাপ্য ১ হাজার পাউণ্ড পেনসন হিশেবে ১৯১৩ সালে ১৫ মে থেকে ১৯১৫ সালে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত ভোগ করেন। তাঁর ব্যাঙ্কার গ্রিণ্‌ডলেজ অ্যাণ্ড কোম্পানীর মারফতে তিনি পেনসন নিতেন।[১] লোকেন্দ্রের পেনসন বইতে একটি 'নোট' পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় তিনি বিলেত থেকে ১৯১৪ সালে ২৩ জানুয়ারি তারিখে একবার দেশে ফিরে এসেছিলেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে কিছুদিনের জন্য যোগ দিয়েছিলেন বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের রেকর্ডস্ থেকে জানা যায় তিনি ১৯১৪ সালে ৪ঠা মার্চ তারিখে ব্যারিস্টার হিসেবে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।[২]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

University College, London.— *Faculty of Arts & Laws.*

No. 416

Name	L Palit
Age	14yrs 5/9/80
Usual Residence	Calcutta
Residence in London.	

No.	Classes.	Amount.		
49	Latin	1/1	1/1	—
	Greek			
106	English	2/2	2/2	—
45	French	1/1	1/1	—
	German			
	Italian			
	Spanish			
	History			
	Political Economy			
	Philosophy of Mind and Logic			
68	Mathematics, Pure	10	10	—
	Mathematics and Mechanics, Applied			
90	Physics	5	5	—
	Physical Laboratory			
	Chemistry			
	" Practical			
	" Analytical			
	Zoology and Comparative Anatomy			
	Botany			
	Geology : Mineralogy			
	Hygiène			
	Architecture			
	Engineering and Mechanical Technology			
	Mechanical Drawing			
	Work Room			
	Chemical Technology			
	Hebrew			
	Sanskrit			
	Telugu			
	Arabic : Persian			
	Roman Law			
	Jurisprudence			
	Constitutional Law and History			
	Fine Art			
	Perspective			
	Anatomy			
		£39	18	—

লোকেন পালিত : ভর্তির নিদর্শনপত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

University College, London.—*Faculty of Arts & Laws.*

No. 552

Name	R. Tagore
Age	18
Usual Residence	Bengal
Residence in London.	10 Tavistock Square, W.C.

No.	Classes.	Amount.	
	Latin		
	Greek		
153	English	8	8
	French		
	German		
	Italian		
	Spanish		
	History		
	Political Economy		
	Philosophy of Mind and Logic		
	Mathematics, Pure		
	Mathematics and Mechanics, Applied		
	Physics		
	Physical Laboratory		
	Chemistry		
	" Practical		
	" Analytical		
	Zoology and Comparative Anatomy		
	Botany		
	Geology: Mineralogy		
	Hygiène		
	Architecture		
	Engineering and Mechanical Technology		
	Mechanical Drawing		
	Work Room		
	Chemical Technology		
	Hebrew		
	Sanskrit		
	Telugu		
	Arabic: Persian		
	Roman Law		
	Jurisprudence		
	Constitutional Law and History		
	Fine Art		
	Perspective		
	Anatomy		
	Bhulna	£ 8	8

রবীন্দ্রনাথ : ভর্তির নিদর্শনপত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষকে গুলি করার অভিযোগে বিপ্লবী নির্মলাকান্ত রায় গ্রেফতার হন। হাইকোর্টের বিচারে তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হন। তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন নর্টন, সি. আর. দাশ, লোকেন পালিত ও জে. এন. রায়।

তাঁর ইংলণ্ডে বাসকালীন ঠিকানা সরকারি ভাবে পাওয়া যায় নি। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই. সি. এস. (অবসরপ্রাপ্ত) আমাকে জানিয়েছেন যে হ্যাম্পস্টিডে মিসেস পালিত থাকতেন ১৯১৩ সালের শেষ দিকে। লোকেন্দ্রের মৃত্যুর পর (১২ নভেম্বর, ১৯১৫) মিসেস পালিত নিজের বাড়িতে ভারতীয় ছাত্রদের থাকবার বোর্ডিং হাউস করেছিলেন। দেবিকারাণী কিছুদিন বোধ হয় সেখানে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকেন্দ্রর প্রথম পরিচয় হয় বিলেতে। য়ুনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনে পাঠকালীন লোকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য আগেই বিবৃত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে তারকনাথের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা পূর্বেই ছিল। সেজন্য লোকেন্দ্র যখন আই. সি. এস. হয়ে এলেন তখন স্বভাবতই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি হলেন। ছুটিছাটা পেলে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের বির্জিতলার বাড়িতে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন প্রিয়নাথ সেনকে—

> লোকেনের তাড়নায় বালিগঞ্জে গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তোমরা আসিয়া ফিরিয়া গেছ। আমার দূরদৃষ্ট।

চিঠিটি ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের শেষে বা ১৮৮৭ সালের গোড়ার। কেননা লোকেন্দ্র দেশে ফেরেন ১৮৮৬ সালে ১৩ ডিসেম্বর তারিখে। তারপর থেকেই ১৯১৩ সাল অবধি অর্থাৎ যখন লোকেন্দ্রনাথেরা শেষবার বিলেতে চলে যান তখনও ওঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল।

১৯১২ সালে ২৮ জানুয়ারি তারিখে (১৩১৮, ১৪ মাঘ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক টাউন হলে যে রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়, সে উৎসবে লোকেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।[৬] আবার ১৯১৩ সালে আমেরিকা থেকে বিলেতে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—

> আজ মেবেল তাদের বাসায় চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল।[৭]

এর পরের দুবছর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকেন্দ্রের সংযোগ কেমন ছিল জানবার উপায় নেই। তবে লোকেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে উপাসনা সভায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত করেছিলেন বলে জানা যায়।

লোকেন্দ্র বিবাহ করেন লন্ডন প্রবাসিনী মেবেল দত্তকে (Mabel Dutt)। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর ব্রাইটনের স্মৃতিকথায় লিখছেন ঃ

> দেশের লোকের মধ্যে Mabel Dutt বেশ সুন্দরী ছিলেন। তাঁর বাপ ক্ষেত্রমোহন দত্ত মেম বিয়ে করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> আসতেন। একদিন মদ খেয়ে গেলাসে অল্প রেখেছিলেন বিবি [ইন্দিরা দেবী] সেটুকু খেয়ে ফেলেছিল। মেব্‌ল আমাদের ছেলেদের চেয়ে কিছু বড় ছিল ও তাদের শোবার সময় গল্প বলত। তাতে Beelzebub এর কথা থাকত। তারা এখনো মনে করে। আর একজন ছিলেন অ্যানি চক্রবর্তী।[৭]

লোকেন্দ্রের বিবাহ ঠিক কোন তারিখে হয় জানতে পারি নি। তবে ১৯০২ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন—

> ...কলকাতায় গিয়ে আমি দুই একটা কাজে যোগ দিই সত্য এবং লোকেনের নববধূকে দেখতে গিয়েছিলেম সেও ঠিক...[৮]

এর দ্বারা লোকেন্দ্র ও মেব্‌লের বিবাহ ১৯০২ সালে হয়েছিল অনুমান করা যায়।

লোকেন্দ্ররা নিঃসন্তান ছিলেন। শিশুদের প্রতি তাঁর অন্তরে গভীর স্নেহ সঞ্চিত ছিল। তিনি যখন গয়ায় ছিলেন (১৯০৭) তখন রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি (তাঁর এই একমাত্র চিঠি যা অদ্যাবধি রক্ষিত) লেখেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর বিবাহের সময়। নিজেকে 'লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা' বলে 'আস্তাকুঁড়' থেকে উদ্ধারের জন্য 'ভাই রবি'কে একবার গয়ায় যেতে অনরোধ করেন। মীরা-র প্রতি স্নেহ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন "আমার নিজের কোনও কাচ্চা বাচ্ছা নেই"...। (৪ জুন ১৯০৭)

সত্যেন্দ্রনাথের বিরজিতলা বা উড্‌স্ট্রীটের বাসায় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশ বসত। ১৮৮৮ সালে এখানকার এই মজলিশ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> 'পারিবারিক স্মৃতি' খাতায় সাহিত্যিকেরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য ; একই বিষয়ে বহুজনের বহুমত হইতে পারে —পক্ষে ও বিপক্ষে : বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই ; অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান—তাঁহার হাতে কোনও সাময়িক পত্রিকা নাই ; নানা কথা নানা ভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপন মনে ; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে—তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে ; তাছাড়া আসেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী, সিভিলিয়ান লোকেন পালিত।[৯]

'পারিবারিক স্মৃতি' খাতার প্রকৃত নাম 'পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক' ; তার নিচে লেখা আছে "ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলেই (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন) আপন আপন মনের ভাব-চিন্তা-স্মর্তব্য বিষয়, ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন"। লোকেন্দ্রের লেখা মন্তব্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তার কয়েকটি উৎকলন করে দেওয়া হল—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিন্দা—নিঃস্বার্থ পরোপকার —লোকেন।
নিচে লেখা—ইহার ইংরাজী অনুবাদ কি হইতে পারে? (রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে)
তার নিচে—Unselfish malignity (?) or malevolence or maleficence— L. P. 22/10/88
রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ ঐ খাতায় লেখেন—All Bosh !!
এর উত্তরে লোকেন্দ্র লেখেন—

লেখক ভুলিয়াছেন যে তিনিও বাঙ্গালি। আর তাঁর Virtuous Indignation যে হয়েছে তাও বাঙ্গালির পক্ষে ভাল চিহ্ন! আজ সকালে ১৫ জন লোক জুটিয়াছিল. কিন্তু ১৫ বৎসর আগে একজন লোকও জুটিত কিনা সন্দেহ। আমাদের মধ্যে বড়লোকদের সম্মান করিবার জন্য যে কিছু আয়োজন করা হয় তাও আমাদের মধ্যে খুব progress হয়েছে বলতে হবে। আমাদের মধ্যে আজকাল যে কেহ কেহ [...] হচ্ছে তাও Sham মনে করে, আরও কিছু substantial, আর real এর আকাঙ্ক্ষা করে তাতেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে true spirit এর নিদানপক্ষে ছায়া পড়েছে। যাঁরা Station-এ গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ যে Mr. Banerjeaকে[১০] চিনতেন না, তাতে লেখক অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে তাতে আরও আমাদের আনন্দ হওয়া উচিৎ। যে Mr. Banerjeaকে কখন দেখেনি অর্থাৎ দেখবার সুযোগ হয়নি এমন লোকে যে খবরের কাগজ থেকেই হোক আর লোকের মুখ থেকেই হোক Mr. Banerjeaর নাম শুনেছে এমন লোক যে আমাদের মধ্যে আজকাল হচ্ছে, তাতেই দেখা যায় যে, Political Education আর interest in public affairs কতদূর পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে penetrate করেছে। লেখক বলেছেন all Bosh ! তাই আমি বলি Not at all !!!

—লোকেন পালিত। 13. 11. 88

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বারের বিলেতযাত্রার সঙ্গী হন লোকেন্দ্রনাথ। এবারও যান মেজদাদার সঙ্গে। 'সিয়াম'(Siam) জাহাজে ১৮৯০ সালে ২২ অগস্ট তাঁরা রওনা হলেন। জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্র 'দুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং সৃষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে' ফেলেন। এবার রবীন্দ্রনাথ বিলেতে বেশি দিন ছিলেন না। তারকনাথের পত্নী তাঁর অন্য পুত্র কন্যা নিয়ে তখন লন্ডনে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ফিরলেন একা, ৯ অক্টোবর তারিখে 'টেমস্' জাহাজ যোগে দেশের দিকে পাড়ি দিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪ নভেম্বরে এসে পা দিলেন বোম্বাই শহরে। এই যাতায়াতের বিবরণ তাঁর 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে সঙ্কলিত। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন—'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সুহৃদ্বরকে'। এই গ্রন্থটির 'খসড়া' অংশে লোকেনের বহু চিত্রাংশ আছে—

১. লোকেন Maryর সঙ্গে দেখা করতে গেছে—রাত দুপুর বাজে, তখনো সে ফেরেনি। আমার বিশ্বাস Maryকে লোকেন একটু বিশেষ ভালোবাসে।

২. লোকেন আমাকে সন্ধের সময় বললে, আমার বাংলা গান শুনতে আজকাল বড়ো ভালো লাগছে, তুমি কতকগুলো বাংলা গান গাও। জ্যোৎস্নার [স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র] কাছে একটা 'মায়ার খেলা' ছিল, সেইটে নিয়ে প্রথম থেকে একটা একটা করে অনেকগুলো গাওয়া গেল। আমার বেশ লাগছিল, লোকেনেরও ভালো লাগল।

৩. আজ বিকেলে লোকেন আমাতে দুজনেই পাগড়ী পরে বেরিয়েছিলুম। রাস্তার লোকের খুব মজা লেগেছিল!

এই ধরনের টুকরো-টুকরো ছবিতে লোকেন্দ্রের ব্যক্তি-পরিচয় বেশ ফুটে ওঠে। লোকেন্দ্র ফিরে এসে যখন রাজশাহীতে ম্যাজিস্ট্রেট, রবীন্দ্রনাথ তখন জমিদারি দেখাশোনা সূত্রে পদ্মাতীরের মানুষ। শিলাইদহ, বোয়ালিয়া, নাটোর থেকে চিঠি লিখছেন ভাইঝি ইন্দিরাকে। ১৮৯২ সালে ১ ডিসেম্বর তারিখে নাটোর থেকে লিখছেন—

কাল লোকেনে আমাতে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ মাইল পথ এবং 'আমরা দুজনে যাত্রী'। লোকেন একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে—আমি গুন্ গুন্ স্বরে 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গান ধরলুম—এই রকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি এবং সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পোঁচেছে এমন সময় লোকেন আমার গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিল।[১১]

রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রের কাছ থেকে 'প্রমারা' খেলা শেখেন ঠিক এই সময়ে। প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, "সুরেনের চিঠিতে দেখলুম কলকাতায় তোমরা খুব প্রমারা খেলা জমিয়েচ। শুনে খুসি হবে কালিগ্রামে একত্র নৌকাবাস কালীন লোকেনের কাছে আমিও দু একটা lesson নিয়েছি"।

রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরে নির্জন বাসে একখানি প্রিয় গ্রন্থ পড়েন। বইখানি Amiel's Journal. পিতা দেবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনে অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই বইখানি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পিতৃদত্ত বইটি পড়েন নি, পড়েন বন্ধু লোকেন্দ্রের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বইটি। ১৮৯৪ সালে ২২ মার্চ তারিখে পতিসর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—

আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখেনে থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উলটে পালটে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখো-মুখি হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইতে পেয়েছি![১২]

১৮৯৪এর পর লোকেন্দ্রের উল্লেখ নানা সূত্রে মেলে। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের 'পকেট বুক' থেকে জানা যায় কনগ্রেসের নাটোর অধি-বেশনের আগের বছর ১৮৯৬ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কনগ্রেসের অধি-বেশন হয়। এই উপলক্ষে প্রথম 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাওয়া হয়। জোড়া-সাঁকোয় কনগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু বান্ধবসহ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা ভেবেছিলেন। ঐ সূত্রে পকেটবুকে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের সঙ্গে প্রিয়নাথ সেন, চন্দ্রনাথ বসু, R. C. Datta, L. Palit, জগদীশচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম পাওয়া গেছে। লোকেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি।

১৮৯৯ সালে ২০ নভেম্বর তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন—

মাঝে লোকেন দিন দুই তিন এখানে থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত সাহিত্য-চর্চা করে গেছে। সে কটা দিন বৈষয়িক বিভ্রাট সমস্ত ভুলে একরকম ছিলুম ভাল।[১৩]

কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রবীন্দ্রনাথ তখন ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিব্রত, বিপর্যস্ত ও ঋণগ্রস্ত। বড়ো মেয়ের বিবাহ-ব্যাপারে চিন্তিত। লোকেন্দ্রের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথকে শান্তি ও আনন্দ উভয়ই দান করে। সংসার-বিষবৃক্ষের দুটি মধুর অমৃতোপম ফল কাব্যাস্বাদ ও সজ্জন-সঙ্গ দুইই তিনি লাভ করেন।

লোকেন্দ্র এর পর ছুটি নিয়ে বিলেত যান। ফিরে এসে বোধ হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুদিন যোগাযোগ রাখতে পারেন নি সেজন্য কবি প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন (জুলাই, ১৯০০)—

লোকেন বহুকাল পরে দেশে ফিরিল—এক লাইন খবর নাই। শ্রাবণমাসে কি মীনরাশির সংবাদ ভাগ্যে কোন গোল আছে?[১৪]

এই সময়ে ১৩০৭ সালে শ্রাবণমাসে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্য আত্মপ্রকাশ করে। শিলাইদহে এর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয় এবং কাব্যখানি তিনি 'সুহৃত্তম' 'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত'কে উৎসর্গ করেন কবিতায়—তার থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে দিলাম—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশা করি নিদেন পক্ষে/ ছটা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন বাসে/ সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে/ স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
কতকটা কি অগ্নিকণায়/ ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?

মজার কথা লোকেন্দ্রনাথ ১৩০৭ সালের ভাদ্র মাসে সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় পঁচিশটি রুবাইয়ের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ওমরখৈয়ামী আবহাওয়া 'ক্ষণিকা'য় কিছু আছে। যাই হোক রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রে জগদীশ-চন্দ্র বসুকে একখানি চিঠিতে (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০০) লিখছেন—

আমি ছবি আঁকছি শুনে যদি আশ্চর্য হন ত লোকেন কবিতা লিখতে বসে গেছে শুনে বোধহয় কম আশ্চর্য হবেন না। তার এতই দুরবস্থা হয়েছে! বেচারাকে শেষকালে কবিতা লেখালে। ওমার খায়েমের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করছে! দুই একটা নমুনা দেখলে তার মনের অবস্থা কতকটা বুঝতে পারবেন।—

মূঢ় তোরা ত্যজি সুখ স্বর্গসুখআশে
থাকিস মুক্তির তরে অন্ধ কারাবাসে।
সুদ পাবি বলে' ফেলে রাখিস পাওনা,
ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে![১৫] ইত্যাদি

ঠিক এর আগে লোকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যচয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত' হয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন কমে এসেছে।[১৬] এতে রবীন্দ্রনাথ মনঃক্ষুন্ন হন। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একখানি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে (অগস্ট, ১৯০০) রবীন্দ্রনাথ বাড়ি তৈরি বাবদ [জোড়াসাঁকোয় নিজের জন্য তৈরী 'লালবাড়ি'] লোকেন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যাবসা করতে গিয়ে লোকসান খেয়ে খেয়ে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হন—তাঁর পক্ষে ঐ ঋণ পরিশোধ করা অসাধ্য ছিল, তিনি প্রিয়নাথ সেনকে প্রস্তাব দেন—

'আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যের copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০৲ টাকায় কেনাতে পার? শেষের যে বইগুলি বাজারে গেছে সে আমি শিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব—লোকেন ঋণ শোধের জন্যে আমাকে কখনো তাড়া দেবেনা আমি সেই জন্যই নিজের তাড়ায় তার ঋণ শোধের জন্য মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। সে অত্যন্ত অসময়ে আমাকে এই টাকাটা দিয়ে নানা বিপত্তি হতে রক্ষা করেছে—তারপর থেকে এই টাকাটা সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্যই করে না।[১৭]

লোকেনের উদারতা ও বন্ধুপ্রীতির এ একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।[১৮]

এই পর্বে দেখি লোকেন খুলনায় বদলি হয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে সেখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'দিন কতকের জন্যে' বেড়িয়ে আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। রবীন্দ্রনাথ খুলনায় গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথ এই সময় লোকেন্দ্রকে তাঁর 'গল্প তর্জমার জন্যে' ধরেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে ১৩০৭ সালে ৫ অগ্রহায়ণ এ সম্পর্কে একখানি পত্রে লিখছেন—

—'কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারি নে। সে এখন আমার কাব্যনির্বাচনে ব্যস্ত আছে।…

বলাবাহুল্য কোনটিই হয় নি। কাব্যচয়ন সংগ্রহ বা গল্পগুচ্ছের ইংরেজি তর্জমা শেষ পর্যন্ত দুটিই পরিকল্পনায় থেকে গেছে। ১৯০১ সালে মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিতে জানান ইস্টারের ছুটিতে লোকেন্দ্রকে তিনি শিলাইদহে আমন্ত্রণ করেছেন এবং প্রিয়নাথও যদি আসেন তাহলে তাঁদের মধ্যে পরিচয় হয়। কিন্তু লোকেন্দ্র বা প্রিয়নাথ কেউই যেতে পারেন নি। তাঁদের পরিচয় হয়েছিল মনে হয় অনেক পরে যখন লোকেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দুজনেই গয়ায় ১৯০৬-১৯০৭ সালে।[১৯]

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা) বিবাহ হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে, অনেক ঝঞ্চাটের পর। কিন্তু তাঁর এই প্রথম কাজে তাঁর বন্ধুরা উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাই তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে দুঃখ করে লিখেছেন (মে ১৯০১)—

তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ (ত্রিপুরাধিপতি) সে সময় বোধকরি আগরতলায়, নাটোর জগদিন্দ্রনাথ নীলগিরিতে।[২০]

এবং লোকেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রায় অভিযোগ করেছেন জগদীশচন্দ্রের কাছে—

…এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামীগৃহে পেঁাছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।[২১]

এখানেই বলে রাখা ভালো যে লোকেন্দ্রের যে ভুল বেলার বিবাহের পর ঘটেছিল, অর্থাৎ বিলেত থেকে চিঠি না লেখা, মীরার বিয়ের ব্যাপারে তা হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে গয়া থেকে ১৯০৭ সালের ৪ জুন তারিখে যে চিঠি লিখেছেন তার থেকে কয়েক ছত্র উৎকলন করছি—

…ইতিমধ্যে মীরার বিবাহ সম্বাদ সম্বন্ধে, আমার ভালোবাসা, সস্নেহ আদর আর শুভাকাঙ্ক্ষা তাকে জানাবে। এখানে তাকে কিছু আদরচিহ্ন-স্বরূপ পাঠাবার জন্য খুঁজেছিলুম, কিন্তু এখানে কিছু পাওয়া যায় না। তাই লিলুকে [লোকেন্দ্রের ভগ্নী] লিখে দিয়েছি। তার জন্য একটা সাড়ি কিনে যেন পাঠায়। ভরসা করি লিলু সময়ে পাঠাতে পার্বে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> আমার নিজের কোনও কাচ্চা বাচ্ছা নেই, তাই আমার বন্ধুদের ছেলে-মেয়েরা অনেকটা সেই স্থল অধিকার করে। কিন্তু তারা সকলেই দূরে চলে যায়। আমাদের কাছে তারা যতটা তাদের কাছে আমরা কেউ নই। মীরাকে আমার স্নেহ আশীর্বাদ দিও।…

চিঠিখানিতে লোকেন্দ্রনাথের বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

লোকেন্দ্রের সিভিলিয়ান সত্তার মধ্যে আরেকটি সত্তা ছিল সেখানে তিনি স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা মর্মে-মর্মে বোধ করতেন। সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

> তিনি বললেন একদিন 'এত যে ভাব ছিল আমার ইংরেজ ও স্কচ সহ-পাঠীদের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কোন পার্থক্য বোধই আসত না। তবু যেদিন একদিন তাঁদের গান শুনলুম—
>
> Rule Britannia ! Britannia rules the waves !
> Britons never shall be slaves.
>
> সেদিন অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে অনুভব করলুম—আমি কত দূরে ওদের থেকে, কত পর ওদের'।[২২]

এরই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'আমার দেশ' নামক দেশাত্মবোধক গান শুনে লোকেন্দ্রনাথের মনের ভাব কেমন হয়েছিল তার বিবরণ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—

> 'আমার দেশ' গানটি শুনিয়া প্রৌঢ় পালিত সাহেবের সেই যে উন্মাদনা আমি দেখিয়াছি এ জীবনে তাহা আমি কখনো ভুলিতে পারিব না।[২৩]

লোকেন্দ্রনাথ বাংলা লেখায় হাত দিয়েছিলেন বোধ করি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ও তাড়নায়। ১২৯৮ সালে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' তার অনেক আগে বার হয়েছিল। এই 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকায় লোকেন্দ্রের বাংলা রচনা ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

> সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে 'সাধনা'র সম্পাদক হইয়া অবিশ্রাম গতিতে যখন গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই।[২৪]

'সাধনা' পত্রিকায় লোকেন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কিত তিনটি পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—'সাহিত্যের সত্য' (১২৯৮ চৈত্র), 'সাহিত্যের উপাদান' (১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ) ও 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ' (১২৯৯ শ্রাবণ)। রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রকে প্রবন্ধ লিখতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলায় মনে হয় তিনিই পাল্টা প্রস্তাব দেন যে, 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পর্কিত মতামত নিয়ে চিঠি চালাচালি হোক।

রবীন্দ্রনাথ সেই সূত্রে লিখেছেন—

> 'লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ।'[২৫]

তবু পত্রে 'বক্তব্য' এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে 'সাহিত্যের সত্য' সম্বন্ধে কথা তুলেছেন। তাঁর মতে—

> 'সত্য'কে এমন ভাবে প্রকাশ করা যাক যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক; তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না। আমার বোধ হয়, সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই। যখন কোনো-একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে করে একটা অনানুষিক স্বয়ম্ভূ সত্য বলে মনে হয়, তখন তাকে বিজ্ঞান-দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়।

লোকেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ধারণা, যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে স্বীকার করতে পারেন নি, তিনি লেখেন—

> তোমার মতে সাহিত্য হচ্ছে লেখকের আত্মপ্রকাশ। তা হলে শেক্সপিয়রের নাটক কি সাহিত্য নয়? শেক্সপিয়রের নাটকে শেক্সপিয়রের নিজত্ব কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না; হ্যামলেট পড়ে' আমরা শেক্সপিয়রকে দেখতে পাই না—খালি হ্যামলেটকেই সম্পূর্ণ রকমে দেখতে পাই। আমি বলি সাহিত্য পাঠকের আত্ম-উপলব্ধির একটা উপায়—লেখকের আত্মপ্রকাশ তাতে থাক আর নাই থাক। যে পরিমাণে আমরা আপনার মধ্যে হ্যামলেটের হ্যামলেটত্ব অনুভব করতে পারি, আর হ্যামলেটের মধ্যে আপনাকে স্থাপন করতে পারি সেই পরিমাণে হ্যামলেট নাটক সাহিত্য। এ কথাটা খালি নাট্যকাব্য সম্বন্ধে নয়, গীতিকাব্য সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ ভাবে সত্য। সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যে আমাদের নিজের নিজত্ব জেগে ওঠে—আমরা নিজের হৃদয়ের কথা শুনি, আর সেইজন্যই ভালো লাগে… আপনার নিজত্ব সমস্ত ঢেলে দিয়েও যদি আমি অন্যের কাছে তার নিজের কথা শোনাতে না পারি তা হলে আমার কবিতা কবিতাই নয়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'আলোচনা' নামক পত্র-প্রবন্ধে 'সত্য' ও কবির 'আত্মপ্রকাশ' প্রধান আলোচ্য বস্তু ছিল। সে-সম্পর্কে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করতে গিয়ে লোকেন্দ্রনাথ লেখেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> যেমন আত্মপ্রকাশ কবিতা গড়বার একটা প্রণালী মাত্র, সত্য সেই রকম সাহিত্য গড়বার উপাদান মাত্র।...সাহিত্যের কাজই হচ্ছে হাতের কাছে যাই থাকনা কেন—সত্যই হোক আর কল্পনাই হোক—তাকে এমন করে সাজানো যাতে আমাদের মনে কতকগুলি বিশেষ ভাব জেগে ওঠে।

লোকেন্দ্রনাথ সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত রোমান্টিক-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন নি, তিনি তাই লেখেন—

> সত্যকে কিন্তু কি রকম করে যে 'নিজের' করবে 'নিজের জীবন দিয়ে মণ্ডিত করে প্রকাশ করবে' আমি বুঝতে পারছিনে। একটা বিশেষ সত্য বুঝতে পারি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্যের মানে বুঝতে পারিনে।

রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথের এই পত্র-প্রবন্ধের উত্তর দেন 'সাহিত্য' নামক রচনাটিতে। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লেখেন—

> তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেক্সপিয়রের নাটককে কী বলবে ? সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া অসম্ভব—

তাই রবীন্দ্রনাথ জীবজগতে লামার্ক-ডারউইন কথিত আত্মরক্ষা-বংশরক্ষার দৃষ্টান্ত দিয়ে সাহিত্যের কার্যকেও দুটি অংশে ভাগ করেছেন 'আত্মপ্রকাশ' ও 'বংশ-প্রকাশ'। তিনি গীতিকাব্যকে 'আত্মপ্রকাশ' ও নাট্যকাব্যকে 'বংশপ্রকাশ' নাম দিয়েছেন এবং 'বংশপ্রকাশ' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন সেটি বিস্তৃত-ভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

> লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানব প্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানব প্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয় ; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই-সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বন্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।[২৭]

এই সূত্রে তিনি শেক্সপীয়রের কথা তুলেছেন। কেননা পূর্বের আলোচনায় লোকেন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের হ্যামলেট চরিত্রের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। সেজন্য এবার রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গ তোলেন—

> শেক্সপীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্সপীয়রের আত্মপ্রতিকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারিনে।
>
> যিনি যাই বলুন শেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধবর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ; যেখান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডেমোনার প্রতি প্রীতি, ফলস্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ, শেক্সপীয়রের মানবহৃদয়কে চিরদিনের মতো ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।

এই আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ গোতিয়ে ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার উল্লেখ করে লিখেছেন যে শেষোক্ত কবির কবিতায় যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে ফরাসী কবির সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা তা অনেক বিস্তৃত।[২৮]

লোকেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের উপাদান' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের জবাব লেখেন। তাঁর মতে—

> তুমি বলবে যে, জীবনের মূলতত্ত্ব শেকসপিয়রের নাটকে পাওয়া যায়। আমি বলি যে, সমস্ত ভালো নাটকেই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় ; কেননা, যেখানে মানুষ আঁকা হয়েছে সেখানে মানুষের জীবনের মূলতত্ত্ব খানিকটা থাকবেই—তা নইলে মানুষকে ভাল রকমে আঁকা হল না। কিন্তু লেখকের জীবনের মূলতত্ত্ব কি তাতে থাকবেই থাকবে, কিম্বা না থাকলে সেটা সাহিত্য হবে না ?
>
> সাহিত্যে মানুষকে মানুষ চেনায় বটে, কিন্তু তার কারণ, মানুষ মানুষের কাছে চিরকাল প্রিয় সামগ্রী, সেই জন্যই মানুষ সাহিত্যের প্রধান বিষয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যেকালে আমাদের আর্টিস্টিক সুখ দেওয়া, তখন হাতের কাছে এমন একটা সুবিধার বিষয় পেয়ে ছাড়তে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক, পরস্পরের আসঙ্গ প্রয়াসী, এই জন্য মানুষের মনের মতো এমন চিত্তরঞ্জক প্রসঙ্গ আর নেই। সাহিত্য আমাদের মনোহরণের উদ্দেশে এই রকম চিত্তরঞ্জক বিষয় বেছে নেয়—কিন্তু ওগুলো তার অবলম্বন মাত্র, এ তার উদ্দেশ্য নয়।[২৯]

গোতিয়ে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিরোধিতা লোকেন্দ্রনাথ ঠিক করেন নি তবে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁকেই একটু ঠুকে দিয়েছেন—

> কিন্তু তোমার মতে যদি গোটিয়ে তার নিজের মূলতত্ত্ব তার রচনায় প্রকাশ করে থাকে তাহলে তার লেখাকে কেন সাহিত্যে স্থান দেবে না ? নিজের নিজত্ব প্রকাশ করা নিয়েই যদি কথা হয় তা হলে ত গোটিয়েকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।[৩০]

প্রবন্ধটির শেষ অংশে তিনি লেখেন—

> আসল আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে সাহিত্যের কার্য এবং অন্য সমস্ত আর্টের কার্য একই—কেবল উপাদানের প্রভেদ। অনেক সময় লেখকের নিজত্ব প্রকাশ সাহিত্যের একটা বিশেষ উপাদান মাত্র। লেখকের নিজত্বকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্যাগ করে আর কোন উপযোগী বিষয়কে অবলম্বন করলেও সাহিত্য সাহিত্যই থাকে।…

এমন বিষয় অবলম্বন করা চাই এবং সে বিষয়টিকে এমন ভাবে দাঁড় করানো চাই, যাতে আমাদের আর্টিস্টিক আনন্দ দিতে পারে। মনুষ্যের বিস্ময় আগ্রহ ভালোবাসা ইত্যাদিকে যদি উপযুক্তরূপে ফলিয়ে তোলা যায় তবে তাতে আমাদের আর্টিস্টিক সুখ হয়। জীবনের মূলতত্ত্ব, নিজের নিজত্ব, নৈতিক সত্য, দার্শনিক সত্য সবই এই আর্টিস্টিক সুখের উপাদান স্বরূপে ব্যবহৃত হতে পারে—কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সুখ। সকল আর্টই আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্রেক করে সুখ দেয়।[৩১]

লোকেন্দ্র অ্যারিস্টটল কথিত সেই 'artistic pleasure' বা আমাদের সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাষায় 'পরম্ সুখম্' জাগানোর কথা বিশেষভাবে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবার লিখলেন 'সাহিত্যের প্রাণ,'[৩২] তাঁর মতে—

বড়ো বড়ো লেখকেরা নিজের উদারতা-অনুসারে সকল জিনিসকে এমন করে প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে, তার কতখানি নিজের, কতখানি বাহিরের, কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সংকীর্ণ কুনো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।…

সেই জন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বার করা দায়;…একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করছে, সেটি হচ্ছে লেখকের মর্মস্থান—অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্‌সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এইজন্যে যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব।

শেক্‌সপীয়রের সেই 'বৃহৎ বিশেষত্ব' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

ফলস্টাফ্ ও ডগ্‌বেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র ও হ্যামলেট পর্যন্ত শেক্‌সপীয়র যে মানবলোক সৃষ্টি করেছেন সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারও অগোচর নেই।…

শেক্‌সপীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই কেবল সুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্‌সপীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন।…

এই সূত্রেই তিনি বলেন গোতিয়ের রচনায় 'জগতের চিরস্থায়ী সত্য' নেই—তার কারণ গোতিয়ের রচনা 'যে সৌন্দর্য' মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বন্ধমূল', 'তর মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন।[৩৩] রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ'কে সাহিত্যের প্রথম-সত্য রূপে স্বীকার করেছেন শেষ-সত্য রূপে করেন নি। তাঁর মতে—

> সাহিত্যের আদিম-সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি প্রকাশিত হবার পর লোকেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের নিত্য-লক্ষণ' নামে রচনাটি লেখেন। তাঁর মতে 'সাহিত্য' কি তা নির্ণয় করতে গেলে কোন গুণগুলি 'নিত্য' এবং কোনগুলি 'ক্ষণিক' তা বেছে নিতে হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত সাহিত্যের মূলতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> তুমি যাকে সাহিত্যের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধতত্ত্ব বলচ সেই গুণটি সব সময়ের সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা এটা দেখলে আমাদের মীমাংসার অনেকটা সাহায্য হতে পারে।
>
> আমি লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন সাহিত্য বিশেষ কিছু জানিনে…কিন্তু আমার মনে হয় এই মূলতত্ত্ব একটি আধুনিক সৃষ্টি। পুরাতন সাহিত্যে ছিল কিনা সন্দেহ, আর যদিও বা থাকে আজকালকার চেয়ে ঢের কম। অবশ্য আমি এমন কথা বলতে চাইনে যে সাহিত্যের খুব আদিম সময়ও এই মূলতত্ত্ব একেবারে ছিল না।

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সমাজ ব্যতীত সাহিত্য সম্ভব নয় এবং যেহেতু সমাজের ভিত্তিই হল নীতি কাজেই নীতির মূল হল অন্তর্ ও বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান। এইদিক থেকে সাহিত্যের মধ্যে মূলতত্ত্বের আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন। তাঁর মতে "চিন্তার অর্থ-ই মনের সহিত অ-মনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা'। কিন্তু 'সাহিত্যের মূলতত্ত্ব' এই সাধারণ মূলতত্ত্ব ছাড়াও 'আর একটা কিছু'। সেজন্য লোকেন্দ্রনাথ একটু বিশদভাবে 'আর একটা কিছু'-র ব্যাখ্যা করেছেন—

> এই জিনিসটা ঠিক কি তা বোঝানো শক্ত কিন্তু আজকালকার প্রধান কবিদের লেখা পড়লে অনেকটা পরিষ্কার হয়। শেলি বল, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থই বল, টেনিসনই বল, এমন কি বায়রণও, এঁরা সকলেই আমি কি এবং এই জগতের মধ্যে আমার স্থান কোথায়, সৌন্দর্য ভালবাসা ইত্যাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি এই ভাবটা নিয়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই ব্যতিব্যস্ত ভাবটাকেই তুমি বোধ হয় মূলতত্ত্ব হিসাবে ধরছ। এ ভাবটা কিন্তু আজকালই দেখা যায়। পুরাকালে সাহিত্য-কারগণ আমাদের চোখের সামনে সুন্দর ছবি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন—তর্জমায় গ্রীক সাহিত্য যতদূর দেখেছি তাদের লেখার সঙ্গে তাদের মূর্তি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রচনার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমার বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ সরলভাবে সৌন্দর্যবিকাশের প্রতিই লক্ষ্য ছিল। আজকাল কিন্তু আমরা কিছু বিশ্লেষণের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

বলাবাহুল্য এ রীতি লোকেন্দ্রের মনঃপূত নয়। 'ব্যতিব্যস্ত ভাব' তার সমর্থন পায় নি, তার আসল কারণ এই 'Romantic Agony' [মারিও প্রাজ] তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করে নি। রোমাণ্টিক-সমালোচনা বলতে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি বোঝানো হয় লোকেন্দ্র সে-পন্থী নন।

তাঁর রচনাটির শেষে তিনি তাই লিখেছেন—

> এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগের দর্পণ। আজকাল আমাদের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করবার একটা চেষ্টা আছে তাই এই যুগের সাহিত্য থেকে ইহাকে সংশয়াপন্ন এবং অন্তর্দর্শনশীল কাল বলে আমরা জানতে পারি এই হিসাবে এক এক যুগের সাহিত্য সেই সেই যুগের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। ...কিন্তু যদিও এই মূলতত্ত্ব প্রকাশ এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী তথাপি তাকে সাহিত্যের স্বরূপগত বলা যেতে পারে না। মনে কর আমি এমন সুনিপুণ জালিয়াৎ যে আমি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে' মহাভারতের সময়ের একটা বিষয় নিয়ে ঠিক মহাভারতের লেখার মতন মহাকাব্য লিখতে পারতুম। তাকে কে না সাহিত্য বলবে? অথচ এর মধ্যে কি মূলতত্ত্ব রইল? আমার নিজের নিজত্ব রইল না—থাকলে সেটা দূষণীয় —আর লেখকের সমসাময়িক মূলতত্ত্ব তাও তাতে নাই যদি কিছু থাকে তবে সেটা প্রাচীন কালের মূলতত্ত্ব।
>
> আমি তোমাকে অনেক রকম উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টায় আছি যে নিজের নিজত্ব কিংবা রচনাকালীন সময়ের বিশেষত্ব প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে স্বরূপগত আবশ্যকীয় নয়।

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইন্দ্রিয়-মন-আত্মার' সমন্বয় সেই নিজের নিজত্ব লোকেন্দ্রনাথ ঠিক গ্রহণ করেন নি—তিনি সমালোচক হিসেবে রোমাণ্টিক পন্থী নন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার ১২৯৯ সালে ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় 'মানব প্রকাশ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন ঐ রচনায় তিনি লোকেন্দ্রের যুক্তির বিরোধিতা করেছেন এবং প্রাচীন কালের মানুষ প্রকৃতিকে ও সংসারকে যে-চোখে দেখত এখনকার কালে যে সে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন 'প্রাচীনকালে সর্বসাধারণের মধ্যে মতের এবং ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য ছিল আর 'এখানকার বিদীর্ণ সমাজ এবং বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের শুভ্র সম্পূর্ণতা প্রকাশ' পায় না। তিনি এই সূত্রে প্রথমে ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজমের মধ্যে পার্থক্যের কথা তুললেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্লাসিসিসম্ এবং রোমান্টিসিসমের মধ্যে সেই জন্য প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে।
ক্লাসিক শুভ্র এবং রোমান্টিক পাঁচরঙা।

প্রাচীন সাহিত্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'বিশ্বাসে'র তখন একাধিপত্য ছিল, 'সন্দেহ' জন্মগ্রহণ করে নি। সূর্য চন্দ্র ঊষার সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। তিনি দ্বিধাহীন ভাবে বলেন তখন মানুষ আপনারই সুখদুঃখে 'সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল'। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'মানুষের এই আত্মসৃজন পদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি'। তবে তিনি স্বীকার করেছেন 'আমার বলা উচিত ছিল লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।' শেষ পর্যন্ত এই চিঠির তর্ক আর চলে নি, লোকেন্দ্র আর এ বিষয়ে লেখেন নি। 'মানব প্রকাশ' রচনাটির শেষে রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রের উদ্দেশে লেখেন—

তুমি শুনচি কলকাতায় আসচ—আমিও সেখানে যাচ্ছি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখ্‌চি।

নিষ্পত্তি হয়েছিল বলে মনে হয় না—কেননা রবীন্দ্রনাথের ও লোকেন্দ্রের দৃষ্টি-ভঙ্গি মূলত পৃথক। তবে এখানে বলা দরকার রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতাকে খাঁটি সাহিত্য-ধর্মে স্থির থাকতে লোকেন্দ্রনাথ সহায়তা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতাটি 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাটি 'সাধনায়' মুদ্রিত হলে লোকেন্দ্রনাথ কবিতাটির অংশবিশেষকে ঐ কবিতাটির মূল ভাবধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সাধনায়' কবিতাটির যে-পাঠ প্রকাশিত হয়েছিল 'তাতে কেরানি জীবনের বাস্তবতার ধুলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম'।

যে অংশগুলি বর্জিত হয়েছিল তার কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হল—

১. ক্ষুদ্র আমি
কর্মচারী, বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী
কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে
মোর দুঃখ নাহি মানে ; রাজপথে যবে
রথে চড়ি ছুটে চলে সৌভাগ্য গরবে
অজস্র উড়ায়ে ধূলি, মোর গৃহ কভু
চিনিতে না পারে।…

২. বড়ো পেয়েছিনু ব্যথা
আজি, বড়ো বেজেছিল অপমান, যবে
অপোগণ্ড সাহেব শাবক রূঢ় রবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিল লাঞ্ছনা ! হায় এ কী প্রহসন
এ সংসার !

৩. আধুনিক রাজধানী,
আমি তার আধুনিক ছেলে, ঘরে আনি
চাকুরির কড়ি, ফিরে আসি দিন শেষে
কর্ম হতে ; জন্মিয়াছি যে কালে যে দেশে
না হেরি মাহাত্ম্য কিছু, কোনো কীর্তি নাই,...

লোকেন্দ্রনাথ এই অংশগুলি বর্জনের উপদেশ দিয়ে উপকার করেছিলেন। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটিতে প্রেমের রোমাণ্টিক ভাবাদর্শ রূপ নিয়েছে। প্রত্যহের ধূলিরক্ষ সামান্য পদাতিকের জীবন প্রেমের স্পর্শে সকল তুচ্ছতা ও মালিন্য, গ্লানি ও অসম্মান থেকে মুক্ত হয়ে সম্রাটের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সামান্য গৃহকোণ কোন মায়ামন্ত্রবলে প্রেমের চিরন্তন অমরাবতীতে পরিণত হয় এবং প্রেমিক উপলব্ধি করেন—

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,...

এই উচ্চকোটির রোমান্টিক প্রেম-কল্পনার মধ্যে প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটি বা actuality আনায় কবিতাটির মূলধর্ম বিপন্ন হয়েছিল,সংস্কৃত আলংকারিকের ভাষায় রসের 'ঔচিত্য-ভঙ্গ' দোষ ঘটেছিল। লোকেন্দ্রনাথ কবিতাটিকে আক্রমণ করে কবিতাটিকেই রক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'অস্পষ্টতা'র যে অভিযোগ তুলেছিলেন লোকেন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেন। গয়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দ্বিজেন্দ্র-লোকেন্দ্র তর্ক চলত বলে জানা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতার বিরুদ্ধে 'অস্পষ্টতা'র অভিযোগ আনতেন "পালিত সাহেব সেই সব কবিতাই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।"[৩৫]

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৯০ সালের অগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করেন। বিলেতে থাকাকালীন 'বিদায়' কবিতাটি লেখেন। ফিরবার পথে লোহিত সমুদ্রে 'সন্ধ্যা' 'শেষ উপহার' 'মৌনভাষা' ও 'আমার সুখ' কবিতা চতুষ্টয় রচনা করেন। 'শেষ উপহার' কবিতাটি লোকেন্দ্রনাথের রচিত একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ বলে জানা যায় কিন্তু মূল কবিতাটি পাওয়া যায় না। কবিতাটি মিলযুক্ত ষোলমাত্রা মিশ্রকলামাত্রিক ছন্দে রচিত। এ গড়নের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ কম কবিতা লিখেছেন—

আমি রাত্রি তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জাগিয়া চাহিয়াছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল, ফুরালো আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।···

শুধু ছন্দ বৈচিত্র্যে নয়, ভাব-সম্পদেও কবিতাটি ধনী।

লোকেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। দুটি কবিতার অনুবাদ আমরা পেয়েছি—সে দুটি হল 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' কাব্যের 'তারকার আত্মহত্যা' ও 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা'।[৩৬] লোকেন্দ্রনাথের রচিত 'বীণা' নামের বহুস্তবকখচিত একটি মৌলিক বাংলা কবিতা ১২৯৯ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রেভাঃ লালবেহারী দে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষীরা সকলেই একমত। লোকেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর 'শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধে—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মতে 'জ্ঞান সঞ্চয়' ও 'মনোবৃত্তি চর্চা' শিক্ষার এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রচলিত পদ্ধতি দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্যটি সম্পাদিত হয় তিনি তার বিচার করেছেন—[৩৭]

> ইংরাজী স্কুলে ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংরাজীভাষা ও সংস্কৃতভাষা এই কয়টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে অতি অল্প পরিমাণে বাঙ্গলা পড়ান হয়, এত অল্প যে, সে নামমাত্র।···ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিলে জ্ঞানলাভও হয় বটে এবং মনের উৎকর্ষসাধনও হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়গুলি সত্যসত্যই শিখান দরকার।···কিন্তু এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার কি প্রণালী অবলম্বিত হয়? না, যে ভাষা নিতান্ত বিজাতীয়, যে ভাষায় বিন্দু-বিসর্গমাত্র দখল নাই, সেই ভাষায় সেই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়।···এ অবস্থায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি ইংরাজী ভাষায় পাঠ করিলে যে ভাবগুলি শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট ও ঝাপসা মনে হয়।···বেচারারা করিবে কি? মুখস্থ করা ভিন্ন কি অন্য পন্থা আছে?

মুখস্থ প্রথার কুফল ও এন্ট্রান্স ক্লাসে পাঠন-প্রথার সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন—

> ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা করা। তাহা হইলে মুখস্থ করিবার প্রয়োজন থাকে না, আর বিষয়গুলি যথার্থ শিক্ষা দিবার দিকে মনোযোগ দিতে পারা যায়।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন—

> ইংরাজেরা যে মধ্যে মধ্যে এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে 'অর্ধশিক্ষিত' বলিয়া উপেক্ষা করে, কথাটা আমাদের গায়ে লাগিতে পারে বটে, কিন্তু নিতান্ত যে অমূলক তা' নয়। ইংলণ্ডে স্কুলেও যেটুকু শিক্ষা হয় সেটুকু সত্য সত্যই শিক্ষা হয়, আমাদের দেশে শিক্ষা যতটুকু হয়, পণ্ডশ্রম শতগুণ বেশী হয়।

স্কুল শিক্ষাক্রমে ইংরেজি ভাষা ও বাংলা ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর মত—

> থার্ড ক্লাস পর্যন্ত সমস্ত বিষয় বাঙ্গলায় শিক্ষা দিয়া তৎপরে যদি দুই বৎসর ইংরাজীটা খালি ভাষাস্বরূপে শিখান হয়, তা হলে আমার বিশ্বাস যে, এখন এনট্রান্স ক্লাসে যতটা ইংরাজী শিক্ষা হয় তদপেক্ষা বেশী হইবারই সম্ভাবনা। যদি নিতান্ত মনে হয় যে দুই বৎসরে অতটা ইংরাজী শিখান দুষ্কর তাহা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজীটা খালি ভাষা-স্বরূপে পড়ান যাইতে পারে।...আর যদি বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয় তবে, অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাঙ্গলায় শিক্ষা পুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তাহা নয়। বরং এক আশ্চর্য দেখা যায় যে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে-ছেন— কিন্তু ইংরাজী ভাষায়!

তিনি আরও প্রস্তাব করেন—

> আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী প্রচলিত করেন, আর সেই সঙ্গে যদি টেক্সটবুক পরীক্ষা করিবার প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর দুইটি প্রধান দোষ দূর করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসুর মধ্যে হিন্দুর সামাজিক আদর্শ, বিবাহ, আহার প্রভৃতি নিয়ে বিতর্কের কথা সর্বজনবিদিত। তৎকালীন বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসু কালক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির অনুগামী ও হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নেতা হয়েছিলেন। তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার ১২৯৮ সালে মাঘ সংখ্যায় হিন্দুর 'লয়তত্ত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় 'চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর লেখেন 'সাহিত্যে নব্য লয়তত্ত্ব'। এই সূত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিত কর্তৃক চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব'-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা দরকার। তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'প্রসঙ্গকথা' পর্যায়ে 'ভেলিক' নামে চন্দ্রনাথ বসুর 'বিরাট লয়তত্ত্বের' সমালোচনা করেন।[৩৮]

লোকেন্দ্রনাথের 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' অর্থাৎ 'ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশন'-এর সঙ্গে যোগ ছিল। তাঁর পিতা তারকনাথ পালিত প্রযুক্তি-বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার পক্ষপাতী ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি Society for the Promotion of Technical Education নামক প্রতিষ্ঠান ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে মাসিক দুই হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করতেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় তাঁর ৯২ আপার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে (বর্তমান নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড এবং এখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ) ১৯১০ সালে National Council of Education এবং Society for the Promotion of Technical Education একসূত্রে বন্ধ হয় এবং তারকনাথ পালিত ঘোষণা করেন তিনি এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানকে দশ লক্ষ টাকা দেবেন। কিন্তু মত পার্থক্যের ফলে তারকনাথ উক্ত যৌথ-প্রতিষ্ঠান থেকে সরে আসেন এবং ১৯১২ সালে সাড়ে পনের লক্ষ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। যার ফলে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। লোকেন্দ্রনাথ কিন্তু 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'কে দশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন।[৩৯]

এই হলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত। ১৮৭৯ থেকে ১৯১৩—দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর যিনি যথার্থ বন্ধুরূপে বিপদে-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি যেন উপন্যাসের এক অসম্পূর্ণ নায়ক—কী জীবনে কী সাহিত্যে।

স ং যো জ ন

প্রিয়নাথ সেন 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩০৭ সালে পৌষ সংখ্যায় 'ওমর খায়্যামের রুবাই' নামে ত্রিশটি রুবাই-এর পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে সরলা দেবীর 'রুবায়াৎ' নামক গদ্যানুবাদ ও লোকেন পালিতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। সরলা দেবী যে পঁচিশটি রুবাইয়ের গদ্যানুবাদ করেন লোকেনের পদ্যানুবাদ তারই অনুসরণ নয়। সরলা দেবীর রচনাটির প্রকৃত রচনাকাল ফাল্গুন ১৩০৫। ১৩০৭ সালের মাঘ মাসে সরলা দেবীর 'ওমর খৈয়াম' নামে একটি রচনাও প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'পান্থ—ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ' উল্লেখ করা উচিত (সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রু বা য়া ৎ

১· মোরা শুধু হেথা আছি দুদিনের তরে !
কোথা যাবে হাসি অশ্রু সে দুদিন পরে ?
প্রেম আর সুরা পানে হও মাতোয়ারা—
তার পর সব ভুলে চলে যাও সরে ।

২· মোদের দিনের সংখ্যা শুধু গুটি তিন,
বহে যায় স্রোতবৎ বিরাম-বিহীন,
তন্মধ্যে দুদিন তার চিন্তা নাহি জানি
—যেদিন গিয়াছে আর আসেনি যেদিন ।

৩. কাল যে কি হবে তাহা জানে না ত কেহ,
আজ অট্টালিকা, কাল চিতা মোর গেহ
সুরাপাত্র পূর্ণ করে আন তবে সাকী
সুখে থাকি যত দিন আছে এই দেহ ।

৪· নিশ্চিত নহেগো কভু ভবিষ্যৎ যবে
বিমর্ষ হৃদয় আজ খুসী কর তবে ।
চন্দ্রালোকে পিও সুরা । কতবার প্রিয়ে
চন্দ্র ফিরে এসে তোরে পাবে না এ ভবে ।

৫. মাতাল মাতাল তুই কহে মোরে সবে
অনাচারী পাপী তোর ত্রাণ নাহি ভবে ।
মত্ততার সুখে ভোর হয়ে আছি সদা
নাহি শুনি কি কহিছ মহা কলরবে ।

৬. দুঃখের সাগর মথি' যদি পাওয়া যায়
একটুকু সুখসুধা ছাড়িব কি তায় ?
ত্যজিব বরং স্বর্গ, মুহূর্তের তরে
বন্ধ হয় হেথাকার যদি হায় হায় ।

৭. মূঢ় তোরা ত্যজি সুখ স্বর্গসুখ আশে
থাকিস্ মুক্তির তরে বদ্ধ কারাবাসে ।
সুদ পাবি বলে ফেলে রাখিস পাওনা,
ছাড়িনা নগদ আমি যাহা হাতে আসে ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৮. নদীর শ্যামল কূল, সুরা, আর গান,
প্রিয়ার সুমিষ্ট মুখ, সুখভরা প্রাণ
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্বর্গ মিছে খুঁজে মর,
স্বর্গ বলি থাকে যদি অন্য কোনও স্থান।

৯. মোর লক্ষ্য নহে যবে সুরা করি পান
লঙ্ঘিতে বিদ্রোহী চিতে বিধির-বিধান।
পাপ পুণ্য নাহি জানি—আমি চাই শুধু
করিবারে আত্মহারা এ পোড়া পরাণ।

১০. ওমর পাপের তরে কেন অশ্রুজল ?
ব্যথা বুকে পুষে তোর কিবা লাভ বল ?
ক্ষমা ত পাপেরই তরে ; পাপ যে না করে
ঈশ্বরের ক্ষমাগুণ করে সে নিষ্ফল।

১১. মদ খায় যারা তার মর্ম বোঝে যথা।
ঈশ্বরের কাছে ইহা অতি তুচ্ছ কথা।
মদ খাব জেনেই ত গড়েছেন মোরে
—না খেলে প্রমাণ শুধু তাঁহার অজ্ঞতা।

১২. পাপে মগ্ন থাকি যদি দয়া কর তবু,
আত্মা যদি অন্ধকার দীপ জ্বাল প্রভু
কিন্তু যদি স্বর্গ লভি সুকৃতির বলে
মূল্য দিয়ে কিনি তাহা—দান নহে কভু।

১৩. আমার স্বভাব আমি না পারি লঙ্ঘিতে
কর্মফল ভোগ করি ;—কি পারি করিতে ?
কিন্তু দয়া পাব জানি—যে হেতু দেখেছ
লজ্জা ও সরম কত জাগে মোর চিতে।

১৪. তুমিই ত গড়িয়াছ মহা কারিগর
শ্রেষ্ঠ ধাতু সাথে কত মিলায়ে ইতর
যে ছাঁচে ঢেলেছ মোরে হয়েছি তেমনি
ভালো মন্দ তরে দায়ী তুমি গো ঈশ্বর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৫. কে তুমি উপরে বসি কি করিছ খেলা
নিষ্ঠুর কৌতুকে তুমি কাটাতেছ বেলা।
তার পরে দিন শেষে ক্রীড়া সাঙ্গ করি
অন্ধকারে ফেলি দিবে করি অবহেলা।

১৬. যতনে গড়েছে যাহা শিল্পী, ভালবেসে,
নির্মম ক্রীড়ায় কি গো ভাঙ্গে অবশেষে?
এত যে নাজুক* মুখ চারু হস্ত পদ
কি প্রেমে গড়েছ দেব, ভাঙ্গ বা কি দ্বেষে!

১৭. যদিও পূজার মালা গাঁথি নাই প্রভু
পাপের কলঙ্ক আমি মুছি নাই কভু—
একেরে যে কালে কিন্তু এক মাত্র মানি
কিঞ্চিৎ দয়ার আশা মনে রাখি তবু।

১৮ কি রেখেছ মোর তরে—সুধা বা গরল
নাহি জানি; কিন্তু জানি এ সত্য সরল
মদ্যশালা সেও ভাল যদি থাক হৃদে;
—তোমা বিনা পূজার্চনা একান্ত নিষ্ফল।

১৯. মাতোয়ারা আমা কাছে কে আনিল তোরে?
পরদা-আড়াল হতে কে আনিল তোরে?
তোমা বিনা যে হৃদয় অগ্নিশিখা সম—
চকিতে তাহার কাছে কে আনিল তোরে?

২০. মদ্যশালা হতে ডাক এল অতি ভোরে
"পাগল মাতাল ঘোর লক্ষ্মীছাড়া ওরে
ওঠ, পাত্র পূর্ণ কর্—যত দিন ভাগ্য
জীবন পেয়ালা তোর নাহি দেয় ভ'রে।

২১. মোরা আছি আর আছে মদের দোকান
আর মাতাল শরীর বিনা ধর্ম জ্ঞান।
বিকায়েছি সুরা তরে আত্মা প্রাণ দেহ;
পঞ্চভূতাদির মোরা রাখিনা সন্ধান।

* সুকুমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২২. ঠিক জেনো আত্মা সাথে হইবে বিচ্ছেদ
সমস্ত রহস্য যত হবে তার ভেদ।
কোথা হতে আসিয়াছ, কোথা যাবে চলে !
সুখে থাক ; পিও সুরা, করিও না খেদ।

২৩. যবনিকা অন্তরালে রহস্যপ্রদেশ
সেথায় না পারে কেহ করিতে প্রবেশ।
সুরা পিও, পৃথিবীই আমাদের স্থান।
রেখে দাও বৃথা তর্ক…নাহি তার শেষ।

২৪. যতই পড়না শাস্ত্র যত লও নস্য
করিতে পারনা ভেদ জীবনরহস্য,
তবে কেন মনে কর মৃত্যু পরে তুমি
পরকাল সমস্যার পাবে সব ভাষ্য ?

২৫. জীবনের প্রতিদিন কত শত শঙ্কা
তার কাছে কোথা লাগে মরণের ডঙ্কা।
ঈশ্বর যে কটি দিন দিয়েছেন কর্জ
সহাস্যে শুধিব যবে পূর্ণ হবে সংখ্যা ॥

ভাদ্র, ১৩০৭*

* এটি রচনাকালের তারিখ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

THE DEATH OF A STAR

From the depth of Heaven above,
Into the dark ocean below,
Plunged a star ;
While afar,
The countless stars, speechless gazed,
Amazed.—
This speck of light, but now among them,
Is in one single little moment gone,
To where on the floor of the deep,
There sleep
A thousand stars, who sorrow-urged,
Troubles' end in self-destruction sought ;
And bought
Rest—with glory for e'er extinct.

The pain of laughter made him sore,
Nothing more.
With heavy heart, in that land of mirth,
Smiling, he wandered from eve to dawn,
—Alone.
Thus laughter's flame with burning might
Fiercely bright
Consumed the star in a blaze of light.
Compelled to sing a song,
Not his own ;
Forced to speak in a tongue
To him unknown ;
With an aching pain and void at heart
He leaves the glittering shore, and braves
The dark solitude beneath the waves.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

And you other stars, all the while,
Why ask you with your mocking smile,
'What is it to us ? will his loss
Make our lustre less bright than it was ?'
Not gaily to shine did he yearn ;
But himself in silence obscure
To immure.
He was in that starry poem
But a letter ;—by self effaced
Erased ;
Behind him he has left no trace,
No sign to mark the vacant place,
Mock not—but give him mercy's grace,

It sinks ! It sinks ! There sinks a star !
In the dark sea !
In the deep night !
In endless space !
Oh heart mine ! Dost thou also long
By that dead star to sleep in peace ?
In the dark sea !
In the deep night !
In endless space !

L. Palit.

Modern Review. August, 1911

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

FRUITLESS CRY

Fruitless our cry
Fruitless the rebel longing of our souls!

The day is dying !
Darkness holds th'earth and light the sky,

While noiseless creeps behind
With downcast eyes
Weary eve with her mourning sigh.

I hold thy hands in mine
My hungry eyes
Look deep into thine
And seek for thee !
Thee ! The real thee !
Thy self ! Thy essence ! The sweetness veiled

Behind that mortal frame !
In the dark depth of the eyes,
Quiver the soul's mysterious beams,
As th'infinite mystery of heavenly light
Through star-set darkness tremulous gleams.

Thus, ever I gaze.
A quenchless thirst, like the sandy flood
Of fierce simoon,
Drowns my soul and being,
In the eyes.

Behind thy smile,
In thy melodious speech,
Or in the calm peace that radiates from thee,
Where shall I find the true, th'immortal thee !'
I seek and weep.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

In vain ! In vain !
In vain the cry,
The mad presumptuous hope !
Not for thee this fullest rapture,
Holy and hidden.

Be thine the spoken word,
The fleeting smile,
And love shadowed in a passing glance ;
Let this suffice.

What hast thou ?
Hast infinite Love ?
Canst meet Life's infinite want ?
That seekest the whole human being
In perfect completion !
Alone and helpless thou !
Canst thread thy path—

Amid the throng of worlds,
Through ignorance and error,
The chequered maze of light and shade
Or the labyrinth of daily change ?
And lead thy chosen partner,
Thy eternal companion,
Thro' all eternity ?
Thou fearful, tired, and weak,
Bent with the weight of thy own soul,
Darest thou seek
The burden of another charge ?

Not food for thy hunger
Is the human soul ;
Nor aught that with greedy clutch
Thou may'st grasp and hold !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Wouldst thou with keen desire
Pluck the Lily in its bloom,
That with tender care
From the subtlest essence
Of Beauty, Time, and Space
God fashioned for his own shrine,
And universal joy.
Be thou content,
That for thee
Is its sweetest perfume ;
That thou may'st love,
And thy soul bathe itself pure
In that loveliness sublime ;
Nor stretch thy impious covetous hand.
The breath of calm and gentle peace
Hath stilled all sound in th' evening air.
Cool with tears thy hot desire.
Away ! This cry of hunger cease.

L. Palit
Modern Review. May, 1911

এই দুটি অনূদিত কবিতা সম্পর্কে 'Golden Book of Tagore' গ্রন্থের Foreword-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন—

> Sometime in 1911 I suggested that his Bengali poems should appear in English garb. So he gave me translations of two of his poems by the late Lokendranath Palit……

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২। প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬)

প্রিয়নাথ সেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বান্ধব ছিলেন বললেই ঠিক হয়—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সকলের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি। সুবর্ণবণিক সমাজভুক্ত এই আইনজীবী ছিলেন জাত-সাহিত্যরসিক যাঁকে বলা উচিত a class by himself. তিনি ধর্মান্দোলন নিয়ে মাথা ঘামান নি, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ থেকে দূরে ছিলেন। কোনোরকম রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি নিজেকে জড়িত করেন নি। সমাজ-সংস্কারের হিতব্রতেও তিনি সমর্পিতপ্রাণ হন নি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের বিশেষত ফরাসি সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক ও সাহিত্যের রস-সন্ধানী সমালোচক। তিনি কলাকৈবল্যবাদের সমর্থক, গোতিয়ে-র অনুগামী এবং রাস্কিনেরও। বাংলা সাহিত্যে বোদল্যেরকে (১৮২১-৬৭) প্রথম পরিচিত তিনি করান বলে মনে হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে ধরেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের সমালোচনা লেখার জন্য।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেও প্রিয়নাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সেজন্য প্রিয়নাথ সেনকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি উদ্ধৃত হল—

১১ আগষ্ট

প্রিয়বাবু

সঙ্গীতসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার form একখণ্ড পাঠাইতেছি—অনুগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্বাক্ষর করাইয়া পাঠাইবেন। আপনি সভ্যশ্রেণীভুক্ত না হইলেও মধ্যে মধ্যে আপনার নামে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইব। কোন কিছু ভাল অভিনয় হইলে আপনাকে না দেখাইতে পারিলে তৃপ্তিবোধ হয় না। নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলে অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন। 'পুনর্বসন্ত'[২] আপনার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুসি হইলাম।

ভবদীয়

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Jorasanko, Tuesday

My dear Preo Baboo

I shall be delighted to invite you if there be any performance of 'অশ্রুমতী'[৩] on the stage of the Sangit Samaj in future.

Malatimadhab[8] is not yet out—I am now going through the proof-sheets of the last act.

Yours Sincerely
Jyotirindranath Tagore

৯ চৈত্র

প্রিয়বাবু

সুরেনের সেই বাড়িটা খোন্দেরদের দেখবার অনুমতিপত্র মেজদাদার কাছ থেকে লিখিয়ে অত্র সহ পাঠাচ্ছি। 'মুদ্রারাক্ষস'[৫] আপনার অবসরমত পড়া হলে কিরূপ লাগ্‌লে লিখ্‌বেন। আপনাদের পাড়ায় প্লেগ নাই তো ?

আ—
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

My dear Preo Babu—

I couldn't go to the Sangit Samaj last Saturday to see the performance of 'Julius Ceaser'[৬] as I was laid up with fever. From what I hear from people, I believe the Principal actors acquitted themselves tolerably well. Of course there are deficiencies which I hope will disappear at the next performance. I didnot take any part in this……I shall be delighted to send you card at the next performance.

I shall send your 'Shakespeare' tomorrow. It is here. Though I am now free from fever I am still very weak. I must give myself perfect rest for a few days. 'Malati-madhab' will be out by next week.

Yours Sincerely
Jyotirindranath Tagore

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই সব চিঠির কি জবাব প্রিয়নাথ দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু'[৭] রচিত ও প্রথম অভিনীত হবার অনেকদিন পরে প্রিয়নাথ সেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরোধে 'অলীকবাবু' সমালোচনাটি লেখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য কোনো গ্রন্থের সমালোচনা সম্ভবত তিনি লেখেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রিয়নাথের পরিচয় ঠিক কবে থেকে বলা কঠিন। প্রথমবার বিলেত থেকে ফেরার পর ১৮৮১ সালে তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয়। বিলেতে থাকতে ভগ্নহৃদয় লেখা শুরু করেন, ফেরার পথে জাহাজে প্রথম অংশের অনেকটাই লিখে ফেলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম ছয়টি সর্গ বার হয়।[৮] রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) ও 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) প্রিয়নাথ সেনের কাছে একসঙ্গে পাঠানো হয়। প্রাসঙ্গিক চিঠিখানি উদ্ধৃত করি—

ওঁ

মঙ্গলবার

প্রিয়বাবু,

কাল সন্ধ্যার সময় রবিমামা আপনাকে 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' ও 'কবিকাহিনী' পাঠাতে বলে গিয়েছেন। সেগুলি পাঠালুম। আপনার সঙ্গে বহুকাল দেখা হয়নি। আপনি কেমন আছেন ? ইতি।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কিন্তু 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে প্রিয়নাথ সেন খুসি হন নি, কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও উজ্জ্বল আশা প্রকাশ করেন নি। তিনি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২) কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রিয়নাথ সেনের এই সমর্থন রবীন্দ্রনাথের মনে নতুন বল ও আনন্দের সঞ্চার করেছিল।[৯] সে সময়ে বিহারীলালের কবিতার সমাদর হয় নি, তখন বাংলাকাব্যে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের যুগ। কিন্তু প্রিয়নাথ সেন বিহারীলালের কবিতার গুণগ্রাহী ছিলেন।

তিনি আমেরিকান সাহিত্যে, কাব্যে 'পো' ওগদ্যে 'হথর্ণ'—এই দুজনের রচনাকে 'মৌলিক গৌরবে গৌরবান্বিত' বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ইংরেজি সাহিত্যে এঁদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর অনেক লেখক থাকলেও উক্ত দুই লেখকের কবিতায় ও গদ্য রচনায় যে বিশেষত্ব আছে অপর লেখকদের রচনায় তা নেই। তিনি লিখেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> কারণ যে কবিরই এই বিশেষত্ব আছে, তাঁহারই তজ্জনিত একটি চিরন্তন এবং অমোঘ আকর্ষণ আছে। তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টি উন্নত আয়ত না হইলেও, অন্যত্র অপ্রাপ্য।...এই বিশেষত্ব বলেই—এই নিজস্ব গৌরবে—মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের অনুকরণ-প্লাবিত বঙ্গদেশে 'বঙ্গসুন্দরী'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী রসগ্রাহী উপযুক্ত পাঠক মাত্রেরই নিকট বিশেষ আদর ও পূজা পাইয়াছেন—[১০]

তখনকার কালে পো ও হথর্ণ, বোদল্যের, হুগো, গোতিয়ের গুণগ্রাহী হওয়া সহজ ছিল না, প্রিয়নাথ যে হতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর ফরাসি সাহিত্য-অধ্যয়ন ও তার দ্বারা তাঁর মনের গড়নের নতুনত্ব। আশুতোষ চৌধুরীর মধ্যে যে রসিক সমালোচক সত্তা দেখি তারও পিছনে ফরাসি কাব্য-কবিতার প্রভাব। প্রিয়নাথ সেন তৎকালীন বাংলাদেশে অনন্যসুলভ রসদৃষ্টি লাভ করেছিলেন বলেই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যের সমাদর করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারপর থেকে প্রিয়নাথ সেনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুজনের পরস্পরের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল। প্রিয়নাথ এই ঘনিষ্ঠতায় কতদূর উপকৃত হয়েছিলেন জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৯৪ সালে ২ অগস্ট তারিখে ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে পাই—

> প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত আছি—সুখে আছি।...

যখন সমালোচকের নিন্দাশরে রবীন্দ্রনাথ জর্জরিত তখন প্রিয়নাথ অনুকূল সমালোচনা লিখে প্রতিকূল সমালোচনা খণ্ডন করেন। শিলাইদহ পতিসরে ব্যাবসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ঋণগ্রস্ত, পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত তখন প্রিয়নাথ তাঁকে সে বিপদ থেকে মুক্ত করেন। কিম্বা মাধুরীলতা অর্থাৎ বেলার বিবাহ-ব্যাপারে তাঁরই মধ্যস্থতার ফলে কবি বিহারীলালের পুত্র শরৎকুমারের সঙ্গে বেলার বিবাহ ঘটে। কাজেই দেখা যায় সাহিত্যগত, ব্যাবসাগত, ও পরিবারগত রবীন্দ্রনাথের সব সমস্যাই প্রিয়নাথের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমাধান লাভ করে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯১৬) প্রিয়নাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব বজায় ছিল. ১৯১৫ সালে ৩রা জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি তার প্রমাণ।[১১]

প্রিয়নাথ যেমন জাত-রসিক তেমনি জাত-পাঠক। পড়ায় তাঁর যত আনন্দ লেখায় ততো নয়। এই পড়ার নেশার জন্যই তিনিই পাকাপাকি এটর্নী হতে পারলেন না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন—

> He should have become a solicitor, but he was so deeply absorbed in literature that he never passed the examination necessary to qualify him for that profession. [১২]

কিন্তু এটর্নীশিপ পরীক্ষায় পাশ না করার জন্য প্রিয়নাথ কোনো দুঃখবোধ করেন নি। তিনি বই নিয়েই থাকতেন, চোখের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকায় চোখের খুব কাছে বই নিয়ে পড়তেন। তাঁর বেশভূষায় মনোযোগ ছিল না, কিন্তু নিউম্যান ও থ্যাকার স্পিংকের বইয়ের দোকানে তাঁর বিল উঠত উঁচু মাত্রায়। তিনি অনেকগুলি বিদেশি ভাষা যথার্থ ভাবে জানতেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে—

> As a linguist, I have not met his equal, not because of the number of languages he knew, but the ease with which he acquired a new language.[১৩]

এই প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' (১৯১১) গ্রন্থে 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল সাহিত্যের বড়রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর-দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল।...একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত।[১৪]

বিপক্ষের রূঢ় আঘাতের প্রতিবাদে প্রত্যাঘাত করে প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করেছেন বলা চলে। কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) রবীন্দ্র-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নাথের 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) কাব্যনাট্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। তিনি 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে লেখেন—

> …রবীন্দ্রবাবুর গ্রহউপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর রবিবাবুকে chaste কবি বলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent কিন্তু immoral নয়। রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোনও সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।
>
> 'অশ্লীলতা' ঘৃণার্হ বটে। কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে 'বিদ্যা' হইলে সংসার আস্তাকুঁড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোন কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।…মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।…[১৫]

এই সমালোচনা পড়ে মনে করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তার জবাব কে লিখবেন? তিনি নিশ্চয়ই প্রিয়নাথ সেনকে এবিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করে তাঁরই দ্বারা প্রতিবাদী সমালোচনা লিখিয়েছিলেন। প্রিয়নাথ এই উপলক্ষে লেখেন—"চিত্রাঙ্গদা'। তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'র পর্যালোচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিটি মন্তব্য খন্ডন করেন। তিনি দেখিয়ে দেন 'চিত্রাঙ্গদা'য় সৌন্দর্য প্রকাশ কখনও রুচিভ্রষ্ট হয় নি বরঞ্চ 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্র মহাভারতীয় কাহিনী-বর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত।[১৬] এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটি[১৭] স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন অংশত এডওয়ার্ড টমসনের 'Rabindranath Tagore' (1926) গ্রন্থে প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনার বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্য (১৮৯০) প্রকাশিত হলে প্রিয়নাথ সেন ঐ কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন।[১৮] ঐ সমালোচনায় যে মান (standard) লক্ষ করি সেকালে তার সদৃশ রূপ বেশি মেলে না।

প্রিয়নাথ 'মানসী' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> সমস্ত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা এই যে, সমালোচ্য বিষয়টি সৌন্দর্যব্যঞ্জক কিনা? যদি তাহাতে সৌন্দর্যের পূর্ণবিকাশ থাকে, তবে অপর হাজার কেন অভাব তাহার থাকুক না, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।…আমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যতটুকু রসাস্বাদন শক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নির্দেশ করিতে পারি যে, 'মানসী'তে সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হইয়াছে।...ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য।

পূর্বে বলা হয়েছে প্রিয়নাথ থিওফিল গোতিয়ে-র art for art's sake দৃষ্টিভঙ্গির অনুরাগী ছিলেন। সেজন্য তিনি শিল্প ও সাহিত্যে সমাজ-কল্যাণ-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-সন্ধানী ও সৌন্দর্যরসিক দৃষ্টির সমর্থন করেন; রবীন্দ্রনাথ গোতিয়ের উপন্যাসটি (Mademoiselle de Maupin) মূল ফরাসিতে পড়েন নি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছিলেন। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রিয়নাথ সেন গোতিয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাধন করান। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গোতিয়ের প্রভাব বিশেষত 'কড়ি ও কোমল' 'চিত্রা' যুগে লক্ষণীয়। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে 'বিবসনা' নামে একটি কবিতা আছে—সেই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন রচিত 'বিবসনা' নামক চতুর্দশপদীটি উদ্ধৃত করি—

বিবসনা

কিসের পূর্ণিমা আজ! কোথাকার জ্যোতি
নামিল এ ধরামাঝে—কাহার মহিমা?
মানবী?—না দেখি কোন অমর মূরতি?
অগ্রসর পদ কেন জড়িত-জড়িমা?
আলিঙ্গন-প্রসারিত বাহু কে নিবারে!
কি বিস্ময়ে—মন্ত্রবলে—কাহার মায়ায়
তপ্ত প্রাণ অবরুদ্ধ আঁখির মাঝারে!
কোন মহা জাগরণে দেহ লয় পায়!
এ সুষমা তীর্থ পাশে বিহ্বল জীবন,
হারাইয়া যায় প্রাণ রূপের উচ্ছ্বাসে—
কবি শুধু জাগে হৃদে—নির্বাণ বাসনা।
কি মহান মুহূর্তেরে—জীবনের কোন্
সুতুঙ্গ সোপানে—আজি সাক্ষাৎ প্রকাশে
সৌন্দর্যের দেবমূর্তি—ব্যক্ত—বিবসনা।

প্রিয়নাথ সেন 'রস্কিন' প্রবন্ধে লিখেছেন—

সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে যে পবিত্রতা জড়িত আছে, সৌন্দর্য উপাসক তাহা নগ্ন মূর্তিতেও বেশ দেখিতে পান। তোমার সৌন্দর্য দেখিবার চক্ষু নাই বলিয়াই তুমি তাহাতে সৌন্দর্যও দেখ না এবং তৎসংলগ্ন পবিত্রতাও দেখ না।

প্রিয়নাথ সেন প্রি-র‍্যাফালাইট কবি-শিল্পীদের গুণমুগ্ধ ছিলেন। মরিস, রসেটি, সুইনবর্ণ তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' থেকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই কবিগোষ্ঠীর ও তাঁদের শিল্পচেতনার প্রভাব তাঁর কাব্যে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়ে নারী দেহের অনাবৃত সৌন্দর্য-মূর্তি দেখে স্বর্গের সুষমা ও পবিত্রতা উপলব্ধি করেন। তিনি জানান তাঁর বালিকা-কন্যা বেলা [মাধুরীলতা] পাশে থাকলেও তিনি ঐ চিত্রদর্শনে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করতেন না, কেননা ঐ সৌন্দর্য পবিত্র। প্রিয়নাথ ও রবীন্দ্রনাথ এইক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গির উপাসক। প্রিয়নাথ সেনকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য কাব্য সমালোচনা করাতে চাইবেন, এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা সব চিঠি তো পাওয়া যায় না, তবু দেখি 'ক্ষণিকা' (১৩০৭) কাব্যখানি সমালোচনা করবার জন্য তিনি প্রিয়নাথকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন। তবে প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ লিখে উঠতে পারেন নি। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা পাওয়া যায় মাত্র। 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩০৬ সালে বৈশাখ সংখ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'প্রণয়ের পরিণাম' নামে একটি গল্প লেখেন। গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লেখেন—

> ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে 'সাহিত্যে'র কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।[১৯]

পরে পুনরায় লেখেন—

> তুমি 'সাহিত্য' সম্পাদকের উদ্দেশে যে পত্রখানি রচনা করিয়াছ—আমি তাহার সম্বন্ধে কি আর বলিব।…অবশ্য প্রাইভেট ভাবে সম্পাদকের নিকট গেলে ক্ষতি দেখি না—কিন্তু ইহা লইয়া কাগজ পত্রে বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনায় যে একটি অসম্ভ্রম আছে তাহা সহ্য করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। এ দূর করিয়া ফেলিয়া দাও।[২০]

প্রিয়নাথ সেন শুধু সমালোচক ছিলেন না, নিজে কবিও ছিলেন। তিনি বিহারীলালের অনুরাগী, অক্ষয়কুমার বড়ালের রচনার মতো তাঁর কবিতার বাক্ ও অর্থ। চতুর্দশপদী রচনায় তিনি মধুসূদন তথা পেত্রার্ক-পন্থী। রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতাও কিছু কবিতায় দৃশ্যমান। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রিয়নাথ এডগার অ্যালান পো-র কবিতার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। তাঁর 'To Helen' কবিতাটির (আশুতোষ চৌধুরী যার উচ্চ প্রশংসা করেছেন) অনুবাদ-কল্প রূপ পাই প্রিয়নাথের 'নীহারিকা' কবিতায়—

…সেই আঁধারের কোলে, হৃদয় পড়িল ঢুলে,
রজনীর রাজ্যে আমি করিনু প্রবেশ ;
উদাস অনিল ধীরে কি মন্ত্র বলিল মোরে
জাগিনু গেল না তবু নিদ্রার আবেশ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

*   *

চারি দিকে বৃক্ষ যত   নীরব নিঝুম নত
নাহি কোন সাড়া শব্দ—অনন্ত গোধূলি,
ঈষৎ চঞ্চল জলে   বোঁটা-ভাঙ্গা পদ্ম দোলে
হেরিছে মলিন মুখে মলিন তারকাগুলি।

*   *

সেই সে গোধূলি মাঝে   নদীর বুকের মাঝে
দেখিনু ভাসিছে ধীরে ঘুমন্ত আনন।
করুণা-ছানিত মুখ   দেখিলে চমকে বুক
অধরে ফুরাল হাসি মুদিত নয়ন।...

লোকেন্দ্রনাথের মতো প্রিয়নাথও ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ শুরু করেছিলেন কিন্তু সম্ভবত শেষ করেন নি। তিনি ত্রিশটির অনুবাদ প্রকাশ করেন।[২১]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থাকাকালীন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় নানা ধরনের 'স্বদেশী' ব্যাবসা-বাণিজ্যে হাত দিয়েছিলেন এবং প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। এক ধনীর কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে অপর পাওনাদারের পাওনা মিটিয়ে দিতেন, এইসব ধার-পাওয়া ও ধারশোধের ব্যাপারে মধ্যস্থ ও সহায়ক ছিলেন প্রিয়নাথ সেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বিপদের দিনে প্রিয়নাথ তাঁকে নানাভাবে বিপদমুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিপত্রে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে এইসব প্রয়াস চালাচ্ছেন তার একটি নিদর্শন তুলে দিচ্ছি—নিচের খসড়াটি তিনি প্রিয়নাথ সেনকে পাঠান—

Panchanan Banerji
&
Judah Esq

Dear Sirs,

I hereby authorize you to raise a loan of Rs. 20,000/- on the joint Promissory note of myself and Babu Surendranath Tagore repayable with interest at the rate of 9% per cent per annum by 4 yearly instalments of Rs. 5000/- each and I agree to pay you Rs. 1200/- as brokerage for negotiating the loan, but I shall not

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

pay any other costs save & except the cost of the necessary stamps, nor will you be entitled to get the brokerage of any portion thereof, if on any account after you shall have negotiated the loan, the transaction falls thro.

Yours faithfully

Dec. 30 Rabindranath Tagore
1900

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড়ো মেয়ের বিবাহ ব্যাপারে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যদিও তার বয়স ১৯০১ সালে মাত্র পনের বছর।[২২] প্রিয়নাথ সেনই সম্বন্ধ করেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে। ছেলেটি সুশিক্ষিত ভদ্র ও বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয় (জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি সে কথা জানান) এবং রবীন্দ্রনাথ এই বিবাহে আগ্রহী হন। কিন্তু শরতের ভ্রাতা অবিনাশ চক্রবর্তী 'ব্রাহ্ম'-হওয়া ও বিবাহের যৌতুক বাবদ নগদ দশ হাজার টাকা দাবি করেন। রবীন্দ্রনাথের তখন নিজের আয় বিশেষ কিছু ছিল না, পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তারপর প্রচুর ঋণগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ পাত্রপক্ষের অশোভন ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কেননা, তাঁরা মেয়ে দেখে পছন্দ করে, কথাবার্তা স্থির হয়ে যাবার পর নতুন দাবি তোলেন। রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ দুঃখিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন, প্রিয়নাথকে লেখা চিঠিগুলি থেকে তার পরিচয় মিলবে। একখানি পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্‌ধৃত করি—

> …আর আমি কিছু বলিব না। বিবাহ জ্যৈষ্ঠের শেষেই স্থির কর। দশ হাজারের উপর আরও দুই হাজার চাপাইয়া ব্যাপারটাকে আরো কুৎসিত করা হইয়াছে। পরমাত্মীয়কে প্রসন্নমনে দান করিবার সুখ সে আমার আর রহিল না। আমাকে পাক দিয়া নিঙড়াইয়া লওয়া হইল। শুভ কার্যের নির্মল প্রসন্ন মঙ্গল ভাবকে বিধিমতে নষ্ট করিয়া যে কিরূপ গভীর মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে তাহা তোমাকে বলিতে পারি না। এই বিবাহে আমার এবং বেলার মার উভয়েরই মনের মধ্যে একটি ক্ষতরেখা রহিয়া গেল এমন কি তিনি কন্যার মাতা হইয়াও এ বিবাহে যথেষ্ট উৎসাহী হন নাই। যাহা হউক ভুলিবার চেষ্টা করিব। মঙ্গলকর্ম মঙ্গলের জন্যই হউক।

বেলার বিবাহ হয় ১৩০৮ সালে ১ আষাঢ় তারিখে—বহু গোলমালের পরও এই বিবাহ যে হতে পেরেছিল তার মূলে ছিল প্রিয়নাথ সেনের প্রচেষ্টা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রিয়নাথ সেনের পরলোক গমনের সতের বছর পর তাঁর রচিত গদ্য-প্রবন্ধাদি ও কিছু সংখ্যক পত্রসহ 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। তার 'মুখবন্ধ' লেখেন রবীন্দ্রনাথ—

> বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথরচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র ও নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার. নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্য রসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হতো। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য।[২৩]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওমার খ্যায়ামের রুবাই

১. প্রভাতে উঠিল ধ্বনি মোর সুরা ঘরে—
"মাতাল পাগল মোর, লক্ষ্মীছাড়া ওরে
"পূর্ণ করি সুরাপাত্র—সুরা দিয়ে তায়,
আয়ুপাত্র না পুরিতে অদৃষ্টের করে।"

২. না খাও খেও না মদ—নিন্দ' না মাতালে
কৃপা যদি পাই—আমিও ছাড়িব কালে ;
মদ খাওনাক ব'লে—গর্ব তব ভারি,
শত কার্য কর—মাতালেরা বাবা বলে।

৩. কালিকার নাহি যবে ঠিকানা তোমার
তূর্ণ তবে পূর্ণ কর প্রাণের আবদার,
চাঁদিনীতে চাঁদমুখে সুধা কর পান—
ও চাঁদ হাসিবে নিত্য—তুমি কোথাকার!

৪. তরল মাণিক—সুরা,—সুরাপাত্র—খান ;
পিয়ালাই দেহভাণ্ড,—সুরা তার প্রাণ ;
এই যে স্ফটিকপাত্র হাসিছে আসবে—
অশ্রু এ যে—মরম-শোণিতে কাণে কাণ।

৫. উঠ—ঢাল সুরা—নাহি কথার সময়—
তব মুখে আজি মোর অমৃত সঞ্চয়,
কুসুম-আসব ঢাল—অধর রক্তিম,
জটিল কুন্তল সম কুঞ্চিত হৃদয়।

৬. মানবে গড়িল যবে লয়ে জল বালি,
বিধাতা সাজাল ভালে—অদৃষ্টের ডালি,
কেন তবে মদ খেতে নিত্য করা মানা ?
সকল মানার সেরা—দু'টি হাত খালি।

৭. "মাতাল রে তুই"—বলে বেশ্যারে গোঁসাই
"পলে পলে বাঁধা তুই এর ওর ঠাঁই"—
বেশ্যা বলে "বটে—তবু শুধাই গো প্রভু
দেখাও নিজেরে যথা—সত্যই কি তাই ?"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৮. সুরা, সুর, সুরাঙ্গনা—পাশে যদি থাকে—
বনভূমি স্রোতস্বিনীকূলে যদি থাকে—
ইহা ছাড়ি ফির নাক আশার নরকে—
ইহা ছাড়া স্বর্গ নাই—স্বর্গ যদি থাকে।

৯. সুখের—পিয়ালা, তাহে ফুলশীধু ভার
সুখের—বীণার ছন্দ—বেণুর ঝঙ্কার
বিরাগী, লও না কভু সুরার সংবাদ,
সুখের—তুমিও, যবে শত ক্রোশ পার।

১০. মদের মৌসুম গেল—এল রমজান—
পান আর হাসি খুসি হ'ল অবসান।
—রহিবে অপীত পড়ে—সঞ্চিত আসব,
অঙ্গনার অঙ্গ ঘেরি হ'বো না শয়ান।

১১. সুখ নাহি—সুরা আর ইয়ার বিহীন—
বেণুর গুঞ্জন নাই—কাঁদে নাক বীণ—
যে ছাঁদেই দেখিনাক এই ধরাখানা
জীবনের সার মজা—বাকি রসহীন।

১২. সুখের—দখিনা বায়ে ফুলের দোলন,
সুখের—কুসুম-কুঞ্জে প্রিয়ার আনন,
সুখের নহে ত কথা গত দিবসের,
সুখের আজিকে কেন তার আলাপন।

১৩. দুই চারি দিন মোরা বাঁচি এ ভূতলে—
বাত্যা—বন্যা সম আয়ু ছোটে ভীম বলে।
দুট' দিনে মনে কিন্তু দিই নাক স্থান—
যে দিন আসিবে আর যে গিয়াছে চলে।

১৪. যখন সতর্ক শিষ্ট—আনন্দ না পাই।
যখন বেহুঁশ মত্ত—কোন জ্ঞান নাই।
জ্ঞান আর অজ্ঞানের মাঝামাঝি স্থান
সেই ত জীবন বটে—তারই গুণ গাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৫. জ্ঞান বিবেকের এই দুটি কথা সার—
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্মৃতি শ্রুতি দেয় নাই আর—
যাহা তাহা গেলা চেয়ে—উপবাস ভাল,
একা ভাল—নয় মেশা সাথে যার তার।

১৬. বাঁধা প্রেমে দীপ্তি নাই—স্ফূর্ত্তি মহিমার
আধনিভ অগ্নি সম তাপ নাই তার—
প্রেমিক যে জন তার কিবা দিন রাত—
নাহি শ্রান্তি—নাহি নিদ্রা—ক্ষুধা—তৃষা আর।

১৭. খাঁটি প্রেমিকের চোখে গোরা কিবা কাল,
নরক আঁধার কিবা স্বরগের আলো,—
কিবা দিব্য পট্টাম্বর—জীর্ণ কন্থা কিবা—
মৃত্তি পরে মাথা, কিবা উপাধান ভাল ?

১৮. যার প্রাণে জাগিয়াছে আলোক প্রেমের—
মস্‌জিদের যাত্রী হোক—অথবা মঠের—
প্রেমের দপ্তরে যার নাম আছে লেখা
রাখে না স্বর্গের আশা—ভীতি নরকের।

১৯. মন্দির—মস্‌জিদ্‌ বল—ভজ্‌নারই স্থান,
ঘণ্টা-ধ্বনি নহে কি তা'—ভজ্‌নেরই তান ?
তিলক—ত্রিশূল—মালা ইহারা সকলে
ঈশ্বর পূজার ভিন্ন, স্পষ্ট অভিজ্ঞান।

২০. "জানিস্‌ কি লাগি তুই পূজিস আমারে ?"
—মূর্ত্তি শুধাইল তার পূজক জনারে—
"নিজ রূপোচ্ছ্বাসে মোরে যে করে উজ্জ্বল
"তোর আঁখি দিয়ে সে যে আমাকে নেহারে।"

২১. এই যে অস্তিত্ব তব—অস্তিত্ব পরের—
এই যে মত্ততা তব—মত্ততা পরের—
চিন্তাভারনত মাথা কাঁধে রাখি দেখ—
হাত তব হাত নয়—আস্তিন পরের।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২২. কোন ভুলে, বুদ্ধিমান—ধরি কোন আশা,
এ পোড়া জগতে বাঁধে হৃদয়ের বাসা ?
যখনই আরাম তরে ছড়ায় সে পা,
হাত টানি কাল বলে দেহ তোর ওঠা ।

২৩. নির্গুণেরই চারিপোয়া অন্নের সংস্থান,
বোঁচা রাখে চোখা মাল—হায়রে বিধান !—
রূপসীর চারু আঁখি ভুলায় হৃদয়
চেঙ্গড়া-মহলে হায় বিলায় সে প্রাণ ।

২৪. এ ধরায় আছে যার রুটি আধখানা,
মাথা রাখিবার তরে নিভৃত আস্তানা,
গোলামী করে না কা'রো, প্রভু কারো নয়—
বলগে "আনন্দ রহ"—সুখী সেই জনা ।

২৫. ধরার মিটেছে সাধ ?—তার পরে বল ?
জীবন কেতাব শেষ ?—তার পরে বল ?
শতবর্ষ বাঁচিয়াছ সুখে সাধে আর
বাঁচিবেক শতবর্ষ—তার পরে বল ?

২৬. আছিল বিশাল যবে জীবনের আশ,
ভাবিতাম খুলি সব সংশয়ের পাশ ;
সতর্ক বিচারে এবে আঁখি মেলি দেখি—
যায় দিন—অন্ধকার নাহি হ'ল নাশ ।

২৭. এ ধরা যে ছিল মোর ক্ষণিকের বাস—
বালাই বিপদ দিলে—পূরাল না আশ,
খুলে নাই একটিও সংশয়ের পাশ,—
সরিতেছি প্রাণে মোর সহস্র হুতাশ ।

২৮. —পাপে বন্দী আমি প্রভু—দয়া কোথা তব ?
আঁধার হৃদয়ে মোর—আলো কোথা তব ?
কর্ম্মবশে লভি যদি স্বরগের দ্বার
উহা ত মজুরি মোর—দান কোথা তব ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২৯. তোমারই কৃপার পরে আশা রাখি যত—
অনুতাপে যাবেনাক পাপ শত শত—
তোমার কৃপায় হবে—অকৃত যা' কৃত
—কৃত যাহা হবে তাহা অকৃতের মত।

৩০. ভাল কর নাই—মন্দ করিয়াছ শত—
বিভু কৃপা পরে কিন্তু আশা রাখ যত,
মিথ্যা আশা অকৃত যা' নাহি হবে কৃত
—কৃত যাহা নাহি হবে অকৃতের মত।*

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

* সাহিত্য, ১৩০৭ পৌষ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩। আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভ কাল থেকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমঝদার ও রসিক সমালোচকদের সঙ্গলাভ করেছিলেন, এ তাঁর কাছে মূল্যবান সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছিল। 'উদাসিনী' কাব্যের লেখক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে বালক রবীন্দ্রনাথ নানা ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনতেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হলে অক্ষয়বাবু খুব খুশি হয়েছিলেন। জ্যোতিদাদা তো ছিলেনই সাহিত্যের নিত্যসঙ্গী। তারপর এলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

প্রথমবার বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন লোকেন্দ্রকে। দ্বিতীয়বার অসমাপ্ত যাত্রায় লাভ করলেন আশুতোষ চৌধুরীকে (১৮৬০—১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় সহ ১৮৮১ সালে লন্ডন যাত্রার উদ্‌যোগ করেন। তখনকার দিনে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত স্টীমারে যেতে হত। সেই স্টীমারে কলকাতা-মাদ্রাজ যাত্রার সঙ্গী ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। তিনি কেম্‌ব্রিজ সেণ্ট জনস্‌ কলেজে ভর্তি হয়ে পরে ব্যারিস্টার হবার জন্য যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রকাশ মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন, আর আশুতোষ বিলেতে চলে গেলেন। কিন্তু এই অসমাপ্ত পরিচয় পরে পারিবারিক সূত্রে মধুর সম্পূর্ণতা লাভ করে, আশুতোষ বিলেত থেকে ফিরে এলে ১৮৮৬ সালে। আর রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্র পালিত ও প্রিয়নাথ সেনের মতো পেলেন আলঙ্কারিকদের ভাষায় 'সহৃদয় সামাজিক' আশুতোষকে। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন—

> তখনো ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-এর মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণ-বিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধু সঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম, সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেলফের মরক্কো-চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন-একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূলকথা।

আশু বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।' তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

'কড়ি ও কোমল' ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আশুতোষ চৌধুরী রাজশাহী জেলার (পরে পাবনা) হরিপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দুর্গাদাস চৌধুরী হিন্দু কলেজে ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন জানা যায়। তিনি গভর্ণমেণ্টের সাবঅরডিনেট এক্‌জিকিউটিভ সার্ভিসে যোগ দেন। আশুতোষের বাল্যজীবন বনগ্রাম (যশোহর), কৃষ্ণনগরে কাটে। কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রানস পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তাঁর ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বছরে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়া (১৮৮০)। পর বৎসর তিনি কেমব্রিজে সেন্ট জনস্ কলেজে ভর্তি হন (১৮৮১) এবং অঙ্কশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্রে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন (১৮৮৫)। পর বৎসরে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যানুরাগের উল্লেখযোগ্য পরিচয় 'সাভানারোলা' [Savanarola] নামে দীর্ঘ কবিতা রচনা। রচনাটি সুধীবর্গ কর্তৃক সমাদৃত হয়। তিনি তাঁর কলেজের মুখপত্র 'দি ঈগল' পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর অদম্য জ্ঞান পিপাসার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডক্টর রিচার্ড গারনেট তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন।

দেশে ফিরে তিনি মাদ্রাজ যাত্রাকালীন অসমাপ্ত পরিচয় পূর্ণতর করবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে প্রতিভা দেবীর (১৮৬৫—১৯২২) সঙ্গে পরিচয় হয় ও পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। প্রতিভা দেবীর সঙ্গে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আদি ব্রাহ্মসমাজ মতে আশুতোষের বিবাহ হয় (অগস্ট ১৮৮৬)। এই বিবাহে তাঁর পিতার সম্মতি ছিল। মহর্ষিও আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন, "আশু আমার একটা অর্জন। অনেক সাধনায় প্রতিভা এমন পাত্রে পরিণীতা হয়েছে।" প্রতিভা দেবী রবীন্দ্রনাথ রচিত ও অভিনীত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) 'সরস্বতী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। সঙ্গীতে ও স্বরলিপি রচনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল।

ব্যারিস্টারিতে আশুতোষের প্রথম দিকে পশার না হলেও ধীরে ধীরে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ও বিভিন্ন দেশ-কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯০৪ সালে ২৫শে জুন তারিখে বর্ধমানে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের সভাপতিরূপে তিনি সেই স্মরণীয় উক্তি করেন 'A subject race has no politics'। তিনি চরমপন্থী দলের সমর্থক ছিলেন না আবার রবীন্দ্রনাথের মতোই রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধী ছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতোই 'আত্মশক্তি'র উপর। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের কৃতী ছাত্রদের যন্ত্র-শিল্প শিক্ষাদানের জন্য বিদেশে পাঠানো উচিত এবং সেই সব ছাত্রদের সহায়তায় দেশের অর্থনৈতিক শিল্পোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাঁর প্রস্তাব ছিল দেশ-ব্যাপী 'জেলা পরিষদ' গঠন করা এবং তারই মাধ্যমে নিজেদের সংগঠনকে জোরদার করা। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বহু ছাত্র সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছুক হন, তখন তিনি বাংলাদেশের ধনে-মানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করেন 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠনের জন্য (১৬ নভেম্বর ১৯০৫)। তারই ফলে ন্যাশনাল কলেজ, ন্যাশনাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিণত ফল বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আশুতোষ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ সালে জুন মাসে পাবনায় জেলা সম্মেলনে তিনি স্বদেশীব্রত ধারণ ও তাঁত-শিল্প রক্ষার জন্য আবেদন জানান। ১৯০৮ সালে পাবনায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সভায় এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। 'বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠনও তাঁর অন্যতম উল্লেখ্য কাজ। ১৯১২—১৯২০ কাল পর্বে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯২১ সালে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২২ সালে পত্নী প্রতিভা দেবীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯২৪ সালের ২৩শে মে তারিখে তাঁর মর্ত্যবন্ধন ছিন্ন হয়।

আশুতোষ শিক্ষাক্ষেত্রে দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর একটি ভাষণে তিনি বলেন—"স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলেন যে, আই-এ, আই-এস্-সি পর্যন্ত সব বিষয় বাংলাতে চলিতে পারে। আমার তাহাই মনে হয়। আমাদের ইংরাজী Text Book পড়িতে কোন বাধা হইতে পারে না। তাহা ইংরাজীকে Second Language করিলেও চলিতে পারে।"[১]

আশুতোষ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যে স্থান সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক রূপে নয়, সমালোচক রূপে। ১৮৮৬ সালে যখন তিনি ব্যারিস্টারি শুরু করেছেন 'মক্কেলের কুণ্ঠিত থলিগুলি পূর্ণবিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই' এবং 'সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতে-ছিলেন' ঠিক সেই সময় 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় তিনি 'সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস' ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'কাব্যজগৎ' পর্যায়ে তিনি নিম্নোদ্ধৃত রচনাগুলি প্রকাশ করেন— ১। 'কাব্যজগৎ' (১২৯৩, আষাঢ়) ২। 'কাব্যজগৎ' (১২৯৩, শ্রাবণ) ৩। 'কবি কীটস্' (১২৯৩, আশ্বিন) ৪। 'কবি পোএ' (১২৯৩, কার্তিক) ৫। 'কবি বার্নস্' (১২৯৩, মাঘ) ৬। আঁদ্রে সেনিয়ে (১২৯৩, ফাল্গুন)।

আশুতোষ চৌধুরী যে-ধরনের সমালোচনা সেদিন পরিবেশন করেছিলেন সেগুলি সবই বিদেশি রোমাণ্টিক গীতিকবিতা সম্পর্কিত। মহাকাব্য, আখ্যায়িকা কাব্য, নাটক বা উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা নয়, গীতিকবিতার আলোচনাই তাঁর একমাত্র বিষয়। তাঁর এ যুগ যে গীতিকবিতার যুগ সে কথাটি তিনি খুব জোর দিয়েই সেদিন বলেছিলেন।[২] তাঁর আলোচনার পদ্ধতিকে 'impressionist' বলতে হয়।[৩] তিনি কোনো প্রথাগত বা রীতিগত পথে কবিতার আলোচনা করেন নি। নিজের ভালো-লাগাটিকে তিনি পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন মাত্র। তাঁর রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা বুঝতে পারব তিনি ইংরেজি, ফরাসি, আমেরিকান গীতিকবিতার সঙ্গে, রোমাণ্টিক কবিতার বিভিন্ন মুখ্য প্রবণতাগুলির সঙ্গে সেদিনকার কাব্যরসিক বাঙালী পাঠকদের মনের মিল ঘটাবার কী দুঃসাধ্য প্রয়াস করেছেন। দেখব রোমাণ্টিক ক্রিটিসিজম্-এর পথে বাংলা সমালোচনাকে তিনি কতদূর এগিয়ে দিয়েছেন। আরো মনে রাখব যে এই রচনাগুলি তখন প্রকাশিত হচ্ছে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' রচনা শেষ করেছেন মাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশোন্মুখ। সে-সময় মিল্টন, বায়রন ও শেকস্পীয়রকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য তুলনামূলক আলোচনা 'বঙ্গীয়যুবক'দের অনেকেই করেছেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলি, কীটস্ বা ফরাসি কবি থিওফিল গোতিয়ে অথবা আমেরিকান কবি পো-র গীতিকবিতার নিবিড় পরিচয় দান বিরলদৃষ্ট।

'কাব্যজগৎ'-এর প্রথম প্রবন্ধে তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেলির স্কাইলার্ক সম্বন্ধীয় কবিতা দুটির ও তৎসঙ্গে তাঁদের কবি-মানসের একটি উপভোগ্য তুলনামূলক আলোচনা করেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Wordsworth-এর কবিতা বুঝিতে নীলাকাশের নিচে পাহাড়ের গায়ে ছায়ায় লীন হইয়া বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক শস্যকণা কখন বায়ুর ক্রীড়ার সামগ্রী, কখন বায়ুতাড়িত, কখন রৌদ্রতাপে মৃতপ্রায়, কখন শিশিরসিক্ত অশ্রুময় এই সব দেখিয়া কবি কি ভাবিতেছেন, তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। Shelley-র কবিতা বুঝিতে হইলে ঐ সব দেখিতে দেখিতে যখন প্রত্যক্ষ শস্যক্ষেত্র সূর্য চন্দ্র পাহাড় পর্বত জলস্থল সবই যেন মুছিয়া যাইবে—আবার সেই সব একটি কাল্পনিক জগতে পরিণত হইবে—যেখানে প্রত্যেক তৃণকণার আশা আকাশব্যাপী, যেখানে শিশিরের হৃদয় কাঁপে, যেখানে পাথরের প্রত্যেক কণার মধ্যে বিশ্বের শক্তি নিহিত আছে,—যখন তুমি নিজে এ জীবন হারাইয়া সেই অপূর্ব জগতের জীবনলাভ করিবে, তখন Shelley অনেকটা বোঝা সম্ভব।

শেলির কবিতার নাম 'To A Skylark' আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার নাম 'To The Skylark'। এই নামকরণের মধ্যে সমালোচক দুটি কবিতার ও দুই কবির মানসগত পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন। তিনি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

[শেলি তাঁর Skylark-কে বলেছেন] তুমি পৃথিবীর হইয়াও অপার্থিব ও শরীরী হইয়াও অশরীরী আনন্দস্বরূপ, তুমি পঞ্চভূতের মূর্তিভেদমাত্র, আকাশেই তোমাকে দেখি—তুমি শ্রুতিবিষয়গুণসম্পন্ন আকাশ ব্যাপিয়া আছ। পুরাতন ঋষিগণের আহ্নিকতত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই যেন Shelley বিবিধমূর্তিতে একই তেজের উদ্‌বোধন করিতেছেন—ক্ষুদ্র পাখী, গগনব্যাপী আলোক, বিশ্বব্যাপী শব্দপূর্ণ আকাশ সবই এক হইয়া গেল তাহাতে পূর্ব-পশ্চিম নাই, উত্তর-দক্ষিণ নাই, অনন্ত তেজ রূপান্তরে অনন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু Wordsworth-এর মনে আমরা পৃথিবীর জীবমাত্র, তবে আমাদিগের কপালেও স্বর্গ আছে; তিনি বলিবেন যে আবাসভূমি এবং স্বর্গ, ঊর্ধ্ব ও অধঃ মাত্র দুইটি ভিন্নগুণসম্পন্ন হইয়াও সংলগ্ন: Skylark তুমি জ্ঞানের আদর্শস্বরূপ এই বিস্তৃত আকাশে থাকিয়াও এই দুই বিন্দুর মধ্যে প্রসারিত যে রেখা সে রেখাচ্যুত কখন হওনা—ইহা একটি গভীর উপদেশ, জীবনের বিজ্ঞান ইহার প্রত্যেক অক্ষরে। যে যেখানকার জীব সেখানেই তাহার জীবন, তাহার ভালবাসা, সেখানকার জন্যই তাহার হৃদয়ের গান, তাহার চক্ষে জল; মন উচ্চ আকাশের দিকে চাহিতে পারে, কিন্তু প্রাণ পৃথিবীতে মিশিয়া থাকিতে চাহে, ঘুরিয়া ফিরিয়া পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কত বার শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্কের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুলনামূলক আলোচনায় নিজেরই কবি-স্বভাবের দুটি আপাত-বিরোধী দিককে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। একদিকে 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' অপরদিকে 'সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ পরিপূর্ণ' মানুষের জগৎ, এদের যথাক্রমে তিনি Ideal ও Real বলে আখ্যাত করেছেন। Ideal হল শেলির ও Real হল ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক। প্রথমটিতে মর্ত্য-অতিক্রমী সৌন্দর্যস্পৃহা, দ্বিতীয়টিতে মর্ত্যাশ্রিত জীবন-চেতনা। রবীন্দ্রনাথ 'খেয়া' কাব্যের 'নীড় ও আকাশ' কবিতায় প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্কাইলার্ক তত্ত্বকে যেন মিলিয়েছেন। আশুতোষ চৌধুরীর পূর্বে শেলির ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'স্কাইলার্ক'-এর স্বরূপ নিয়ে কেউ বাংলায় তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বলে জানা নেই। (যদিচ প্রথমে হেমচন্দ্র পদ্যে ও পরে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে শেলির ঐ কবিতার অনুবাদ করেছিলেন)।

'কাব্যজগৎ' পর্যায়ে দ্বিতীয় রচনাটিতে দেখা যায়, তিনি একটি অভিনব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার গঠন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> সংস্কৃতকাব্য যাহাই পড় তাহাতে আমাদের সহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখিতে পাইবে। এই সহানুভূতির প্রধান কারণ আমাদের আর্যধর্ম, আমরা ঈশ্বর সবতাতেই দেখি সবই আমাদের নিকট খানিকটা দেবগুণসম্পন্ন। আমরা একভাবে না হয় অন্যভাবে চিরদিনই প্রকৃতির পূজা করিয়া আসিতেছি। সেই কারণেই নীল আকাশ, স্বচ্ছ সলিল, তপোবন আমাদের দেবমন্দির। তাই মনুষ্যনির্মিত দেবমন্দিরের সহিত সংস্কৃত কাব্যের তুলনা চলে না, কিন্তু ইউরোপের কাব্যে চলে—আমি ইংরাজী ও ফরাসী কবিতার উদাহরণ দিয়া এইখানে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এইসূত্রে তিনি 'পুরাতন ইংরাজী কবিতা'কে গথিক রীতির, পরবর্তীকালের ইংরেজি কবিতাকে 'গথিক এবং ষোড়শ শতাব্দীর নবপ্রণালীর গঠনের দেবমন্দিরাদি এই উভয় ভাবসম্পন্ন' বলে মনে করেছেন। স্পেনসারের কবিতা তার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁর কবিতায় সমালোচক ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির একটি অংশের সাদৃশ্য দেখেছেন। এই সূত্রে তিনি ফ্রান্সের রঁসার-কে ইংলণ্ডের স্পেনসারের সমপর্যায়ী মনে করেছেন। রঁসারের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দুইজনেরই মনে গ্রীক ও রোমান পুরাণের কথা সর্বদাই মনে হয়—কিন্তু তাহাতে নিজের স্বাভাবিক ভাব বিলীন হইয়া যায় না।' সমালোচক মিলটনের চতুর্দশপদীগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখেছেন ফ্লোরেন্সের রাজগৃহের—

> সে রাজপ্রাসাদে কারুকার্য নাই, তাহাতে চতুর হস্তের কৌশলের পরিচয় নাই, তাহা উচ্চ উন্নত গৌরবময়। তাহাতে বল আছে, পুরুষ সৌন্দর্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আছে, তাহাতে কোমল লাবণ্য না থাকিতে পারে, তাহা প্রস্তর হইয়াও স্বপ্নরাজ্যের যেন। আলবের্টি এবং ব্রুনেলেস্কি যে ভাবের গৃহনির্ম্মাতা মিলটন সে ভাবের কবিতা লেখক!

এই রচনাটিতে সমালোচক ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তুলনামূলক আলোচনা-কালে একটি ফরাসি লোক-গীতির উল্লেখ করে, তার সঙ্গে মিল দেখে উনিশের শতকের 'বিশুদ্ধ' সৌন্দর্যবাদী art for art's sake তত্ত্বের উদ্‌গাতা কবি থিওফিল গোতিয়ে (১৮১১-৭২)-র একটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য বলে পুরো অংশটি উদ্ধৃত করি—

'বলরে যুবতী বালা—কোথা যাবি তুই?
পাল উড়িতেছে, বায়ু' বহিতেছে,
চল্ কোথা যাবি তুই?
সোনার ডিঙায় সোনার হাল,
পরীর পাখায় উড়িছে পাল
হাতির দাঁতের দাঁড়টি লয়ে,
দেবতার ছেলে যাইবে বেয়ে,
বালা কোথা যাবি তুই?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে
চল কোথা যাবি তুই?
বাল্‌টিক সাগর ধারে
কিম্বা প্যাসিফিক্ পারে
দুলাতে হিমানী দুল,
পরিতে অশোক ফুল
যথা সাধ যাহা চাই,
চল আনিবারে যাই
পরীর পাখায় উড়িছে পাল,
সোনার ডিঙায় সোনার হাল
বালা কোথা যাবি তুই?
'আগ্রহে বলিল বালা "জুড়াতে হৃদয় জ্বালা
চির প্রেম যেথা পাব, চল সেই দেশে যাব"—
"কোথা সেই দেশ প্রেমের রাজার,
জানেনাক কেহ বালিকা আমার।"

গোতিয়ে-র কবিতাটির নাম 'Barcarolle'। আশুতোষ চৌধুরীর 'ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে...বিশেষ বিলাস ছিল'—তিনি মূল থেকে কবিতাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।[৪] কবিতাটি পড়তে গিয়ে আমাদের মনে এ কথা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না উঠেই পারে না যে 'সোনার তরী' কাব্য রচনাকালে বিশেষত 'মানস-সুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দুটি রচনাকালে তৎকালীন 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী' রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এই কবিতাটির 'সংস্কার' বোধ করি ছিল। বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রে অকারণ র‍্যাঁবো বা বোদল্যেরের 'মাতাল তরণী' এবং 'যাত্রা' কবিতা-দ্বয়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন। 'মানসসুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দুটি যথাক্রমে ৪ঠা পৌষ, ১২৯৯ ও ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০ সালে রচিত হয়। আর আশুতোষ চৌধুরীর রচনাটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। আশুতোষ, প্রিয়নাথ ও লোকেন্দ্র এই ত্রয়ীর ফরাসি সাহিত্যে বিশেষ অধিকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ এঁদের জন্যই ফরাসি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হুগো বা গোতিয়ের রচনা (অনুদিত) তাঁর অপঠিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে ভিক্তর হুগোর (১৮০২-১৮৮৫) কবিতা অনুবাদ করেছিলেন 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগে, তার পিছনে আশুতোষের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা ছিল বলে মনে হয়। উনিশের শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ফরাসি রোমাণ্টিক গীতিকবিতার নবজাগরণ ঘটে। এই জাগরণের অন্যতম নেতা ছিলেন হুগো। আশুতোষ চৌধুরী বাংলা বৈষ্ণব গীতি কবিতার সঙ্গে হুগোর প্রেমকবিতার সাদৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন—

> ফরাসী কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, কোন বৈষ্ণব কবির লেখা পড়িতেছি। তাহাতে যে সৌন্দর্যলালসা আছে, তাহা নিতান্ত কোমল-ভাবে পরিস্ফুট। তাহাতে যে প্রেমের কথা আছে, প্রণয়ের যে জ্বালা আছে সবই যেন মধুর। আকাশের মেঘে, তমাল তরুতে, যমুনার জলেও যেন প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে। যাহাকে ভালবাসি সে যে জলে স্নান করিয়াছে, সেই জলে আমাকে ডুবাইয়া দিক। জ্যোৎস্নার আলোকে, অমাবস্যার অন্ধকারে, কুঞ্জে কি গৃহে, লৌকিক বাধা অতিক্রম করিয়া প্রেম আমার কাছে আসুক—এই ভাবে পরিপূর্ণ। একটি প্রাণ আর একটিতে লীন হইয়া গিয়াছে তাহাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। হিউগোর এই কবিতা দেখ—
>
> আমি তো গোলাপ প্রজাপতি তুই
> আজ হোক কাল হোক মাটিতে মিশাব দুই !
> ওখানে উড়িস কেন আয় কাছে আয়
> চল যেথা প্রাণ চায় উড়িবি মলয় বায়
> হোক না যে কোন স্থান
> পেতে দিব মম প্রাণ।
> হৃদয়ের শ্বাস বর্ণের বিকাশ
> প্রজাপতি হোক গোলাপকোরক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাখা গুটাইয়া হৃদয় মেলিয়া
দুজনে মিলিবে দুই।
থাকিব মিলিয়া হৃদয় ঢালিয়া
আকাশের গায় ধূলার শয্যায়
যথা হোক তথা সে পরের কথা
প্রাণীর প্রধান ধর্ম প্রাণীর প্রথম কর্ম
প্রাণের মিলন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের প্রেম-কবিতায় হুগোর স্পর্শ অলক্ষিত নয়, এবং আশুতোষ চৌধুরীই সম্ভবত সেদিকে কবিকে আকৃষ্ট করে থাকবেন।

'কবি কীটস্' রচনাটিতে সমালোচকের কাছে কীটস্ প্রতিভাত হয়েছেন মর্ত্য-সংসারে দেবশিশুসদৃশ অতিথিরূপে। সংসার-অনভিজ্ঞ, প্রেমে প্রতিদানবঞ্চিত কীটস্ সমালোচকের কাছ থেকে গভীর সহানুভূতি লাভ করেছেন।

কীটসের প্রেমানুভূতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—

> কবির ভালবাসা একটু অন্যরকম। কবি কি কোন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসে—না শুধু কল্পিত কিছুকে ব্যক্তিবিশেষ অবলম্বন করিয়া ভালবাসে? যাহাকে ভালবাসা দেখাইতেছে সে উপলক্ষমাত্র, যে দেহ আলিঙ্গন করিতেছে সে অশরীরী কিছুর জন্য—যে কথা কহিতেছে সে আকাশের জন্য, যে যুবতী শুনিতেছে সে অনেক সময় তাহা বুঝিতে পারে না। কীটসের ভালবাসা ব্যক্তিগত হইয়াও তাহা নহে। সে ত সংসারের কোন কন্যার জন্য নহে।

'আঁদ্রে সেনিয়ে' রচনাটিতে ফরাসি-বিপ্লব যুগে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত একজন তরুণ কবির (১৭৬২-৯৪) জীবন ও কবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বাংলা কাব্যে এই কবিকে আশুতোষ চৌধুরী সর্বপ্রথম পরিচিত করান। তিনি যে এই কবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ—

The most considerable poet of the eighteenth century was Andre Chenier who has also been regarded as a forerunner of Romanticism.[৫]

'কাব্যজগৎ' পর্যায়ে বাকি দুটি আলোচনার মধ্যে 'কবি বার্নস্' রচনাটির প্রথমেই আশুতোষ একটি মূল্যবান সূত্র উদ্ধার করেছেন, "গীত-বেদনাই গীতের ছন্দ, গীতের ভাষা।...গীতবেদনার আর এক নাম প্রতিভা।...যখন তাহা মানব-হৃদয় অধিকার করে, সেখানে রাজত্ব স্থাপন করে তখন সেই বেদনা-কাতর হৃদয় কবির,—তাহার গান, কাব্য। বার্নসের কবিতা পড়িলে এই গীত-বেদনা দেখিতে পাই, বিদ্ধ হৃদয়ে আর্দ্র চক্ষে কৃষাণ যুবকের বেদনা-কাতর গান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুনি। কালিডোনিয়ার বন্ধুর কর্কশ প্রকৃতির চক্ষেও জল দেখি, পর্বত সঙ্কুল প্রদেশের নিভৃত প্রচ্ছন্ন গুহালীনা নির্ঝরিণীকে কাঁদিতে দেখি, আর সেই উপত্যকার উপলখণ্ডের পাশে যে দুই একটি ফুল ফোটে, তাহাতে যেন মরুভূমির হৃদয়ের রক্ত দেখিতে পাই।"

বাংলা সাহিত্যে বার্নস্ (১৭৫৯-৯৬) সম্পর্কে এই প্রথম রসগ্রাহী মৌলিক আলোচনা।[৬] একদিকে উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে চিত্তযোগ, অপরদিকে স্কটল্যাণ্ডের সেই কর্মসঙ্গিনী নবযৌবনা জিনির সঙ্গে হৃদয়-সংযোগ (সেই কবিতাগুলি স্মরণ করুন, My love is like a red red rose, Ae fond kiss ইত্যাদি) বার্নসের কবিতায় অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। সমালোচক বার্নসের গীতিকবি-হৃদয় উদ্ঘাটন করবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যেখানে বার্নস্ নিজের ভাষায় কবিতা লিখেছেন সেখানে তিনি সত্য আর যেখানে তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখতে গেছেন সেখানে তিনি যেন ব্যর্থ। অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথ 'কবি য়েটস' (১৩১৯) সম্পর্কে আলোচনা কালে বার্নস্-এর উল্লেখ করে লেখেন—

> একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিমতার যুগে বার্নস্ জন্মিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তখনকার বাঁধা দস্তুরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে যেন স্কটল্যাণ্ডের অবারিত হৃদয় কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে আসিয়া অসংকোচে আসন গ্রহণ করিল।

আশুতোষ চৌধুরীর রচনাটিতে এ ধরনের কথা কতকাল আগে শোনা গেছে। এডগার অ্যালান পো-কেও আশুতোষ প্রথম বাংলা সাহিত্যে পরিচিত করান।[৭] পো (১৮০৯-৪৯) সম্পর্কে ইয়েটস্ বলেছেন 'always and for all lands, a great lyric poet'। কিন্তু এ সব সপ্রশংস উক্তি পো-র মৃত্যুর অনেক পরের। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৫২ সালে 'বিষাক্ত কুসুমে'র কবি বোদল্যের (১৮২১-৬৭) তাঁর কবিতাবলী অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। আশুতোষ চৌধুরী পো-র একটি উজ্জ্বল উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন—"পৃথিবীতে দীর্ঘ কবিতা নাই; দীর্ঘ কবিতা কথা দুইটি বিবাদী"। 'লিরিক' বা গীতি-কবিতাই যে এ যুগের যোগ্য প্রতিনিধি, সমালোচক বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির পর বিশেষ জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির গীতিকবিতা আলোচনার পথটিকে সুগম করবার চেষ্টা করেছেন। পো-র কবিতায় যে ধরনের রোমাণ্টিক মনোভঙ্গির পরিচয় আছে তার সঙ্গে হুগো-র 'ক্রমওয়েল'-এর মুখবন্ধে বর্ণিত রোমাণ্টিকতার সংজ্ঞা অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে গ্রোটেস্ক (grotesque)-এর অর্থাৎ অদ্ভুত রসের সম্মিলনের ভাবটির মিল আছে। এক ভয়-ভয় বিষাদের রহস্যময় ছায়া তাঁর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কবিতায় যেন পাখা মেলে রয়েছে। আশুতোষ ঠিকই দেখিয়েছেন—

তাঁহার কবিতাতে গোধূলির বিষাদ আছে, অস্তের ছায়া আছে। তাহার যেখানে আলোক তাহা রক্তসন্ধ্যার শেষ রশ্মি—যেখানে রজতরেখা হয় সে সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারই কিংবা যে চন্দ্র ওঠে নাই তাহারই।

এই ধরনের বিষণ্ণতা-প্রবণতার জন্যই বোদল্যের তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

পো-র একটি কালজয়ী কবিতা 'To Helen'।[৮] পথহারা পিতৃহারা বালক একদা যেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন সেই আশ্রয়দাত্রী নারীকে কিশোর পো ভালবেসেছিলেন। আশুতোষ এই 'কামগন্ধহীন' প্রেমের প্রকৃতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে, 'হেলেনের প্রতি' কবিতার অন্তর্নিহিত রহস্যটি উদ্ঘাটিত করেছেন—

রুসো উন্মাদের মত ভালবাসিয়াছিলেন, বাইরণও সেই শৈশবের প্রণয় কখনও ভুলিতে পারেন নাই—কিন্তু পোএ-র হেলেনের প্রতি ভালবাসা যেন অন্য জগতের; তাহাতে বয়স-সুলভ সঙ্কোচ ও হৃদয়ভরা স্নেহ ছিল কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই মানসিক—তাহাতে শরীরের তাপ নাই, রিপুর দাগ নাই—তাহা সূর্যালোকের ন্যায় শুভ্র।...আমার মনে হয় হেলেনকে প্রণয়ী-মা বলিলে পোএ-র সহিত তাঁহার ভালবাসা বুঝাইতে পারি। ভাগ্যদোষে অল্পদিনেই প্রণয়ী-মাকে হারাইয়া নিজেকেও চিরদিনের মত হারাইলেন—তাঁহার জীবনের আলোক অবসিত হইল।

বাংলা সাহিত্যে সেই পিউরিটানি হাওয়ার যুগে আশুতোষ চৌধুরী দুঃসাহসী শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। 'To Helen' কবিতাটির প্রায় আক্ষরিক গদ্যানুবাদ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

আমার স্বপ্নরাজ্যে রাত্রিদেবী কৃষ্ণবর্ণ রাজাসনে যোগে বসিয়া আছেন—কত বিজন কত বিকট প্রদেশ ছাড়িয়া—আকাশ, সময় অতিক্রম করিয়া তাহা বিস্তৃত। সেখানে উপত্যকা অতলস্পর্শ, পারাবার অসীম, তাহা গুহা-গহ্বর সঙ্কুল। মানুষ সেখানে ধূম্র শিশির ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। সেখানে পাহাড় যেন ভাঙ্গিয়া জলে পড়িবে—পড়িবে। অপার সমুদ্রের তরঙ্গ আকাশ ছুঁইবার আশায় আস্ফালন করিতেছে সে আকাশের গায়ে অগ্নি প্রজ্বলিত। হ্রদের জল সেখানে বিজনে যেন মরিয়া আছে, এমনই স্থির। তাহার বক্ষে নলিনী তুষারের বলিয়া প্রতীতি হয়।...

মৃত্যুর পরপারে এই awe and mystery-র জগতে কবি হেলেনের মৃত্যুঞ্জয়ী চোখদুটির দিকে তাকিয়ে জীবনের সব শূন্যতা বিস্মৃত হলেন—

সে তোমার চোখের দেবালোক—শুধু তোমার আত্মস্নাত চোখ—আমি শুধু তাহাই দেখিলাম! কত দণ্ড ধরিয়া দেখিলাম!—চন্দ্র অস্ত পর্যন্ত দেখিলাম—আহা সেই দেবালোকভরা চোখে কত বিজন-হৃদয়ের ইতিহাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লেখা আছে। সে চোখের তারায় কত শোকের কালিমা, তাহার বিস্তার কত উদার আশার জ্যোতি! সবই চলিয়া গেল শুধু সেই দুইটি কিছুতেই গেল না।...

এই অংশগুলি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের 'সিন্ধুপারে' কবিতাটির কথা স্মরণে আসে। ঐ কবিতায়, 'beauty of the horrid' যথেষ্ট আছে। বধূবেশিনী জীবনদেবতার সঙ্গে মরণ-সিন্ধুপারে মিলনের পিছনে কবিজীবনের প্রেরণাদাত্রী নারীর রূপক কল্পনা অপ্রত্যাশিত নয়। একথা সত্য যে 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে শেলির Epipsychidion কবিতার ছায়া আছে কিন্তু মনে হয় পো-র 'To Helen' কবিতাটির 'সংস্কার'ও বুঝি রবীন্দ্র মানসে কিছু বিদ্যমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ পো-র কবিতা অনুবাদ করেন 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগে। তাঁর 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন 'Raven' কবিতাটির অনুসরণে লেখেন 'ময়না'। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পে পো-র Ligeia গল্পের বহুল সাদৃশ্য লক্ষ করি। এ সবের মূলে আশুতোষ চৌধুরীর প্রয়াস অনুমেয়। পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক গীতিকবিতার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তিনি সেদিনকার বাঙালী পাঠকদের হৃদয়ের যোগসাধন ঘটিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রথমপর্বে তিনি যে তাঁর উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এ কথা মনে করা অসংগত হবে না।

আশুতোষের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে (১৯১৩) সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণ।[৯] এই অভিভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে সাধারণের ভাষা প্রয়োগে তাঁর দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন। ফরাসি সাহিত্যে অভিজাতবর্গের ভাষা ও সাধারণের ভাষা প্রয়োগের দ্বন্দ্বের ইতিহাস বিবৃত করে তিনি বলেন—

> ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্যে, বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ মহৎ ও নীচ বলিয়া অভিহিতও হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা, তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য ছিল। নীচের ভাষা নীচভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপী কিম্বা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে 'Chien' (কুক্কুর) কথাটি ব্যবহার করেন। তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। 'Mouchior' রুমাল কথাটি একস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া নাট্যশালায় খুনাখুনি হইয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতি বড়-ছোটর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ Victor Hugo-র কিছু পূর্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের Classic School-এর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

আশুতোষ চৌধুরী যখন এই ভাষণ পাঠ করেন, তখন তাঁর কনিষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষা বনাম চলিতভাষার (চৈত্র ১৩১৯) লড়াই শুরু করেন এবং পরিশেষে জয়লাভ করেন। প্রমথ চৌধুরীর মানস-গঠনে আশুতোষের দান এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—

> আমি সেকালে যখন স্কুল পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করি তখন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। সে রোগের কুফলের জের অনেকদিন যাবত ছিল। সুতরাং বহুকালের জন্য কলেজ যাওয়া আমার বন্ধ ছিল।... তাই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর অনুরোধে আমি home internment-এর অবস্থায় ফরাসি ভাষা শিক্ষা করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন আমার শিক্ষক। তারপর হঠাৎ একদিন একখানি ফরাসি নভেল আমার হাতে এল। সে নভেলখানি পড়া মাত্রই আমি ফরাসি সাহিত্যের ভালোবাসায় পড়ে গেলুম। এ বইয়ের নাম হচ্ছে Bel Ami আর তার লেখকের নাম Guy de Maupassant। দাদা আমাকে পড়াচ্ছিলেন Fe'nelon-র Te'le'maque আর আমি নিজ গুণে পড়ে বসলুম Bel Ami—ও লেখা কাব্যমদিরা। Bel Ami পড়ে যে আমি মুগ্ধ হয়েছি সে কথা দাদাকে বলি। তাতে আমার ভ্রাতা আমার উপর অপ্রসন্ন হননি, বরং আমার এই অকালপক্ব রসজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন।...আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সাহিত্যচর্চায় বাধা তো দেননিই আমার সাহিত্যপ্রীতিকে কোন একটা বিশেষ বাঁধাধরা পথে চালাতে চেষ্টা করেন নি। এটি আমি মহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। দাদার লাইব্রেরীতে যে সব পুস্তক ছিল, তার নাম করলেই ফরাসি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারবেন যে, সে বই কতদূর যুবজন-পাঠ্য—Daudet-র Sappho, Loti-র Marriage de Loti, Flaubert এর Madame Bovary, Gautier-এর Mademoiselle de Maupin প্রভৃতি গ্রন্থ আমি অবাধে গলাধঃকরণ করি।[১০]

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যে এই দুই দিকপালের মনোভূমি রচনায় ও রুচিগঠনে আশুতোষের দান বিস্মৃত হবার নয়। বাংলা সাহিত্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"সমুদ্র পারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস" তিনি মধুপের মতো বহন করে এনেছিলেন। বাংলা রোমাণ্টিক গীতিকবিতা ও রোমাণ্টিক সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি যে শক্তি ও সম্পদ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রেখে গিয়েছিলেন আজ তার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করা সাহিত্যরসিক বাঙালী মাত্রেরই ধর্ম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অ্যানা তড়খড়কর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'শুন নলিনী'

সংস্কৃত কাব্য-কবিতায় সূর্যের সঙ্গে পদ্মের সম্পর্ক প্রেমের। 'রবি' সূর্যের প্রতিশব্দ 'নলিনী' পদ্মের। কবি ভৈরবীতে বাঁধা গানটিতে যাঁকে 'নলিনী' নামে ডেকেছেন তাঁর নাম অন্নপূর্ণা, বিলেত-ফেরত মারাঠী পরিবারের মেয়ে তাই 'অ্যানা'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে আমেদাবাদের কথা লিখেছেন, বোম্বাই-এর দাদোবা পাণ্ডুরঙ্ তড়খড় (১৮২৩-৯৮) পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু 'নলিনী' সম্পর্ক অনুচ্চারিত। 'জীবনস্মৃতি' মূলতঃ তাঁর কবি-জীবনের উন্মোচনের কথা, এবং সেই আত্মপ্রকাশে 'নলিনী'র কিছু স্পর্শ ছিল। কিন্তু পঞ্চাশবছরের লব্ধকীর্তি কবি তাঁকে সেদিন রেখে দিলেন অপরিচয়ের আড়ালে। জীবনের সন্ধ্যালগ্নে এসে লিখলেন 'ছেলেবেলা'; এবার স্মরণ করলেন সেই হারিয়ে-যাওয়াকে—

> জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন সেই মেয়েটি 'ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে'। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে স্বরচিত গান 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি' শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি এমন কথাও নাকি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে—

> কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপে (১ জানুয়ারি ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু অন্তরঙ্গ ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা থেকে অ্যানাকে বেশিমাত্রায় প্রগল্ভা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কবি অবশ্য বলেছেন—

> কিন্তু সে মেয়েটিকে আমি ভুলিনি বা তার সে আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনো দিন।[১]

এই অ্যানা বা অন্নপূর্ণার বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৫১ সালে মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট হন। উচ্চশিক্ষার্থে (১৮৭৬-৭৮) পরে বিলেত যান। বোম্বাই নগরের শেরিফ ছিলেন (১৮৭৮-৭৯) গণ্যমান্য ব্যক্তি হিশেবে। তাঁর বড়ো ছেলে মহেশ্বর বিলেত যান আই. সি. এস্ পরীক্ষা দিতে কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। দেশে ফিরে রাজকোটে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রিন্‌সেস্ কলেজের উপাধ্যক্ষ হন, পরে কাথিওয়াড়ে শিক্ষা-অধিকর্তার পদ লাভ করেন। মেজছেলে আনন্দরাও ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি কঠিন হাঁপানি ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, পরে ইংলণ্ডেই মারা যান। জ্ঞানেশ্বরও বিলেতে চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষালাভান্তে মাতুঙ্গী (বোম্বাই) কুষ্ঠাশ্রমে যোগ দেন। সেজছেলে রামচন্দ্র জে. বি. টেক্‌স-টাইল মিলস্‌-এর সেক্রেটারি ছিলেন।

আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের এক নাম। তাঁর পত্নীর নাম রাধাবাই। তাঁদের মেয়েরা দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও মাণিক বাই সকলেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিতা। 'বোম্বাই প্রবাস'-এ (১৯১৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'বাই' শব্দ মর্যাদা সূচক আর মারাঠী মেয়েদের নাম দেবী ও নদী থেকে গৃহীত—অন্নপূর্ণা, দুর্গা, লক্ষ্মী, রেবা, যমুনা ইত্যাদি। ছোটমেয়ে মাণিক চিকিৎসাবিদ্যায় এল্‌ এম্‌ এস্‌ ও এল্‌ আর. সি. পি. ডিগ্রী লাভ করেন। প্লেগের সময়ে তিনি প্রশংসনীয়ভাবে প্লেগরোগীদের সেবা করেন। তাঁর বিবাহ হয় ব্যারিস্টার বাহাদুরের সঙ্গে।

বঙ্গে যেমন 'ব্রাহ্মসমাজ' মহারাষ্ট্রদেশে তার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান 'প্রার্থনা-সমাজ'।[২] কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) 'প্রার্থনাসমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৭ সালে বোম্বাই নগরে। সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৭২) প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দ্বারা। মাধব গোবিন্দ রানাডে (১৮৪২-১৯০১) তার প্রথম সম্পাদক হন। ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ সমাজ-সংস্কার মূলক প্রগতিশীল কর্মপন্থা 'প্রার্থনাসমাজ' গ্রহণ করেন।

আত্মারামের মেয়েদের দেখেশুনে ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুশি হয়েছিলেন মেরি কার্পেণ্টার। তাঁর 'Six Months in India' (1868) বইটিতে সে-সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'They were dressed simply and neatly in the English style and their manners were un-fettered and easy. Though they had received only two years' instructions they were able to speak English fluently and to enjoy seeing strangers and hearing of distant England. (28th September 1866)

আত্মারামের মেয়েরা মানেকজী কর্‌সেদজীর প্রতিষ্ঠিত আলেক্‌জান্দ্রা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি পার্শী সমাজে প্রথম বিলেত প্রত্যাগত ব্যক্তি। স্মল কজেজ্‌ কোর্টের জজ হয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল 'আলেকজান্দ্রা গার্লস্‌ নেটিব ইনস্‌টিট্যুশন'।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বোম্বাই যান এবং আত্মারামের বাড়িতে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি জানিয়েছেন—

...the daughters were better educated than any Hindu girl of another Indian city I knew. In his zeal for female education he was unique in those days.

বিলেতে পাঠাবার আগে এই ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মার্জিত পরিবারে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করা সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অন্নপূর্ণা বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন ; স্কুল রেকর্ড থেকে জানা যায় তাঁর জন্ম ১৮৫৫ সালে (এডিনবরায় প্রাপ্ত তাঁর মৃত্যুর সার্টিফিকেটে বয়স সম্ভবতঃ ঠিক নেই)। তিনি লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, তাঁর বাবা তাঁকে বিলেতেও কিছুকাল পড়িয়েছিলেন ; তাছাড়া গীত বাদ্যেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল। বয়সে ছোট-বড়ো হলেও পরস্পরের প্রতি তাঁরা অনুরক্ত হয়েছিলেন। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের গান—

শুন নলিনী খোল গো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি।
দেখ তোমারি দুয়ার পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।

'শুন নলিনী' গানটি ছাড়া 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর / সখি আমারে জাগায়ো না' গানটিও 'নলিনী'র উদ্দেশে রচিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন 'ফুলের ধ্যান' 'অপ্সরা প্রেম' কবিতা দুটিও 'অ্যানা'কে কেন্দ্র করে লেখা। 'মালতী পুঁথি'তে আরো কবিতা আছে 'নলিনী' সম্পর্কে।

'কবিকাহিনী' তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৭৭) প্রকাশিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করেন ১৮৭৮ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর। তরুণ কবি তাঁর 'কবিকাহিনী'র প্রকাশিত অংশকে অনুবাদ করে শোনাতেন তাঁর 'নলিনী'কে। ঐ কাব্যের নায়িকার নামও 'নলিনী'। এই কাব্যখানি যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় (৫ নভেম্বর ১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। তাঁরই অনুরোধ ও নির্দেশে জ্যোতি দাদা একখানি 'কবিকাহিনী' অন্নপূর্ণাকে পাঠান। বইখানি পেয়ে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন (২৬ নভেম্বর, ১৮৭৮)—

I have to apologize to you for having kept your kind letter of the 11th instant with the copy of কবিকাহিনী un-acknowledged so long ; but various causes in the shape

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

of illness have combined to hinder me from doing so till the present moment and even as I write this I have fever upon me.[৩]

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে চলে যাবার কিছু পরে অ্যানার বিবাহ হয় ডি. লিট্ ডিগ্রিধারী আইরিশ অধ্যাপক হ্যারলড লিটল্‌ডেলের (১৮৫৮-১৯৩০) সঙ্গে। এই রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহ হয় ১৮৭৯ সালে ১৬ নভেম্বর তারিখে। হিন্দু ও পার্শী সমাজের বহু নরনারী এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের পর অ্যানা তাঁর স্বামীর কর্মস্থল বরোদায় যান। অধ্যাপক লিটল্‌ডেল বরোদা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন। পরে তিনি বরোদায় 'ডাইরেকটর অব ভার্নাকুলার ইনস্‌ট্রাকশন' পদ গ্রহণ করেন (১৮৭৯-৯৯)। ১৮৮৯ সালে পথে গাড়ি ভেঙে এক দুর্ঘটনায় অ্যানার শরীরে দারুণ আঘাত লাগে। তাঁরা বিলেত চলে যান, এডিনবরায় চিকিৎসা চলে কিন্তু ১৮৯১ সালে ২ জুলাই তারিখে রাত ১টা ৪০ মিনিটে অ্যানার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে তিনমাসের (অগস্ট-অক্‌টোবর) জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন মেজদাদা ও বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে। সেখানে পৌঁছেই তিনি স্কট পরিবারের কন্যাদের বিশেষ করে কনিষ্ঠা কন্যা লুসির (যাকে অবলম্বন করে 'দুদিন' কবিতা লিখেছিলেন 'দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য' ছদ্মনামে) খোঁজে পুরোনো ঠিকানায় গেলেন এবং দেখা না পেয়ে মনো বেদনা বোধ করলেন। তখন অ্যানা বিলেতেই ছিলেন বলে মনে হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংবাদ নেবার চেষ্টা করেন নি।

তবে অ্যানা তাঁকে ভোলেন নি। যে 'নলিনী' নামটি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন সেই নামটিকে 'সুখের মতো ব্যথায়' তিনি লালন করেছিলেন 'সারা জনম ধরে'। তার প্রমাণ স্বরূপ একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়। বিলেতের 'spectator' পত্রিকায় (22 Oct, 1881) 'The Mental seclusion of India' নামে একটি প্রবন্ধ বার হয়। ইংরেজ লেখক ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে না ওঠার জন্য ভারতবাসীদের দায়ী করেন। তারই জবাব, বলা যায় মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন অ্যানা। মনে রাখতে হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "শ্রীঃ সঃ" ছদ্মনামে 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ'[৪] (১৮৭৭-৭৮) রবীন্দ্রনাথও পরে লিখেছিলেন 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩)। অ্যানার জবাবটি পরে 'Journal of Indian Association' পত্রিকায় 1882র February সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পত্রটিতে অ্যানা জানিয়েছেন—

I am only a Hindu girl (though my husband, may,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

I think be classed among your few cultivated Europeans who ever lived happily with a 'native' wife.

তিনি লিখেছেন যে প্রশ্নটি হল কেন য়ুরোপীয়ানরা ভারতবাসীর মন বুঝতে ব্যর্থ হয়। তাঁর মতে এমন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে বেশ ভালো ভাবেই মেলামেশা করেন। ইংরেজরা এদেশে একটু তৈরী-মন নিয়ে বেশি বয়সেই আসেন এবং—

There is little practical recognition (there is plenty of talk) of the moral responsibility of England to attain to some serious knowledge of her great dependency.

তারপর লিখেছেন যে-য়ুরোপীয়ানরা ভারতে আছেন তাঁদের ভারতবাসীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার চেহারা দেখে আমি বলতে পারি, ভারতবাসীরা তাঁদের সম্মান করার সঙ্গে ভয় জড়ানো থাকে বেশি, কাজেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে খোলামেলা যে ভাব বহন করেন, য়ুরোপীয়ানদের বেলায় তা স্বপ্নেরও অতীত। ধরা যাক, আমাদের বন্ধু বিষ্ণুপন্ত্ পদও অর্থমর্যাদায় মিঃ ব্রাউনের চেয়ে কোনো অংশে কম নন, কিন্তু মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর প্রাণ খুলে মেশা সম্ভব নয়, যদিচ বিষ্ণুপন্ত্ তাঁর অধস্তন কেরানী গোবিন্দরাও-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে চলতে পারেন। য়ুরোপীয়ানদের সম্পর্কে বিষ্ণুপন্ত্ বলবেন 'তাঁরা আমাদের কেউ নন, কাজেই কেমন করে তোমরা ভাবতে পারো যে তাঁরা আমাদের বেশ বোঝেন? এমনকি শিশুও বোঝে সাহেব হল এক পৃথক ধরনের জীব।...'

অ্যানা লিখেছেন, খুব কম য়ুরোপীয়ানই ভারতবাসীর কথা ভাবেন, তাঁদের জীবনের ভিতরে প্রবেশ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক। তাঁদের মধ্যে 'genuine affection and uncondescending friendship'-এর অভাব। য়ুরোপীয় মহিলাদের মধ্যে একই মনোভাব ভারত মহিলাদের সম্পর্কে।

হয়ত বিষ্ণুপন্তের ইচ্ছা হল 'রিফর্মার' হিসেবে নিজের পত্নীকে নিয়ে একটু বাইরে বেরোবেন ; তিনি তখন জোর করবেন, তাঁর পত্নীর ছোট্ট খোলা পদ-যুগলকে ইংলিশবুট দিয়ে ঢাকবেন আর সে বেচারী পতির ইচ্ছায় সেই বেশেই বার হবে এবং পথে মিসেস ব্রাউন ও তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে যেই দেখা হবে অমনি তাঁরা বিদ্রূপের হাসি হাসবেন।

নিজেকে 'মারাঠী' পরিচয় দিয়ে তিনি আরও লিখেছেন 'নেটিভ' বলতে য়ুরোপীয়ানরা কিছু নিম্নবর্ণজাত ভৃত্যশ্রেণী অথবা আপিসের নিম্নবর্গের কর্মচারীদের বুঝে থাকেন, সত্যিকারের সাধারণ ভারতবাসীর জীবনের 'homely joys and destiny obscure' তাঁরা কিছুই জানেন না। তিনি বলেছেন যে 'নেটিভ' ও 'য়ুরোপীয়ান' উভয় সমাজে তিনি জীবন যাপন করেছেন, ভারতে এখন তাঁর বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ য়ুরোপীয়ান বন্ধু আছেন। কিন্তু গোড়ায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অভিজ্ঞতা একটু পৃথক ধরনের ছিল, বিবাহের পূর্বে—

—was I alien to Englishmen because there was no feeling of equality to be got from them and I did not want patronage.

অ্যানা লিখেছেন, সম্পাদক মশায় হয়ত মনে করতে পারেন তাঁর কথা এক-পেশে শোনাচ্ছে। তিনি মানেন যে 'নেটিভ'রা একটু বেশি যাত্রায় অনুভূতি প্রবণ এবং 'The conquered are ever so and magnanimity is not Anglo-Indian virtue'। তিনি একথাও মানেন যে জাতিভেদ প্রথা, স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি ভারতীয় সমাজে সামাজিক প্রগতিকে প্রতিহত করেছে। কিন্তু—

...still I say if England wishes to understand India, England must begin. "Peace has victories" and these have yet to be won.

I am
Sir
yours respectfully

তারপর থামলেন, কী নাম বসাবেন? মিসেস অ্যানা লিটলডেল? না, মনে পড়ে গেল হৃদয়ের সেই উত্তপ্ত স্মৃতিমুখর দিনগুলি। সন্ধ্যা ও প্রভাত। কলম টেনে নিয়ে সই করলেন 'Lotus Flower' অর্থাৎ 'নলিনী'।[৫]

এই প্রতিবাদ-পত্র রচনার পর নয় বছর বেঁচে ছিলেন অ্যানা। তাঁর মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তাঁকে যশস্বিনী বাঙালী মহিলা-কবি তরু দত্তের অকাল মৃত্যুর (১৮৫৬-৭৭) সঙ্গে তুলনা করেন। সেখানে বলা হয়েছে তিনি জর্মান, ফরাসি ও পোর্তুগিজ ভাষাও উত্তমরূপে জানতেন এবং সংস্কৃতেও তাঁর অধিকার ছিল।[৬]

পত্নীর মৃত্যুর পর ভগ্নহৃদয় লিটলডেল ফিরে এলেন বরোদায় তাঁর কর্মস্থলে, রইলেন আরো আট বছর ভারতবর্ষে। ১৮৯৯-এর পর তিনি 'University College, South Wales and Monmouth, Cardiff'-এ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে কর্মরত থাকেন। ১৯৩০ সালে ১১ মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যানার মৃত্যুর পর তিনি আর বিবাহ করেন নি।[৭]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Extract of an entry in a REGISTER of DEATHS

Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act 1965

No.	1 Name and surname, rank or profession and whether single, married or widowed	2 When and where died	3 Sex	4 Age	5 Name, surname, and rank or profession of father, Name and maiden surname of mother	6 Cause of death, duration of disease, and medical attendant by whom certified	7 Signature and qualification of informant, and residence, if out of the house in which the death occurred	8 When and where registered and signature of registrar
722	Anna TURKHUD or LITTLEDALE Married to Harold Littledale Vice Principal of a College	1891 July Second 1h. 40m. P.M. 12 Warrender Park Crescent Edinburgh	F	27 Yrs	Atmaram Pandurang Medical Practitioner Radhabai	Nervous Exhaustion long Septicaemia 6 Days As Cert by Wm. Lundie M.B.	*Signed* D.A. Turkhud Brother Present 8 Buckingham Terrace	1891 July 6 At Edinburgh *Signed* R. W. Charlton Assist. *Registrar* (Intld). H.M.

অ্যানার মৃত্যুর সার্টিফিকেট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শকুন্তলা : গ্যেটে, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্য তথা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪) 'শকুন্তলা' রচনাটি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) পত্রিকায় ১৩০৯ সালে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক সম্পর্কে জর্মান কবিকুলগুরু গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) মন্তব্য উৎকলন করেছেন এইভাবে—

> য়ুরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে একটি মাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের এই উক্তিকে একটি সাধারণ প্রশস্তিরূপে গ্রহণ করেন নি। তিনি এই মন্তব্যের বিশেষত্ব লক্ষ করেছেন এবং তাঁর মতে—

> কবি বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি।[১]

এরূপ তাৎপর্যবহ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সম্ভব হয় না। তিনি তন্ময়পন্থী বা অবজেক্টিভ সমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মূলত মন্ময়পন্থী বা সাবজেক্টিভ সমালোচনার পক্ষপাতী যার সমর্থক ছিলেন ফরাসি লেখক আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের উক্তির অন্তর্নিহিত ভাবটি যে-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তদনুযায়ী তিনি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র এক মহত্তর অনবদ্য ভাষ্য রচনা করেছেন।

অধিকাংশ বাঙালী পাঠক এই ধারণা পোষণ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম শকুন্তলা-সম্পর্কিত গ্যেটের এই উক্তিটিকে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে স্বীকার করতে হবে বাঙালীদের মধ্যে এ কৃতিত্বের প্রথম অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর মহাশয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৫৩) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্ন-উদ্ধৃত মন্তব্য করেন—

> নানা বিদ্যাবিশারদ, অশেষ দেশ ভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম জোন্স শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং জর্মন দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি গেটি শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফর্স্টর্ কৃত জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে ; যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি : এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।[২]

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্যেটের এই শকুন্তলা-প্রশস্তি উপস্থাপিত করেন প্রায় আক্ষরিক ভাবে। শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয় নন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৫ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'কালিদাস ও শেক্ষপীয়র' নামে যে তুলনামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন সেখানেও গ্যেটের এই শকুন্তলা-প্রশস্তিটি দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন—

> সৌন্দর্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা, সেখানে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য জন্মে যে চরিত্র অনুসরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গল্পও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী। কালিদাসের নাটক পড়িলে গ্যেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে—"যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিব।"[৩]

এ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের চব্বিশ বছর পূর্বে রচিত, যখন রবীন্দ্রনাথ সতের বছর বয়সের তরুণ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তির উল্লেখ করেছেন অন্তত দুজন বিখ্যাত বাঙালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই সূত্রে একটি বহুজ্ঞাত তথ্যের পুনরুল্লেখ করা দরকার। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত তৎকালীন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্সের (১৭৪৫-১৭৯৪) প্রযত্নে। তিনি প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ছিলেন সেজন্য বিস্মৃতপ্রায় প্রাচ্যবিদ্যার পুনরুদ্ধারে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রতী হয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাঁর SACONTALA/or/ THE FATAL RING ১৭৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। জোন্‌স ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন তিনি সংস্কৃত নাটক (Na'tac) সম্পর্কে একজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ রাধাকান্ত (Ra'dhaca'nt)-এর কাছ থেকে শোনেন, এবং ঐ ব্যক্তি ('who had long been attentive to English manners') তাঁর সকল সংশয় দূর করেন। রাধাকান্তের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক হল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌'। জোন্‌স সত্বর ঐ নাটকের একখানি পাণ্ডুলিপি-পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সংস্কৃত-শিক্ষক রামলোচনের সহায়তায় নাটকটির অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমে প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের ল্যাটিন প্রতিশব্দ বসিয়ে দেন এবং উপলব্ধি করেন সংস্কৃতের সঙ্গে ল্যাটিনের গভীর মিল ('bears so great a resemblance to Sanscrit')। সেই ল্যাটিন-অনুবাদের আক্ষরিক ('word for word') ইংরেজি অনুবাদ করে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌-এর (১৮১৯-৯৯) মতে জোনস্‌ হলেন 'শকুন্তলা'র প্রথম য়ুরোপীয় আবিষ্কর্তা 'The first European to discover.' জোন্‌স কর্তৃক অনূদিত শকুন্তলা-র জর্মান ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন ফরস্‌টর (১৭৫৪-৯৪)। তিনি বিখ্যাত পর্যটক ও আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন কুক্‌-এর সহযাত্রী হন (১৭৭২-৭৫) তাঁর পিতার সঙ্গে। তিনি লণ্ডনে ১৭৯০ সালে জোন্‌স-কৃত অনুবাদ-গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন ও জর্মান ভাষায় তার অনুবাদ করেন। প্রকাশক জে. পিটার ফিশার বইটি ১৮৯১ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। ১৮৯১ সালের ১৭ মে তারিখে ফরস্‌টর তাঁর বই গ্যেটে, হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) ও তাঁর শ্বশুর মহাশয়কে একই সঙ্গে পাঠান। অবশ্য শীলার (১৭৫৯-১৮০৫) যিনি এই অনুবাদ-গ্রন্থটি চূড়ান্ত প্রকাশের পূর্বেই দেখেছিলেন তিনি ১৭৯০ সালে তাঁর পত্রিকা Thalia-র অংশবিশেষ প্রকাশ করেন। হার্ডারও শীলারের ন্যায় অভিভূত হন 'শকুন্তলা' পড়ে। তিনি ফরস্‌টরকে লেখেন যে শকুন্তলা 'প্রাচ্যের নিজস্ব খাঁটি ফুল ; এবং এই প্রথম, সুন্দরতম প্রকাশ। এ ধরনের সৃষ্টি পৃথিবীতে দুহাজার বছর অন্তর একবার করে ঘটে।' এবং তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'শকুন্তলা' সম্পর্কে লিখলেন—

Wo Sakontala lebt mit ihrem entschwundenen Knaben
Wo Duschmanta sie nu, neu von den Gottern empfangt
Sei mir gegrusst, O heiliges Land und du Fuhrer der Toene
Stimme des Herzens, erheb oft mich in Ather dahin.[8]

এর ইংরেজি অনুবাদ—

Where Sakontala lives with her vanished boy
Where Dusmanta receives her anew, anew from the Gods,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Hail to thee, O holy land and thou, leader of sounds,
Voice of the heart, uplift me often thither through celestial space.

কবি-মনীষী গ্যেটে আগ্রহভরে গ্রন্থটি পাঠ করেন এবং তাঁর হৃদয়ের সেই অ-লৌকিক আনন্দের ভার নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোকে উদ্‌বারিত করেন—

Will ich die Blumen des fruhen
die Fruchte des spateren Jahres,
Will ich, was reizt und entzuckt
will ich, was sattigt und nahrt,
Will ich den Himmel die Erde mit
einem Namen begreifen,
Nenn ich Sakontala, dich, und
so ist alles gesagt.[৫]

হার্ডারের নির্দেশে পরে গ্যেটে 'ich' স্থলে 'du' অর্থাৎ 'আমি' স্থলে 'তুমি' বসিয়ে দেন। এই প্রশস্তি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৭৯১ সালে Deutsche Monatss-chrift নামক পত্রিকায়। অবশ্য মনিয়র উইলিয়মস্‌ তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত 'Sakoontala'র (১৮৫৩) ভূমিকায় গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তির পরবর্তী পাঠ উপস্থাপিত করেছেন—

Willst du die Blute des fruhen,
die Fruchte des spateren Jahres
Willst du wos reizt und entzuckt,
willst was sattigt und nahrt,
Willst du den Himmel, die Erde mit
Einem Namen begreifen—
Nenn ich Sakonala, dich, und
so ist alles gesagt. [৬]

মনিয়র উইলিয়মস্‌ পংক্তিগুলির এইভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন—

Wouldst thou the young year's
blossoms and the fruits of its decline
And all by which the soul is
charmed, enraptured, feasted. fed ?
Wouldst thou the earth and heaven
itself in one sole name combine ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

I namme thee, O Sakontala ! and
all at once is said.

রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে লেখেন 'তরুণ বৎসরের ফুল' ও 'পরিণত বৎসরের ফল'। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরা যখন লেখেন 'বসন্তের পুষ্প,' 'বসন্তের কুসুম' এবং 'শরদের ফল' তাঁরা অর্থের অতিব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন একথা বলা বোধ হয় যাবে না। গ্যেটের ঐ অমর পংক্তিগুলির অনুবাদ সম্পর্কে আমি শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করছি না। প্রথম বলে রাখি উক্ত শকুন্তলা-প্রশস্তির সন্ধান মেলে গ্যেটের কাব্য-গ্রন্থাবলীতে। সেখানে কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদে এইভাবে পেয়েছি—

SAKONTALA

Wouldst thou the blossoms of spring
as well as the fruits of autumn,
Wouldst thou what charms and delights,
Wouldst thou what plenteously feeds,
Wouldst thou include both heaven and
earth in one designation
All that is needed is done,
when I Sakontala name.
Yesterday thy head was brown
as are the flowing locks of love ;
In the bright blue sky I watched thee
Towering, giant like above.
Now thy summit, white and hoary,
Glitters all with silver snow,
Which the stormy night hath shaken
From its robes upon thy brow ?
And I know that youth and age
Are bound with such mysterious meaning
As the days are linked together,
One short dream but intervening.[৭]

আমাদের প্রয়োজন অবশ্য প্রথম অংশটিকে নিয়ে।

এখানে দেখছি অনুবাদক 'বসন্তের পুষ্প' ও 'শরতের ফল'ই রেখেছেন। নয়াদিল্লীস্থ ম্যাক্সমুলর ভবনের প্রাক্তন ডিরেক্টর Heimo Rau ঐ অংশের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুরূপ অনুবাদ করেছেন—

Shall I embrace the blossoms of spring,
the fruits of the autumn
All that enchants and that charms,
all that nurtures and fills,
Shall I; embrace in a name all heaven
and whole of the earth :
Call I; Sokontala, thee—all is
composed in one name.

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ কৃত তিনটি অনুবাদই গ্রহণ যোগ্য।

মনিয়র উইলিয়মস্ ১৮৫৩ সালে প্রবৃত্ত হন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পাণ্ডুলিপি-পুঁথি মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য একটি সংস্করণ প্রস্তুত করতে ('to compile and publish an edition of the text of the Sakoontala from various Mss.')

ফরাসি ভাষায় প্রথম 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সটীক অনুবাদ করেন আঁতোয়ান লেওনার দ্য শেজি (Chézy, A. L. ১৭৭৩-১৮৩২)। তাঁর অনুবাদ ও টীকা—LA RECONNISSANCE / DE / SACOUNTALA / DRAME SANSCRIT ET PRACRIT / DE CALIDASA / PARÍS 1830./[৮] শেজি ও গ্যেটের মৃত্যু একই বৎসরে ঘটে ১৮৩২ সালে। শেজি তাঁর গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তিটি মূল জর্মান ভাষায় উৎকলন করেছেন। ফরাসি ভাষায় কালিদাস-চর্চার সঙ্গে শেজির নাম চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। রামমোহন শেজির 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর ফরাসি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের কথা জানতেন, তিনি Garcin de Tassy র কাছে উর্দু ভাষায় একখানি চিঠি লেখেন (অগস্ট ১৮৩১)। ঐ চিঠিতে রামমোহন শেজির সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা ব্যক্ত করেন। [Collet : Raja Rammohun Roy, Ed by D. K. Biswas & P. K. Ganguly, 1962]

প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্বল্‌কে রামমোহন রায় জোনস্-এর অনূদিত 'শকুন্তলা'র একটি কপি উপহার দেন (ডিসেম্বর ১৮৩১)। গ্যেটের শকুন্তলা প্রশস্তির কথা রামমোহন অবগত ছিলেন। কিন্তু একটি কুতূহলাশ্রিত প্রশ্ন সম্প্রতি মনে জাগে। গ্যেটের 'Travels in Italy' (1786-88) গ্রন্থে সংকলিত গ্যেটের লিখিত পত্রাবলী থেকে এমন একটা ধারণা হয় যে জোন্‌সের বা ফর্‌স্টরের শকুন্তলা-অনুবাদের পূর্বেই গ্যেটে 'শকুন্তলা'র কথা জানতেন। গ্যেটে লিখছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Naples, March I. 1787, Evening.

It would be difficult to give an account of this day. How often has the cursory reading of a book which irresistibly carries one with it, exercised the greatest influence on a man's whole life and produced at once a decisive effect, which neither a second perusal nor earnest reflection can either strengthen or modify. This I experienced in the case of Sakontala ; and do not great men affect us somewhat in the same way ?[৯]

এ অনুবাদ যে নির্ভুল তার প্রমাণ মূল জর্মান থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি—

Neapel, den I Marz [1787] Abends

...Zu der Wiederlesen und ernstliches Betrachten Kaum in der Folge mehr hinzuten konnte. So ging es mir einst mit Sakontala und geht es uns mit be-deutenden Menschen nicht gleicher weise ?[১০]

তাহলে নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে ১৭৮৭ সালের ১ মার্চ তারিখে গ্যেটে তাঁর শকুন্তলা-পরিচয়ের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন। কিন্তু জোনসের বা ফরস্টরের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাট্যানুবাদের পূর্বে তিনি শকুন্তলাকে কখনই বা দেখলেন ও কী করেই বা মুগ্ধ হলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর সহজে মেলে নি। আমি পূর্ব-জার্মানির হ্বাইমার শহরে 'গ্যেটে ও শীলার প্রত্নশালা'য় চিঠি লিখি গ্যেটের উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ফটোস্টাট্ কপির জন্য এবং সমস্যাটিও বিবৃত করি। কয়েক মাস পরে শ্রীমতী ক্লাউস্ (Anneliese Clauss) আমাকে জানান যে পাণ্ডুলিপিতে সত্যিই 'Sakontala' আছে, কিন্তু আসলে গ্যেটে ১৭৯৬ সালের আগে 'Italian Travels' লিখতে বসেন নি। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলি কখনো কাউকে ঠিক লেখা হয় নি, পাঠানো হয় নি, এটি একটি ফর্ম (from) মাত্র অর্থাৎ চিঠির আকারে লেখা। যেহেতু গ্যেটে ১৭৯৬ সালে অর্থাৎ 'শকুন্তলা' জর্মান ভাষায় অনূদিত হবার পাঁচ বছর পরে ঐ বইটি লেখায় হাত দেন, তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে 'শকুন্তলা' ১৭৮৭ সালে অনূদিত হয় নি। তাই এই ভুল।[১১]

একথা সত্য যে গ্যেটের জীবৎকালে ১৮১৬-১৭ সালে Italian Travels প্রথম প্রকাশিত হয়, সেখানে 'Sakontala'ই আছে এবং গ্যেটের মৃত্যুর (১৮৩২) মাত্র তিন বছর আগে ১৮২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর ২৮শ খণ্ডে এর কোনও রদবদল দেখা যায় না। কাজেই গ্যেটের 'বিস্মৃতি' ছাড়া অন্য কোনও কারণ খুঁজে বেড়িয়ে লাভ নেই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা

বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রামায়ণ কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ১৮৮১ সালে রচিত হয়। কবি নিজে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় সে-সময় বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হচ্ছিল এবং ঐ কাব্যের "আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি-প্রতিভার" ভাবটি তাঁর মনে আসে। 'বিদ্বজ্জনসভা'র দ্বিতীয় বাৎসরিক সম্মিলন উপলক্ষে "দস্যু রত্নাকরের কবি হইবার কাহিনী" নিয়ে একখানি নাটক লিখবার প্রস্তাব উদ্যোক্তাদের সংগত বোধ হল। তখন সারদামঙ্গলে বর্ণিত বাল্মীকি-কাহিনীর সঙ্গে "দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল"। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতী সেজেছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে এই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"

দেখা যাচ্ছে রত্নাকর দস্যুর কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমে মনে এসেছিল। পরে তিনি তার সঙ্গে বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ অংশকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এই কাহিনী একটি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। একটি নিরাশ্রয়া বন্দিনী বালিকার (ছদ্মবেশিনী সরস্বতী) করুণ মুখচ্ছবি ও ব্যাকুলতা দস্যু-বাল্মীকিকে কবি-বাল্মীকি পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কবি নিজেই লিখেছেন—"বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা"। সেই করুণাবশে সে তার অনুচরদের হরিণ-শাবক দুটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে এবং নিজেও ঘোষণা করেছে—'আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ'। পরে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ হত হলে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি তার মুখ থেকে অকস্মাৎ উচ্চারিত হয়েছে করুণায়। আর সেই মুহূর্তে সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটেছে। তখন দস্যুর উপাস্য দেবী কালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বাল্মীকি, লক্ষ্মীর প্রদত্ত ধনরাশি প্রত্যাখ্যান করেছে, সরস্বতীর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে। সরস্বতী আশীর্বাদ করে বলেছেন—

> এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার।
> যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যাংশে (১৮৭৪) বর্ণিত নিম্নোদ্ধৃত বাল্মীকির কবিত্বলাভ-প্রসঙ্গটি তরুণ কবিচিত্তকে মাতিয়ে তুলেছিল—

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়॥
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে॥

তার পর 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' মর্ত্যে নেমে এলেন, মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রক্তাক্ত ক্রৌঞ্চদেহ ও ক্রন্দনরতা ক্রৌঞ্চীর দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত-ব্যাকুল করে তুলল। তখন—

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে যেন উন্মাদিনী;
কাতরা করুণা ভরে
গান সকরুণ স্বরে
ধীরে ধীরে বাজে তাঁর বীণা বিষাদিনী॥
সে শোক সংগীত কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি
গদ্ গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা সিন্ধু উথলিয়া যায়॥

বিহারীলাল রামায়ণ মহাকাব্য বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভের পূর্ণ বর্ণনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেন নি, আংশিক বর্ণনা করেছেন। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বিহারীলাল সেজন্য ক্রৌঞ্চ-বৃত্তান্তের সঙ্গে সরস্বতীর বেদনা ও বীণাধ্বনির সংযোগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণ অনুসরণ করেন নি। তিনি অনুসরণ করেছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সেজন্য বাল্মীকিকে দস্যু নায়করূপে বর্ণনা করেছেন। দস্যু বা ডাকাতেরা সাধারণত কালীপূজক ও সুরাপায়ী। রবীন্দ্রনাথও বাল্মীকিকে কালীপূজক করেছেন। দস্যুদের উপাস্য কালী লোলরসনা, হিংসার প্রতীক। এখানে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত দস্যু-রত্নাকরের কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রত্নাকর দস্যু হলেও কালীপূজক নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে—ধূর্জটির নির্দেশে মহাপাপী উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা ও নারদ রামনাম প্রচারের জন্য মর্ত্যে এলেন। সেখানে 'চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর' দস্যুবৃত্তি করত। সন্ন্যাসীর বেশে ব্রহ্মা ও নারদ বনের পথে এলে রত্নাকর লৌহমুদ্গরাঘাতে তাঁদের হত্যা করবার সংকল্প করল। কিন্তু ব্রহ্মার মায়ায় মুদ্গর করবদ্ধ হল এবং ব্রহ্মা যখন হত্যায় কৃতসংকল্প রত্নাকরকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন বললেন, 'তুমি এই যে পাপ করছ এর কেউ কি অংশ নেবে?' রত্নাকর বলল, তার পাপের ভাগী চার জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৃত পাপের ভাগ সংসারের কেউই যখন নিতে স্বীকৃত হল না তখন নিজের মাথায় সে মুদ্গর দিয়ে আঘাত করল। শেষে ব্রহ্মা তাকে রামনাম জপ করতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু—

পাপে জড় জিহ্বা 'রাম' বলিতে না পারে।

ব্রহ্মা একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ দেখালে রত্নাকর অনেক কষ্টে 'মরা' শব্দ উচ্চারণ করল। তখন—

মরা মরা বলিতে আইল রামনাম
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥

রামনাম জপ করতে করতে তার দেহ বল্মীকাচ্ছাদিত হল। ব্রহ্মা তখন তার নামকরণ করলেন বাল্মীকি এবং বললেন—

সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ

বাল্মীকি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় ব্রহ্মা বললেন—

সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥—শ্রীরামপুরী সং, ১৮০২

এই কথা বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন। তারপর কৃত্তিবাস ক্রৌঞ্চবধ বা 'মা নিষাদ' শ্লোকোৎপত্তি বর্ণনা করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃত্তিবাস রত্নাকর দস্যুর যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস এ-কাহিনী কোথা থেকে পেলেন? ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কৃত্তিবাস কথিত 'চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর' নেই। সেখানে ঋষি বাল্মীকি স্বমুখে পূর্বজীবনবৃত্তান্ত রামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি বললেন, 'রাম, আমি ব্রাহ্মণবংশে জাত হলেও কিরাতদের সঙ্গে বর্ধিত হয়েছিলাম এবং শূদ্রাচার-রত ছিলাম। মুনিদের পথে দেখে তাঁদের পরিচ্ছদ কেড়ে নেবার সংকল্প করেছিলাম। তাঁরা আমাকে বললেন, কুটুম্বদের জিজ্ঞাসা করে এসো, তাঁরা তোমার পাপের অংশভাক্ হতে রাজি আছেন কি না। গৃহে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কেউই আমার পাপের ফলভোগী হতে রাজি হল না। তখন ধনুর্বাণ ফেলে আমি সেই মুনিদের শরণ নিলাম। তাঁরা 'রাম' নাম জপ করতে বললেন, কিন্তু অপারগ হওয়ায় 'মরা' শব্দের উচ্চারণের বিধান দিলেন। 'মরা' থেকে 'রাম' উচ্চারণ এল। এইভাবে বহুবর্ষ একাগ্রচিত্তে জপ করতে করতে আমার দেহ বল্মীকস্তূপে পরিণত হল। তখন মুনিরা আমাকে বাল্মীকি আখ্যা দিলেন।'—অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ ৬৪-৮৭

'অধ্যাত্মরামায়ণ' রামভক্তি প্রচারের কাব্য। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে রাম নাম জপ করলে মহাপাপীও উদ্ধার হয়। এই পুরাণখানি রচনার শেষ সম্ভাব্য কাল চতুর্দশ শতক। কৃত্তিবাস, মাধবকন্দলী, তুলসীদাস, একনাথ সকলেই অধ্যাত্ম-রামায়ণের ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে ব্যাসকৃত মহাভারতের 'অনুশাসন পর্বে'র অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকেও পাই বাল্মীকি বলছেন তিনি পূর্বে 'ব্রহ্মঘ্ন' ছিলেন পরে ঈশানের শরণ লাভ করে, পাপমুক্ত হন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর-কাহিনী এবং বিহারীলালের বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও সরস্বতী-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের রচনায় আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্র-নাথের নিজস্ব জীবনদর্শন এই বাল্মীকি-প্রতিভা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে। বাল্মীকি-প্রতিভায় দেখি দস্যু-বাল্মীকির কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তর ঘটার মূলে বন্দিনী বালিকার কাতর মুখচ্ছবি ও করুণ ক্রন্দন। মানব বাল্মীকিকে আচ্ছন্ন করে ছিল যে দস্যু-বাল্মীকি, তার মুক্তি ঘটল। বাল্মীকির দস্যুরূপের, কালীপূজকের, হিংসা-সাধকের অন্তরে যে-মানবরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই মানব-রূপের যেই জাগরণ ঘটল তখনই হল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। হিংসার পরিবর্তে এল করুণা—সেই করুণাবোধেরই পরিণতি ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি সাশ্রু সহানুভূতি। তখন হিংসার প্রতীক লোলরসনা কৃষ্ণবর্ণা কালীমূর্তির পরিবর্তে বাল্মীকির চিত্তে উদ্ভাসিত হল শুভ্রবর্ণা বীণাপাণি সরস্বতীমূর্তি। বাল্মীকির চিত্তে এই পরিবর্তন এনেছে শাস্ত্র নয়, যজ্ঞ নয়, দৈবাদেশ নয়—একটি নিরাশ্রয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভীতা বালিকার কাতর আকুল আবেদন। শিশুচিত্ত নিষ্পাপ, নির্মল। এই পবিত্র হৃদয়ের স্পর্শে বাল্মীকির হিংসাজনিত পাপভার দূরে গেল। এই কথাটি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'বিসর্জন' নাটকেও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও সমাজচ্যুতা বালিকা 'রঘুর দুহিতা' এবং বিসর্জন নাটকে 'রঘুপতি' ও 'অপর্ণা' প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভার বাল্মীকি ও বন্দিনী বালিকার পূর্ণতর রূপ। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ও 'মুক্তধারা' নাটকে শিশুচিত্তের প্রভাব গোবিন্দমাণিক্য ও বিশ্বজিতের চরিত্রে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাকে মোটামুটিভাবে রূপ দিলেও তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ আদিকাণ্ডের প্রথমসর্গের প্রারম্ভে পাই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পৃথিবীতে সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কে অগ্রগণ্য? ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, উদার ও সর্বভূতহিতরত কে আছেন? তিনি কি বীর্যবান্‌, বদান্য, জিতক্রোধ, অসূয়ামুক্ত?

বাল্মীকির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নারদ বললেন, এতগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ কোনো দেবতার মধ্যেও দেখা যায় না। তবে ইক্ষ্বাকুবংশের রামচন্দ্রের মধ্যে এই গুণগুলির চেয়েও মহত্তর গুণ বিদ্যমান। রামচন্দ্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন রামচন্দ্র নির্বিকার, মহামনা, শত্রুহন্তা, জ্ঞানী ও প্রজারক্ষক।

নারদ আরও বললেন, তিনি ধৈর্যে সমুদ্র, স্থৈর্যে হিমাচল, বীর্যে বিষ্ণু, আনন্দবর্ধনে চন্দ্র, ক্রোধে প্রলয়াগ্নি, ক্ষমায় পৃথিবী ও ত্যাগে কুবের সদৃশ। রামের চরিতকথাবর্ণনাশেষে তিনি বাল্মীকিকে বললেন, তুমি যে-সব গুণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে রামচন্দ্রে সেই সব গুণ বিরাজিত। তখন বাল্মীকি বললেন, যে-ব্যক্তি রামচরিত পাঠ করে সে সর্বাধিক পাপ থেকে মুক্ত হয়। শঙ্করের অনুগ্রহ লাভ করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মে বিলীন হয়। এখানেই প্রথম সর্গ সমাপ্ত হয়েছে। রামায়ণপাঠের এই পুণ্যফল বর্ণনা স্পষ্টতই পরবর্তী কালের যোজনা।

দ্বিতীয় সর্গে পাই বাল্মীকি নারদের প্রস্থানের পর তমসা নদীতীরে গেলেন। স্নানশেষে বল্কল পরিধান করে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করলেন। এমনসময়ে এক নিষাদ ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষটিকে নিহত করল। ক্রৌঞ্চীর বিলাপে ঋষি বাল্মীকির চিত্তে করুণরসের উদ্রেক হল, তাঁর মুখ থেকে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি উৎসারিত হল। নিষাদের উদ্দেশ্যে এই অভিশাপ উচ্চারণ করে তাঁর হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল—

শকুনং শোচতাহ্যেবং কিমেতদ্ব্যাহৃতং ময়া।—১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই পাখির জন্য শোকার্ত হয়ে এ আমি কি রচনা করলাম ! শোক থেকে জাত বলে এর নাম হল 'শ্লোক'। আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বাল্মীকিকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন—

শ্লোক এবাস্তয়ং বদ্ধস্তব বাক্যস্য শোচতঃ
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥
বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্
রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মা বললেন, আমার ইচ্ছানুসারে তোমার মুখ থেকে উক্ত শ্লোক উৎসারিত হয়েছে, হে ঋষিসত্তম, তুমি নারদের মুখশ্রুত রামচন্দ্রের চরিতকথা রচনা করো।

ব্রহ্মা শেষে জানালেন, আমার অনুগ্রহে সমস্ত অবিদিত বৃত্তান্ত তোমার বিদিত হবে। এই কাব্যে তোমার কোনো বাক্যই মিথ্যা হবে না। তুমি পুণ্য রামকথা শ্লোকবন্ধ করো। যতদিন পৃথিবীতে নদী ও পর্বতসমূহ থাকবে ততদিন তোমার রামায়ণী কথা অম্লান থাকবে। তখন বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা আরম্ভ করলেন।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির রামায়ণ কাব্য-রচনা-প্রসঙ্গটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দ্বিতীয় সর্গটিকে প্রথম স্থান দিয়ে তারপর প্রথম সর্গের নারদের বক্তব্যকে গ্রথিত করেছেন। ফলে কবিতাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়েছে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখি নবছন্দ লাভ করবার পর বাল্মীকি 'তরুণ গরুড় সম' মহৎ ক্ষুধা বোধ করেছেন। নারদ এসে তাঁকে নবছন্দে দেবতার জয়গান রচনা করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করলে বাল্মীকি বললেন, 'দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,'. কাজেই তিনি মানব-বন্দনায় ব্রতী হবেন তাঁর নবছন্দ নিয়ে। তাই তিনি নারদকে প্রশ্ন করলেন—

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে না করে অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দরকান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারদ ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—

অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

প্রকৃতপক্ষে বীর্যবান মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই যে সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন, সেই পরিপূর্ণ মানবাদর্শই তিনি রামচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত করেছেন, বাল্মীকির বর্ণনার ঠিক আক্ষরিক অনুকরণ করেন নি। মূল রামায়ণে বাল্মীকি-নারদ-সংবাদে রামচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত মহত্তর জীবনাদর্শকে অবিকল পাওয়া যায় না। গীতায় বর্ণিত 'দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ'-রূপটিই যেন রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ফুটেছে। ঈশোপনিষদের যে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন তাকে তিনি রামচরিত্রে সমন্বিত করেছেন—

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—

দুঃখবহনের এই উজ্জ্বল আদর্শের পরিচয় বাল্মীকি-নারদ-সংবাদে নেই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথের আজীবন কবিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা দিল হিংসার পরাজয় ও প্রেমের জয় তথা মানবধর্মের জয়। সেখানে তিনি কৃত্তিবাস ও বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন সেই তরুণ বয়সে। আর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে রামচরিত্রকে উপলক্ষ করে কবির চিরন্তন মানবধর্মের আদর্শ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

FORWARDED WITH COMPLIMENTS FROM
THE DEPARTMENT OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA

মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

অর্থশাস্ত্রমিদং পুণ্যং ধর্মশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥—১।৫৬।২১

মহাভারতকে এইভাবে একাধারে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাচীন কালেও মহাভারত পাঠের প্রচলন ছিল। মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান নিয়ে সংস্কৃতে নাট্য রচনার প্রচেষ্টাও বাংলাদেশে তুর্কি-আক্রমণ-পূর্ব যুগে ছিল। তবে মধ্যযুগে (সতেরোর শতকের গোড়ার দিকে) কাশীরাম দাসই সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি আদি-সভা-বন-বিরাট এই পর্বচতুষ্টয় রচনা করে স্বর্গত হন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। অন্যান্য রচয়িতাদের রচনা কাশীরাম দাসের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্তমান কালের কাশীদাসী মহাভারতের রূপ নিয়েছে। উইলিয়ম কেরী ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর থেকে কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রথম ছেপে বার করেন। তিনি নিজে সংস্কৃত মহাভারতের কয়েক পৃষ্ঠা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৭৯৫ সালে ৩১শে ডিসেম্বর লিখিত একখানি চিঠিতে পাই—

> 'I have been trying to compose a compendious grammar of the language which I send you together with a few pages of the Mahabharata with a translation, which I wrote out for my own exercise into Bengalee…'

এই পৃষ্ঠা সংস্কৃত মহাভারতের কোনো সংগৃহীত পুথির পৃষ্ঠা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-৯৪) কর্তৃক ১৭৮৪ সালে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহাভারতের পুথি সংগ্রহ করার কাজ চলেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ('edited by the learned Pundits attached to the establishment of the Education Committee') ১৮৩৪ সালে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করেছিলেন পণ্ডিত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ও নন্দগোপাল পণ্ডিত। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনীতে পাই, তারানাথ তাঁর গুরু নিমাইচাঁদ শিরোমণিকে এই দুরূহ কর্মে সহায়তা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেছিলেন (পৃ. ১০)। তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করেছিলেন পণ্ডিত নিমাইচাঁদ শিরোমণি, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার ও পণ্ডিত রামহরি ন্যায়পঞ্চানন। জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন কোলব্রুক সাহেবের 'পণ্ডিত', বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধ্যাপক এবং 'সমাচার-দর্পণ'-এর সহযোগী সম্পাদক। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর প্রেস থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়ে যে-মহাভারত পাঠের কথা লিখেছেন—সে মহাভারত এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ। এর পর কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০) উদ্যোগে ব্যাসকৃত মহাভারতের সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদকার্য শেষ হতে দীর্ঘকাল লেগেছিল (১৮৬০-৬৬)। "সৎকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া" কালীপ্রসন্ন এই অনুবাদ-যজ্ঞে ব্রতী হন। তিনি আপন বুদ্ধিবলে লক্ষ করেছিলেন—

> মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর এ প্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২।৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।...

এবং সেজন্য কালীপ্রসন্ন আধুনিক কালের textual editing-এর পন্থায় মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির পাঠ বিচার করে একটি নির্দিষ্ট পাঠ স্থির করেন ও পরে পণ্ডিতবর্গের সহায়তায় সেই পাঠের অনুবাদ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> আমি বহু যত্নে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত ও সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺শান্তিরাম সিংহ বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক সমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধ ভাবের ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্বক অনুবাদ করিয়াছি।

কালীপ্রসন্নের এই কার্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে মহাভারতের অনুবাদের কার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। দেশের অতীত ইতিহাস, শাস্ত্র ও সাহিত্যের আবিষ্কার, পুনশ্চর্চা, ও নব মূল্যায়ন রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ। আমাদের দেশের ইতিহাস আবিষ্কারে ও চর্চায় উইলকিনস্, উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, প্রিন্সেপ প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। অন্যদিকে রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, রাধাকান্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির নামও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিতে হবে। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্‌ভাগ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ রচনা মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ) নামে ১৮৬০ সালে জানুয়ারি মাসে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্নের উক্তি থেকে প্রতীয়মান হবে যে তখনকার দিনের কলিকাতার ব্যবসায়ী ধনী ও জমিদারের গৃহে সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ প্রভৃতির পুঁথি সযত্নে সংগৃহীত হত। সভাবাজারের রাজবাড়ি, আশুতোষ দেবের বাড়ি, পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ি, এবং তাঁদের নিজেদের বাড়ির সংগ্রহ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান রাজবাড়ির উল্লেখ করা দরকার। বর্ধমান রাজবাড়ি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রথম পর্বে বর্ধমানরাজের সহায়তাও পেয়েছিলেন। পণ্ডিত তারকনাথ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের দ্বারা সম্পাদিত ব্যাস-মহাভারতের আদি ও সভাপর্ব-যুক্ত প্রথম খণ্ড বর্ধমানরাজের নির্দেশে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়। (মনে রাখা দরকার 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা'য় বর্ধমানী-মহাভারতকে কটাক্ষ করা হয়েছে।) ইংরেজিতে মহাভারত অনুবাদ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে। প্রতাপচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কিশোরীমোহন গাঙ্গুলি এই কার্য করেছিলেন (১৮৮৩-৯৬)। মন্মথনাথ দত্ত, আরেকখানি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৯৫-১৯০৫)। যাই হোক—একথা স্বীকার করতেই হবে যে দেশের সর্বসাধারণ পড়েছে পদ্যবন্ধে রচিত কাশীদাসী মহাভারত আর উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি শিক্ষিতজনগোষ্ঠী ব্যাস-মহাভারতের মূল পরিচয় লাভ করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত বাংলা গদ্যে রচিত মহাভারত থেকে। মহাভারতের বিপুলতা, বৈচিত্র্য, গভীরতা, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও চিন্তা, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মাদর্শ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ চিন্তার ফসল কাশীদাসী মহাভারত পড়ে লাভ করা যায় না। বাঙালীদের মধ্যে ভারতীয় চেতনার স্রষ্টা রামমোহন। তিনি কয়েকখানি মুখ্য উপনিষদের বাংলা ভাষান্তর মুদ্রিত করে প্রাচীন শাস্ত্রকে শিক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে এনে দেন। পরবর্তী কালে কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ একই ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। মহাভারত, রামায়ণের মতো 'কাব্য' নয়, মহাভারত যুগপৎ কাব্য, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের সমাহার। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর তাঁদের প্রগতিশীল সামাজিক সংস্কারগুলির সমর্থন

৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খুঁজেছিলেন মহাভারতে এবং তাঁরা অনুকূল তথ্যকে উৎকলন করে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। কালীপ্রসন্ন 'জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান'কে বড় করে দেখেছিলেন—জন্মভূমির অর্থাৎ দেশবাসীর কল্যাণকর্ম সাধনের স্পৃহা তাঁর মধ্যে নানাভাবে জাগ্রত হয়েছিল এবং তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহুবার দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন স্বাভাবিক ভাবেই বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ অনুবাদ প্রকাশ করবেন বলে আশা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তবে মহাভারতের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতা একসূত্রে বাঁধা বলে তিনি পন্ডিতবর্গের সহায়তায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ মূলানুগত অনুবাদ করেন। কালীপ্রসন্ন ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

> ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিলে পূর্বপুরুষদিগের বিদ্যাবুদ্ধি স্মরণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়। শত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্‌গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী-বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।...

কালীপ্রসন্নের এই ব্যাখ্যা পড়ে আমরা বুঝতে পারি কী ভাবে প্রাচীন শাস্ত্রকে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা চলছিল।

২.

মহাভারত-চর্চায় এরপর পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) এ পন্থার চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি বাংলা গদ্যে ব্যাস-মহাভারতের অনুবাদের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে কালীপ্রসন্নকে স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনায় লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা না করে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—কৃষ্ণচরিত্র বিচারে তিনি গোলে হরিবোল দেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে মহাভারতকে বিচার করতে গিয়ে দেখেছেন প্রচলিত ব্যাস-মহাভারতে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। তিনি মহাভারতকে 'ইতিহাস' রূপেই গণ্য করেছেন, তাঁর বিচারে শ্রীকৃষ্ণ 'ঐতিহাসিক' চরিত্র। মেকলে, কার্লাইল, লা-মার্টিন, থুকিদিদীস প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে তিনি মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাসরূপে গণ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ঐতিহাসিক কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'কৃষ্ণচরিত্র' গঠন করেছিলেন তার মূল বহুলাংশে ছিল ফরাসি মনীষী 'পজিটিভিস্ট' কোঁতের মতাদর্শে। মূলত তাঁর ব্যাখ্যাত বৃত্তিত্রয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে আরোপিত হয়েছে বললে অন্যায় হয় না। ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির যোগ ও কোঁতের বিভিন্ন বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলন-তত্ত্ব মিলিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের' সৃষ্টি। তিনি যীশুখ্রীস্ট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বা বুদ্ধদেবের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 'আদর্শ' মানব রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'ভক্তি'র কথা বলেছেন সে ভক্তি নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত, চৈতন্য পন্থার গৌড়ীয় বৈষ্ণব 'ভক্তি' নয়। তিনি মহাভারতের যুগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন তার কারণ সেখানে আমাদের ইহজীবনকে গ্রহণ করেই 'আদর্শ' কর্ম-যোগী জীবন অভিব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (১৮৮৬) প্রকাশের পর তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম ভাগ রচনা করেন। ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন ১৮৮৮) গ্রন্থের সঙ্গে 'কৃষ্ণচরিত্র' অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবকাহিনী ও শ্রীকৃষ্ণজীবন-কথাকে যে-ভাবে যুক্তিগর্ভ বিচার করেছেন তার তুলনা মেলে না। তিনি মহাভারতের বিভিন্ন স্তর নির্ণয়ে, প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্বাচনে, অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্জনে যে সাহসিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণে যে-পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ বিচার দেখিয়েছেন তার মূল্য অপরিসীম।

বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ সকল বিষয়ই যুক্তিনিষ্ঠ রীতিতে আলোচনা করেছেন। সে যুগে আমাদের সমাজবিধৃত এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নেই, যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনায় অগ্রসর হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-ও রাষ্ট্র চিন্তায় তাঁর যুগে অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি 'মহাভারত' -এর সভাপর্ব থেকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সূত্রে 'দেবর্ষি নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ' নিয়ে দীর্ঘ প্রসঙ্গ করেছেন তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের এই আখ্যানে চিরকালের ও সর্বজাতির পালনীয় রাজধর্মকে দেখেছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজের, রাজা ও প্রজার মঙ্গলকে তাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্যকে তথা লোক-হিতকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম' বলে মনে করেছেন।

সেজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> তদুপদিষ্ট লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব। বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না ?

মহাভারতে পূর্বোক্ত অংশে সর্বশ্রেণীর প্রজার মঙ্গলই যে সমাজের মঙ্গল এবং সেই মঙ্গলবিধানই যে প্রকৃত রাজধর্ম সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বোঝানো হয়েছে। ঊনবিংশ শতক আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ ও সাহিত্যের নব-বিচারের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁত-বেন্থাম-স্পেনসার-মিল্-সীলির রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ব্যষ্টি-সমষ্টির কল্যাণবাদকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাভারতের ঐ রচনাটিতে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের একাংশের অবজ্ঞামিশ্রিত ভারত-ইতিহাস আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, জবাবও দিয়েছিলেন। তিনি নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদ আলোচনার প্রারম্ভে লিখেছেন—

> নারদের যে উপদেশ-বাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে যে রাজনীতি-বিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তদনুসারে চলিলে তাঁহাদিগের উপকার হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে মহাভারত ও গীতা বহু শতাব্দী পরে বরণীয়ার্থ লাভ করেছে এ কথা স্বীকার্য। অপর একটি প্রসঙ্গ 'ব্রাহ্মণের' সংজ্ঞা নির্ণয়। বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের মননশীল ব্যক্তি, তিনি বর্ণগত ব্রাহ্মণত্বকে স্বীকার করতে চান নি। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ এবং অসদাচারী ব্রাহ্মণকে শূদ্রাধম বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রাহ্মণ' বলে অভিবাদন জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ ঘোষণার সমর্থন তিনি পেয়েছেন মহাভারতে এবং কয়েকবার তিনি মহাভারতের নানা স্থান থেকে উক্ত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন। (এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটিও স্মরণীয়।) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তিসেবিত মন দিয়ে যেমন মহাভারতকে ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি ঊনবিংশ শতকের যুক্তিনিষ্ঠ মানববাদী বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের ও গীতার নিকট থেকেই তাঁর মনন-সাধনার পাথেয় বহুলভাবে লাভ করেছেন।

নবীনচন্দ্র সেনও ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবন অবলম্বনে রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬) কাব্যত্রয় রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আদি-মধ্য-অন্ত্য ভাগ উক্ত তিনখানি কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে কাব্যত্রয় রচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে প্রাচীন যুগের নৈমিষারণ্যের ঋষিদের অনুরূপ সাধনার অংশভাক্ বলে ঘোষণা করেছেন। 'মহাভারত'-আখ্যানকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের যে-পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন সে-সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রালাপ সর্বজনবিদিত। রাজ্যভ্রষ্ট অনার্য ও ক্ষমতাচ্যুত ব্রাহ্মণগোষ্ঠী একজোট হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত ধর্মরাজ্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে নবীনচন্দ্র উপনীত হয়েছিলেন। কবি শেলির ধর্মবিনির্মুক্ত বিশ্বরাষ্ট্র পরিকল্পনার সঙ্গে গীতার 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' মিলিয়ে 'একজাতি একধর্ম, শিখাব একত্ব মর্ম, এক ধর্মরাজ্য বিশ্বে করিব স্থাপন' ঘোষণা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে নবীনচন্দ্র করিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনা, সর্বভারতীয় চেতনা, হিতবাদী মানবচেতনা নবীনচন্দ্রের কল্পিত মহাভারতরাষ্ট্র গঠনের পিছনে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তথা মহাভারত ব্যাখ্যায় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের আখ্যানগুলিকে বিচার করে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করেছেন, যিনি 'অধর্ম' পন্থাকে সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতহিত ও নিষ্কামকর্মে রত থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পঞ্চভক্তিরস-সাধনার প্রবক্তা। নবীনচন্দ্র আর্য-অনার্যের মিলনব্রত সম্পাদনই শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লক্ষ্য রূপে ধরেছিলেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনার্য ব্রাহ্মণ-আর্য গাবে এক কৃষ্ণ নাম—
আর্য ও অনার্য এক প্রেমে ভাসমান,—
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম ॥

নবীনচন্দ্র মহাভারত তথা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি নব ব্যাখ্যা দানের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তাকে প্রশংসনীয় বলতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই গীতা ও মহাভারতের তথা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁদের দুজনের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ পূর্ণ মনুষ্যত্বের আধার যদিচ দুজনের কল্পনায় ও লক্ষ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

৩.

রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজচিন্তায় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের শক্তিকে বহুলভাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সমাজে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রেনেসাঁসের পরিবর্তে 'রিভাইভ্যালিজমে'র ঢেউ প্রবল হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ১২৯১ সালে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকা দুখানি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকা দুটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দুধর্মের বা ধর্মের যে 'আদর্শ' প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন তার সঙ্গে তথাকথিত 'নব্যহিন্দুত্বে'র পার্থক্য আছে। কোঁতের 'প্রত্যক্ষবাদ' থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের সন্ধান পান এবং পরে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মত ও ভগবদ্‌গীতার তত্ত্বকে মিলিয়ে একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন, যার সঙ্গে 'প্রচলিত' আচারসেবিত হিন্দুধর্মের কোনও যোগ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই জ্ঞান-প্রতিপাদ্য 'আদর্শ'কে তাঁর অনুগামীরা বহন করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'নব্যহিন্দুত্বে'র নেতা শশধর তর্কচূড়ামণিকে (১৮৫১-১৯২৮) স্বীকার করেন নি। কিন্তু সেদিনকার হিন্দু সমাজে তর্কচূড়ামণির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এবং তাঁর অন্যতম সহায়ক ছিলেন একদা বঙ্কিম-সুহৃদ্‌ চন্দ্রনাথ বসু। আচারগত ধর্ম ও প্রথাগত সংস্কারের অদ্ভুত (তথাকথিত বৈজ্ঞানিক !) ব্যাখ্যা-ভাষ্য প্রচার ও তার সমর্থন 'নবজাগরণে'র শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের "হিং টিং ছট্‌" কবিতা (সাধনা, ১২৯৯ আষাঢ়) স্মরণীয়। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ধর্ম ও সমাজচিন্তায় উদার-মত ও পথের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের রক্ষণশীল ও প্রগতিবিমুখ মতামতকে তাঁরা 'আর্যামি'র সমর্থন বলে প্রকাশ করতেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৫১-১৯০২)। তিনি ১২৯০ সালে কৃষ্ণানন্দ নাম নিয়ে নতুন ধরনের তন্ত্রসাধনা শুরু করেছিলেন। তিনি নাকি ঘোষণা করেছিলেন, কলিযুগে তিনি 'কল্কি অবতার'।[১] 'আর্যামির আস্ফালন'কে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেন নি ('আর্য ও অনার্য' দ্রষ্টব্য)। তিনি প্রিয়নাথ সেনের নিকট এক পত্রে লিখলেন ব্যঙ্গ করে—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে ॥
তাঁরা বলেন 'আমি কল্কি' গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি ॥

এবং এই ১২৯১ সালে (১৮৮৫) মাঘ মাসে (৫ই মাঘ) রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজ গৃহে 'রামমোহন রায়' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন—

রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল।…রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন।…কেবল মাত্র বাহ্য-অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে-মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে-জড়পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন…

রামমোহন রায় শাস্ত্রের আয়ুধ দিয়েই অশাস্ত্রকে আঘাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বলেছেন 'ভারতপথিক'। তিনিও প্রচলিত প্রগতিবিমুখ 'নব্যহিন্দুত্ব' ও প্রচলিত সংকীর্ণ লোকাচার ও প্রথাগত ধর্মাশ্রিত জীবনকে ধিক্কার দিয়ে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলেন মহাকবি ব্যাসকৃত অমর মহাকাব্য 'মহাভারত'-বর্ণিত জীবন। তিনি দেখালেন মহাভারতে যে বিপুল মানবজীবনবেগ সহস্রধারায় উৎসারিত, উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সেই জীবনবেগের কিছুমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে হিন্দুসমাজের আমরা আজ আর বহন করছি না, অথচ দোহাই পাড়ছি সেই প্রাচীন ভারতের, আমাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জড় মতগুলির সমর্থনে। এই মানসিক শঠতা ও ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে লিখলেন—

আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল।… আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহুদিন হল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র।… এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ-বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত-অহংকার অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার-মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্ত-লোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লব-সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তের সংঘাত-দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।

কাজেই মহাভারতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিলেন বলিষ্ঠ জীবনধর্মী সভ্যতার, যে-সভ্যতা 'আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা' নিয়ে মত্ত ছিল না। 'জীবন্ত সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা'র উজ্জ্বল নিদর্শন তিনি দেখেছিলেন 'মহাভারত' গ্রন্থে এবং নানা উপলক্ষে মহাভারতের এই উন্নত সহস্রশীর্ষ জীবনকে তিনি উপ-স্থাপিত করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০১) তিনি বেগবান প্রাচীন ভারতের যে-বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনা যে মহাভারতকে সম্মুখে রেখে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি লিখেছেন—

> আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন; তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল, এক কথায় জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতবর্ষের কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।

অথচ আমাদের বর্তমান আর্যম্মন্য হিন্দুসমাজ যে মহাভারতের সেই উদার বীর্যবান সমাজ থেকে কতদূর অধঃপতিত হয়েছে তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি হ্যামারগ্রেন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রামমোহন রায়ের বিশ্বমুখীন মত-আদর্শ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পর্কে সশ্রদ্ধমনা হয়ে সুইডেনবাসী হ্যামারগ্রেন বাংলাদেশে এসে অকালে পরলোকগত হন। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হ্যামারগ্রেনকে (Karl Hammergren) আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর মৃতদেহ যেন অগ্নিতে দাহ করা হয়। মৃতদেহ নিমতলার ঘাটে দাহ হবার পর (৩ জুলাই ১৮৯৪) রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ 'ম্লেচ্ছ'দাহে হিন্দুশ্মশানের অপবিত্রতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' (১৩০১) প্রবন্ধে এই মূঢ় 'ধর্মনিষ্ঠা'র তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন—

> জানি না কী দুর্দৈবক্রমে সম্প্রতি এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও হিন্দুধর্মকে নিষ্ঠুর সংকীর্ণ এবং একান্ত পরবিদ্বেষী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই সর্বনাশা 'সংকীর্ণ' পথ সর্বথা পরিত্যাজ্য। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার শক্তি তথা সত্যকে নির্মোহদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন। ঐ সভ্যতার 'চিরন্তন অংশ' গ্রহণে যে আমাদের কল্যাণ বই অমঙ্গল নেই এ কথা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রচিত 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ (১৩০৮) থেকে একটি অংশ উৎকলন করা যেতে পারে—

> এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান্ ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান ছিল তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।

বলা বাহুল্য উৎকলিত অংশটির অনুরূপ বক্তব্য আমরা পূর্বে দেখেছি।

ভারতীয় 'বিশিষ্টতা' 'স্বাধর্ম্য' 'স্বাতন্ত্র্য' প্রভৃতির ঘোষণা যে শেষ পর্যন্ত মহাভারত-বর্ণিত আর্যজীবনের প্রকৃত সত্যের বিরোধী হয়ে ওঠে এ কথাই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' রচনার পরে ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বজাতির 'বিশিষ্টতা' ও স্বাদেশিকতা নিয়ে গৌরবকারী অথচ সংকীর্ণমনা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের একাংশের চিন্তা ও আচরণের দৈন্য রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন। যাঁরা লোকপরম্পরাগত আচারকে শাস্ত্রনির্দেশ বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক প্রথাকেই সমর্থন করেছেন, বুদ্ধি বা বিচারকে নয়, সেই সমাজের অবিবেকী জড় ধারণাকে তীব্রভাবে আঘাত করবার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন—তাই তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাভারতের দৃষ্টান্তকে পুনরায় তুলে ধরলেন সজীব মনুষ্যত্বের নিদর্শন হিসাবে—

> একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে ; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল ; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল ; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল ; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দুসমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল…সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না,—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি…

'যাহা চলিতেছে না' অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের জঙ্গম সভ্যতাকে বর্জন করে আমরা যে 'স্থাবর' রূপকে গ্রহণ করছিলাম, তার বিরোধিতা করে সমকালীন নাটক 'অচলায়তন' (১৯১১) প্রকাশিত হয়। ঐ নাটকের 'স্থবিরপত্তন', 'মন্থরগুপ্ত', 'স্থবিরক' নামগুলি জড়ত্বের দ্যোতক। বেগবান জগৎপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, উঁচু প্রাচীর তুলে 'অচলায়তন' প্রতিষ্ঠা, চণ্ডককে কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলিদান, একজটা দেবীর দিকের জানালা খোলার অপরাধে বালক সুভদ্রের 'মহাতামস' প্রায়শ্চিত্ত সবই 'স্থবির' সভ্যতার বিশেষ 'রূপক' মাত্র। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সর্বপ্রকার স্থবিরত্বের বিরোধী, তাই অচলায়তনের দেয়াল 'গুরু'-চালিত লালটুপিপরা শোণপাংশুদের অস্ত্রাঘাতে বিচূর্ণ হয়। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে তিনি আশীর্বাদ জানান, অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন মনের ও চিন্তার তারুণ্যকে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে (১৩২১) তিনি এই যৌবনের শক্তিকে ডাক দিতে গিয়ে পুনরায় মহাভারতের প্রাণস্পর্ধী জঙ্গম জীবনকেই তুলে ধরলেন—

> আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে-যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে-যুগ শিল্পসৃষ্টি করিয়াছিল, যে-যুগ রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া দেখিতেছি জগতে আমাদের মতো সনাতন আর কিছুই নাই। কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি দ্রৌপদী ও কর্ণ চরিত্রের আদিম বলিষ্ঠতার উল্লেখ করেছেন—

> মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই। খুব সম্ভব, আধুনিক খ্যাত-অখ্যাত অনেক আর্য বাঙালি লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী নাম দিয়া এমন সকল সতীচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি, মহাভারতের দ্রৌপদী তাহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নব্যবল্মীক রচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন।

কর্ণ চরিত্র সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি রবীন্দ্রনাথ করেছেন।

বিচিত্রবীর্য সমাজের যে-পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তার মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি সংঘাত ও সমন্বয়মূলক ইতিবৃত্তের সন্ধান পান। আর্য ও আর্যেতর গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতাগত ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব, যজ্ঞ-বিধি ও জ্ঞান-ভক্তির দ্বন্দ্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা যে একটা নূতন পরিণতির পথে যাত্রা করেছিল তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেন 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে (১৩১৮)। এই প্রবন্ধটি পঠিত ও প্রকাশিত হবার পর তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পর বৎসরের শ্রাবণ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩১৯) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সমর্থন করে একটি 'আলোচনা' প্রকাশ করেন। কবির প্রবন্ধটি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৯১৩ সালের অগস্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'My Interpretation of Indian History' নামে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রিকায় 'A Vision of India's History' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, সেটি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটির অবিকল অনুবাদ নয়। অনেক নতুন তথ্য ও মন্তব্য কবি এই প্রবন্ধে যোগ করেন। এই প্রবন্ধে মহাভারত-বর্ণিত বহু চরিত্র ও ঘটনাকে কবি অচিন্ত্য-পূর্ব রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মহাভারত সংকলনের ঐতিহাসিক যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দান করেছেন।

আর্য ও আর্যেতর গোষ্ঠীর সংঘাতের রূপক বলে তিনি গ্রহণ করেছেন মহাভারতের রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ কাহিনীকে। নাগবংশ ধ্বংসের মধ্যে সে-যুগের গোষ্ঠীবৈরিতাই রূপায়িত হয়েছে। অন্যদিকে রামায়ণের জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র ক্ষাত্রিয়ত্রয়ী আর্য ও আর্যেতর জনগোষ্ঠীর অন্তঃসংঘাত ঘুচিয়ে একটি সমন্বয়ের সূত্রে উভয় গোষ্ঠীকে বন্ধ করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং সেজন্যই রামচন্দ্র 'অবতার' রূপে পরবর্তী কালে পূজিত হয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এবং এই পর্যায়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণও। (এখানে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে মতসাদৃশ্য লক্ষণীয়)। তিনিও ক্ষত্রিয়, এবং বেদ ও ব্রাহ্মণ্যমত বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের মতে ভৃগু যে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেছিলেন তার মধ্যে রয়ে গেছে সেকালের যজ্ঞাদি ধর্ম ও তার বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্ব। মহাভারতকে অবলম্বন করে তিনি প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর 'আদর্শ'গত দ্বন্দ্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গীতা মহাভারতেরই অংশরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং ক্ষত্রির শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় অর্জুনকে যে-উপদেশ দিয়েছেন সেগুলিই এখানে সমাহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গীতার কয়েকটি শ্লোক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২॥৪২

অথবা—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ২॥৫৩

তাঁর মতে 'বেদ' ও 'শ্রুতি' সম্পর্কে ভগবদ্‌গীতার এই মন্তব্য বৈদিক কর্মবিধির প্রতিপক্ষ।[২] এবং স্মরণীয় যে ভগবদ্‌গীতার প্রবক্তা ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রির শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আর একটি নতুন কথা বলেছেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মূলত দুটি ধর্মপন্থার অর্থাৎ কৃষ্ণপন্থা ও কৃষ্ণবৈরীপন্থার যুদ্ধ, রাজ্যলাভে কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষ মাত্র নয়। তাঁর মতে মহাভারতের পরবর্তী কালের সংস্করণে প্রচলিত রূপান্তর ঘটানো হয়েছে—

In this latter version of the epic the fact is suppressed that it was an unorthodox religious movement, acknowledging Krishna to be its prophet, that gave rise to the most desperate fight in the ancient ages in India. The very fact that Krishna was the charioteer of Arjuna is proof enough that it was of rival creeds; and for that very reason the battle ground of Kurukshetra has ever remained a sacred-spot of pilgrimage—A Vision of India's History pp, ii.

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের আদি রূপ ও পরবর্তী কালের রূপান্তর সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছেন ঐতিহাসিকেরা তাকে স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না— কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজের ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার গুরুত্ব অস্বীকার্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বিরোধীদলের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে সমাবেশ ঘটেছিল তার মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বের নির্দেশ পেয়েছেন। তাঁর মতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৃষ্ণবিরোধী পক্ষে ছিলেন দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বীরেরা এবং ক্ষত্রিয়বিরোধী পরশুরামের শিষ্য ছিলেন দ্রোণ।

৪.

মহাভারতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের প্রতি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। মহাভারত মহাকাব্য সংকলনের পিছনে এক সামাজিক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। আমরা জানি মহাভারতের আদি নাম ছিল 'জয়' তাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'ইতিহাস' এবং 'জয়' নামযুক্ত এই 'ইতিহাস' যুদ্ধজয়েচ্ছু সকল ব্যক্তির শ্রোতব্য—এ কথা ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন। 'ততো জয়মুদীরয়েৎ' বাক্যাংশটি নমস্ক্রিয়ায় আমরা পেয়েছি কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সর্বত্র—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

শ্লোকটি পাওয়া যায় না। এই শ্লোকটি বৈষ্ণব-প্রাধান্যকালে সংযোজিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। (এইজন্য মহাভারতের প্রামাণিক পুনো-সংস্করণে ঐ শ্লোকটি সন্নিবেশিত হয় নি।)

রবীন্দ্রনাথ মহাভারত রচনার পিছনে দেখেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রবল সামাজিক উপপ্লব এবং ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বাঁধবার প্রচেষ্টা। তাঁর মতে বুদ্ধদেব ও মহাবীর এই দুই বেদবিরোধী ক্ষত্রিয় নেতা "মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।" কিন্তু বৌদ্ধ জৈন ধর্মের বন্যাকে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-সংগঠনের দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি, কেননা তাঁর মতে—

> এতদিন ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল—মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল।

কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরে গেল তখন দেখা গেল সমাজের সংযমও ভেঙে গেছে। শক হূন প্রভৃতিরা বন্যার জলের মতো সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করে অদ্ভুত উচ্ছৃংখলতার সৃষ্টি করেছে। তখন—"সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাক প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল।"

এই শক্তিপ্রয়োগের প্রকৃষ্ট ফল মহাভারত। "সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।...তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে, পুরাতন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত।...সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ-সংগ্রহ করিলেন"। বেদ সংগ্রহ ও আর্যসমাজের জনশ্রুতি-সংগ্রহ উভয় কার্যই ব্যাসের দ্বারা আরব্ধ ও সমাপ্ত হয়েছিল বলে ঘোষিত হয়েছে। উভয় সংগ্রহের লক্ষ্য এক। শিথিলগ্রন্থি সমাজকে একটি বিরাট পরিধির মধ্যে অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে ধারণই মহাভারতের মূলে।

'পরাশর-সত্যবতী'র পুত্র দেহের কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপে জন্ম হেতু কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেদ সংকলন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বেদব্যাস। 'ব্যাস' শব্দের এখানে অর্থ সংকলয়িতা। মহাভারত তিনিই সংকলন করেন। 'সপ্ত চিরজীবী'র' অন্যতম হলেন ব্যাস। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আর্যসমাজের যতকিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতিকে নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্র নীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাটমূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।—(ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)।

অন্যত্র তিনি এই বক্তব্যকেই অনবদ্যরূপে ব্যাখ্যা করেছেন—

> এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কালে দেশে যে বিদ্যা, যে মনন ধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমনকি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই অশিক্ষায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে সংগ্রহ করতে তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল।...মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বলরূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানসরূপ।[৩]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু মহাভারত রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধুমাত্র 'একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত' রূপেই বরণীয় নয়। তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের বা নবীনচন্দ্রের মতো ভগবদ্‌গীতাকে মহাভারতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। তিনিও ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মগত সত্যকে গীতার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন—

> 'এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস কাঁচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমন এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়-যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব।...মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা॥...

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বিশেষ ভাবে মনে পড়ে—

> এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে, ভগবদ্‌গীতা।...উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই।

৫.

গীতার একটি শ্লোকাংশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মনীতির ক্ষেত্রে উচ্চস্থান দিয়েছেন। এখানে পরিষ্কাররূপে জানা দরকার যে তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ 'মানবধর্ম' সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণায় আসতে পেরেছিলেন। 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) যখন 'রাজর্ষি' প্রকাশিত হয় তখন 'বিল্বন' চরিত্রে সকল লোকাচার ও প্রথার ঊর্ধ্বে বলিষ্ঠ মানবধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্য এলেন রাজধর্মের প্রতিনিধি-রূপে। সেই মানবধর্মের পরিপোষক বা অনুমোদক শ্লোক রবীন্দ্রনাথ যে-শাস্ত্র থেকে যখন পেয়েছেন তাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা সকলেই জানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষত 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' অংশের যে-ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা তার চেয়ে অনেক ব্যাপক ও মহৎ। তেমনি ভাবে 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং' শ্লোকটির ব্যাখ্যায় মহর্ষির ও রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার পার্থক্য স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনেক বলিষ্ঠ।[৪]

রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের অধিকার' (১৩১৮), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪) 'শক্তি-পূজা' (১৩২৬) ও 'সত্যের আহ্বান' (১৩২৮) প্রবন্ধগুলিতে উক্ত শ্লোকাংশ—

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—প্রয়োগ করেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাংখ্যযোগ' অংশে শ্লোকটি আছে—

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২॥৪০॥

এর পূর্ব শ্লোকে জ্ঞানযোগের উপসংহার করে তার সাধনকর্ম যোগ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হে পার্থ তুমি শ্রবণ কর যে বুদ্ধিতে যুক্ত হলে তুমি কর্মরূপ বন্ধন ত্যাগ করতে পারবে। এবং সেই সূত্রে বলেছেন, এই নিষ্কাম কর্মযোগ আরম্ভ করলে বিফল হয় না। এতে বিঘ্ন হয় না। এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য'কে গ্রহণ করেছেন তখন সে ধর্ম সত্যধর্ম। তার সঙ্গে কর্মযোগের 'সংস্কার' নেই। 'ধর্মের অধিকার' (১৩১৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গীতার এই শ্লোকটিকে প্রথম ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম চিরদিনই 'সত্যধর্ম', সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের ধর্ম। তিনি লিখেছেন—

> বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না।—ধর্মের অর্থ
>
> ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই।—ধর্মের অধিকার।

গীতার ঐ শ্লোকাংশটির মূল অর্থ হয়তো কিয়দংশে হারিয়ে গেল কিন্তু মানবসত্যের পূর্ণ অর্থে জ্বলে উঠল। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' 'শক্তিপূজা' ও 'সত্যের আহ্বান' তিনটি প্রবন্ধই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক স্বার্থে 'ধর্ম' বিসর্জন এমন-কি দেশপ্রেমের দিক থেকে 'প্রয়োজন' হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে 'অধর্ম' বলেই জেনেছেন। এবং অধর্ম যে ব্যক্তি বা জাতির মনুষ্যত্বকে তুলতে পারে না, নামাতেই শুধু পারে এ প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বদ্বিধামুক্ত। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' (১৩২৫) নামক ভূমিকা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শিবাজী 'ধর্ম'কে আশ্রয় করেছিলেন বলেই একদা মারাঠা জাতি বড়ো হতে পেরেছিল কিন্তু ধর্মসাধনার স্থলে রাষ্ট্রিক স্বার্থ-সাধনা যেই বড়ো হয়ে উঠল তখনই মারাঠা জাতির পতন ঘটল। ঠিক এ জন্যই তিনি মনুসংহিতার ধর্মনীতি-জ্ঞাপক শ্লোকটি বার বার উচ্চারণ করেছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে পাই—

অধার্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে ॥১৭০॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন সীদন্নপি ধর্মেণ মনোঽধর্মে নিবেশয়েৎ ।
অধার্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্বিপর্যয়ম্ ॥১৭১॥
নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব ।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥১৭২॥
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎপুত্রেষু নপ্তৃষু ।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ ॥১৭৩॥
অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি ।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥১৭৪॥

"অধর্মেণৈধতে তাবৎ" শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ বোধ করি 'বিরোধমূলক আদর্শ' (১৩০৮) নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে এ-যুগ এক দিকে য়ুরোপীয় বণিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার যুগ এবং এ-সময়ই কবি লেখেন—'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল' 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' প্রভৃতি কবিতা। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদ বা উগ্র দেশপ্রেম কখনও সমর্থন করেননি কেননা এরা শেষ পর্যন্ত 'অধর্ম' পালক। সেজন্য তিনি লিখেছেন—

> আমরা যদি বাঁধি বোলে না ভুলি, যদি "প্যাট্রিয়টকেই" সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে।...সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি, অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?

এবং এই পশ্চিমী নেশনতন্ত্রের উপরে 'সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য' এই ধর্মবাণীকে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছেন। স্বদেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির উভয় ক্ষেত্রেই তিনি যেন এই শ্লোকটিকে ধ্রুবতারকার মতো বহন করেছেন এবং সে জন্যই দেখা যায় তিনি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪) 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪) 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৩৪৮) প্রবন্ধগুলিতে 'ন্যাশনাল' বা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের বা স্বার্থের উর্ধ্বে নিত্য ধর্মবাণীকে তুলে ধরে শক্তিলোলুপ অধর্মাচারী পন্থার আশু অবসানের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। শুধু রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নয় আমাদের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও এই শ্লোকটির মহিমা তিনি ঘোষণা করেছেন 'ধর্মের সরল আদর্শ' (১৯০২), 'প্রার্থনা' (১৯০৮) 'দুঃখ' (১৯০৮) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে। আর একটি শ্লোকাংশ 'ধর্ম এব হতো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ' রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এ শ্লোকটি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে পাই—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ ॥ ৮।১৫॥

ধর্মের এই আদর্শ পূর্বালোচিত শ্লোক দুটির সমার্থক। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের আখ্যান-অবলম্বনে যে-কাব্যনাট্যগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে 'নরকবাস' (১৮৯৭) 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৮) 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৮৯৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনুসংহিতার বা মানবধর্মশাস্ত্রের এই বক্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কাহিনীগুলিতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'নরকবাস' রচনাটির মধ্যে সোমক-ঋত্বিক সংবাদে রবীন্দ্রনাথ মহাভারত থেকে কিছু-দূরে সরে গেছেন। মহাভারতের কাহিনী হল, শতভার্যার স্বামী রাজা সোমক বৃদ্ধ বয়সে 'জন্তু' নামে এক পুত্রলাভ করেন। শতমাতা সেবিত সেই পুত্র একদিন পিপীলিকাদংশনে ক্রন্দন করলে মাতৃগণের সম্মিলিত রোদনে রাজা রাজকার্য ফেলে অন্তঃপুরে গেলেন। পুত্রকে শান্ত করে ফিরে এসে ঋত্বিককে বললেন, একমাত্র পুত্র বড়োই উদ্বেগের বিষয়, এমন কর্ম করা কি সম্ভব যার ফলে শতপুত্র লাভ করতে পারি? ঋত্বিক বললেন, যদি আপনি পুত্র 'জন্তু' দ্বারা অগ্নিতে হোম করতে পারেন তা হলে তার ধূম আঘ্রাণ করে মাতৃগণ পুত্রবতী হবেন, 'জন্তু'-ও পুনর্জাত হবে, তার বামপার্শ্বে একটি স্বর্ণচিহ্ন থাকবে। 'জন্তু'কে আনয়নকালে দয়ার্দ্রচিত্ত মাতৃগণ তাকে আকর্ষণ করতে লাগলেন কিন্তু ঋত্বিক বামহস্ত ধারণ করে তাকে টেনে নিলেন এবং 'জন্তু' দ্বারা হোম করলেন। তার গন্ধ আঘ্রাণ করে জননীরা শোকার্ত হয়ে ভূপতিত হলেও তাঁরা গর্ভবতী হলেন। 'জন্তু'সহ শতপুত্রের জন্ম হল। রাজা মৃত্যুর পর স্বর্গ-যাত্রাকালে পথে নরকে ঋত্বিককে দেখে ধর্মরাজকে বললেন, কর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা সমান পাপী—অতএব পুণ্য ও পাপের ফল আমাদের সমান হোক—

নরকে বা ধর্মরাজ! কর্মণাঽস্য সমোহ্যহম্।
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব! সমমস্ত্বাবয়োরিদম্ ॥ বনপর্ব ॥ ১০৫ অধ্যায় ॥

কাজেই দেখা যাচ্ছে মহাভারতের এই কাহিনীতে ঋত্বিকের কর্মের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক লঘু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'নরকবাস'-এ ঋত্বিক প্রদর্শিত হয়েছে ধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণরূপে, যে মানবধর্মকে লংঘন করেছে। মহাভারতের কাহিনীতে ঋত্বিকের 'উঠিল জ্বলিয়া ব্রাহ্মণের অভিমান' প্রসঙ্গ নেই। এবং সোমকের 'নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায় অনলে করেছি ভস্ম' অনুতাপও মূল কাহিনীতে অশ্রুত। রবীন্দ্রনাথ সোমক চরিত্রেও পিতৃধর্ম লঙ্ঘন দেখেছেন।

'গান্ধারীর আবেদন' রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাকে মহত্তর রূপে প্রকাশ করেছে।

৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাভারতে সভাপর্বে মাতা গান্ধারী 'কুলপাংসন' দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের উপর জোর দিয়েছেন, বলেছেন—

তথা তে ন কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্মহামতে।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ ।। ৭২।।৯

অর্থাৎ পুত্রস্নেহবশতঃ দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি, এখন তার ফলে বংশনাশ উপস্থিত হয়েছে। অতএব তাকে ত্যাগ করুন।

উদ্যোগপর্বেও গান্ধারী দুর্যোধনকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে মূর্খ দুরাত্মা দুঃসহায় দুর্যোধনের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করবার জন্য পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করেছেন। পরে দুর্যোধনকে ডেকে বলেছেন, যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় না। তুমি তেরো বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা ও ক্রোধের জন্য তা বর্ধিত হয়েছে, এখন তার উপশম করো। তুমি অরাতি-নিপাতন পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলে পরমসুখে পৃথিবী ভোগ করবে। বলাবাহুল্য দুর্যোধন মাতৃবচনে কর্ণপাত করেন নি।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী সংবাদে রবীন্দ্রনাথ যখন গান্ধারী বচনে ব্যক্ত করেন—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ;
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

তখন তাঁর চিত্তোৎসারিত বিশিষ্ট ধর্মবাণী ধ্বনিত হতে দেখি—যে ধর্ম-প্রত্যয় মনু-গীতা-মহাভারতের ঋষিবাক্য অধ্যয়নে মহত্তর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তীসংবাদে মূল মহাভারতকাহিনী অনেকাংশে গৌণ হয়ে কর্ণের বীরধর্ম ও কুন্তীর মাতৃহৃদয়বেদনা বড়ো হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনীতে কুন্তী কর্ণের কাছে অর্জুন ভিন্ন অপর চার পুত্রকে তিনি সংহারের চেষ্টা করবেন না এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু কর্ণ-চরিত্রের ট্রাজিডি বা কুন্তী-হৃদয়ের বেদনাকে অনবদ্যরূপে উপস্থিত করেছেন তাই নয়—মানবধর্ম, বীরধর্মের আদর্শ কর্ণ-চরিত্রে প্রস্ফুটিত করে মহাভারত-বর্ণিত আখ্যানকেই গৌরবান্বিত করেছেন—

শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬.

১৩০০ সালের ১৩ই শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার' কবিতাটি রচনা করেন। কবি-নায়ক রাজসভায় কাব্যপাঠের সূচনায় বাণীবন্দনার পর রামায়ণ-মহাভারতকে স্মরণ করেছেন। মহাভারত-বর্ণনা সূত্রে তিনি কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম, কুরুক্ষেত্রের রক্তাক্ত অধ্যায়, স্বজনহীন, বান্ধবহীন পাণ্ডবগণের সিংহাসন লাভ ও মহাপ্রস্থান কাহিনী বর্ণনার পর মহাভারতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করেছেন—

তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সকল আশার বিষাদ মহান্,
উদার শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে ॥

এই কবিতা রচনার আট বৎসর পরে 'নৈবেদ্য' কাব্যের প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধটিতে ঐ 'উদার শান্তি' বক্তব্যকে আরও গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। রচনাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের চিরন্তন জীবন-সাধনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি মহাভারত-কাব্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

> মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগ-দ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।

'গান্ধারীর আবেদন'-এ গান্ধারীর উক্তিতে মহাভারতের অন্তর্লোকের এই মহান্ গম্ভীর করুণ ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ অ-পূর্ব ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছেন—

তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি ; নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নিবৃত্তি—
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডন কুইকসোট, রবিনসন্ ক্রুশো ও রবীন্দ্রনাথ

যে কয়খানি বই সর্বদেশে সর্বকালে সর্বশ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোহরণ করেছে 'ডন কুইকসোট' বইটি তাদের অন্যতম। একথা যথার্থই সত্য—"children handle it, youngsters read it, grown men understand it and old people applaud it". আমরা যাদের ক্লাসিক বা 'চিরায়ত' সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করে থাকি ডন কুইকসোট তাদেরই সগোত্র। সারভ্যানটিস্ (১৫৪৭-১৬১৬) দুঃখকষ্ট-নির্যাতন সবই ভোগ করেছেন বার-বার। শেষে ১৬০৩ সালে তিনি হাত দিলেন এমন একটি রচনায় যা তাঁকে মৃত্যুর পর চিরজীবী করে রেখেছে—Don Quixote de la Mancha. ১৬০৫ সালে এর প্রথম খণ্ড বার হয়। দ্বিতীয় খণ্ড বার হয় তাঁর পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার মাত্র একবছর আগে ১৬১৫ সালে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের য়ুরোপীয় সমাজে নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণী (class) ও শক্তি দেখা দিয়েছিল। ফিউডাল-সমাজ তার দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হতে বাধ্য। ফিউডাল যুগের সঙ্গে যে ধরনের শিভলরি-পুষ্ট রোমান্স কাহিনী যুক্ত থাকে 'ডন কুইকসোট' তার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের কুঠার হেনেছে। সারভ্যানটিস্ পরিবার 'বুর্জোয়া'-শ্রেণীভুক্ত, তাই বোধ করি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হয়েছিল মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো ও তদ্সংলগ্ন প্রচলিত 'আদর্শ'গুলিকে ব্যঙ্গের আঘাত হানা। তিনি তাঁর বইটির প্রথমে 'লেখকের নিবেদন' অংশে লিখেছেন—

> For your subject being a Satire on Knight-errantry is so absolutely new, that neither Aristotle, St. Basil nor Cicero ever dreamt or heard of it. Those fabulous extravagances have nothing to do with the impartial punctuality of true history ;···Nothing but pure nature is your business ;···And since the writing of yours aim at no more than to destroy the authority and acceptance the books of Chivalry have had in the world···keeping your eye still fixed on the principal end of your project, the fall and destruction of that

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

monstrous heap of ill-contrived romances, which though abhorred by many so strangely infatuated the greater part of mankind.

এদিক থেকে সারভ্যানটিস্ সফলকাম হয়েছিলেন। বুর্জোয়া শক্তির আবির্ভাবের বিরুদ্ধে ফিউডাল সমাজের নিষ্ফল প্রয়াস এই উপন্যাসে রূপকার্থ লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে ডন কুইকসোটের সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য ঠিক কে করেন বলা কঠিন। যতদূর জানি তাতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম এই বইটি সম্পর্কে বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ডন কুইকসোট সম্পর্কে অন্ততঃ দুটি মন্তব্য করেছেন দেখতে পাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০-৯১) 'বহু বিবাহ' সম্পর্কিত 'দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩) প্রকাশ করলে বঙ্কিমচন্দ্র তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। সেখানে তিনি লেখেন—

> এমত অবস্থায় বহু-বিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন কুইকসোটকে মনে পড়িবে।

মনে পড়বে দৈত্য ভেবে ডন কুইকসোটের উইণ্ড মিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। ইঙ্গিতটি খুবই সুন্দর।

আরেকটি উল্লেখ পাচ্ছি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্র ল্যাসাজ (Le Sage ১৬৬৮-১৭৪৭) লিখিত 'জিল ব্লা' (Gil Blas de Santi llane) পড়েছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ সেখানে মিলছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কিনা ইচ্ছা ছিল বাজে নবেল না লিখিয়া ডন কুইকসোট বা জিল ব্লার পরিশিষ্ট লিখিব।[১]

'জিল ব্লা'-র উল্লেখের একটি কারণ বোধ করি Gil Blas de Santi llane উপন্যাসটিও ডন কুইকসোটের আদর্শে গড়া, রঙ্গে-ব্যঙ্গে আঠারোর শতকের ফরাসি জীবনের বাস্তব রূপ এর মধ্যে ফুটেছে। ল্যাসাজ এসেছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এবং বাস করতেন পারীতে। পূর্বোক্ত উপন্যাস দুটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগের পরিচয় মন্তব্য দুটিতে মেলে।

তারপর আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২), তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন—

> য়ুরোপীয় Chivalry ব্যবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে সার্ভান্‌টিস নামক স্পেনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের Don Quixote গ্রন্থ পাঠে। সত্য বটে সার্ভান্‌টিস ঐ গ্রন্থে উক্ত ব্যবস্থার হাস্যাস্পদ মূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন। তখন Chivalry-র শেষ দশা।[২]

কৃষ্ণকমলের পর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ডন কুইকসোট বইটির মুগ্ধ পাঠক ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি জীবনের শেষের দিকে এসে একটি কবিতায় লিখেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোমার যে পঞ্চু সে তো বাংলার ডন কুইক্সোট
তার যে মৌতাত
সে যে জন্ম খ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল। —খ্যাতি, পুনশ্চ

আর 'সাঙ্কো পাঞ্জা' সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বইটিতে লিখেছেন—

> সাঙ্কো পাঞ্জা ডন কুইকসোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্য-পুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার লক্ষ চাকরের সাধারণ শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে? ডন কুইকসোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ।[৩]

বাস্তবধর্মিতা ও 'ব্যক্তি'চরিত্র সৃষ্টি উপন্যাসের যে দুটি প্রধান লক্ষণ—সারভ্যানটিস্ তার অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে সেটি ধরা পড়েছে। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম সমালোচনী দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন ঐ চরিত্রের 'একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ'—তার অনন্য স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথ বোধ করি প্রথমবার যখন বিলেত যান (১৮৭৮-৮০) অথবা ফিরে আসার অব্যবহিত পরে ইংরেজিতে অনূদিত ডন কুইকসোট পড়েন। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী লিখেছেন—'Cervantes-এর Don Quixote…এর কি সুন্দর রাজসংস্করণ বাবা আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন'। তখন ইন্দিরা দেবীর বয়স সাত। সম্ভবত এই বইটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন।[৪]

রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী। তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র যে হাসি ফুটিয়ে গেছেন সে প্রসঙ্গে তিনি সারভ্যানটিসের উল্লেখ করেছেন—

> যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় সেক্সপীয়ার বলে গণ্য সেই Cervantes সেরভান্তেসের জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর সাহিত্যে সাহিত্য-জগৎ চির আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন, বীরের হাসি। এ জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই।

কথাটি পুরোপুরি সত্য। সারভ্যানটিসের প্রতি হৃদয়ের যথার্থ শ্রদ্ধা বহন না করলে প্রমথ চৌধুরীর কলমে এ ভাষা ফুটত না। কাজেই দেখতে পাচ্ছি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি কাল-পর্বে ডন কুইকসোট পঠিত ও আদৃত হয়েছে। সে আদর আজও কমে নি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'ডন কুইকসোট'-এর তুলনায় 'রবিনসন ক্রুশো' 'জন্ম রোমাণ্টিক' রবীন্দ্রনাথের মনে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় বলেন—

> When I was young I had the great fortune of coming upon a Bengali translation of Robinson Crusoe. I still believe it is the best book for boys that has ever been written. There was a longing in me when young to run away from my ownself and be one with everything in Nature.[৫]

ইঁট-কাঠ-পাথরের অট্টালিকার বাইরে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসনের বাইরে, প্রচলিত কাঠামোর ক্লাশরুমের বাইরে চলে যাবার, বেরিয়ে পড়বার ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে একাত্ম হয়ে যাবার যে প্রবণতা রবীন্দ্রনাথ বালক বেলায় অনুভব করেছিলেন, রবিনসন ক্রুশো বইটিতে তার অনেকটা মিল খুঁজে পেয়েছিলেন, সবটা নয়, কেন না রবীন্দ্রনাথের মতে এই যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলে-মিশে থাকবার বাসনা এটি বিশেষত ভারতবর্ষীয়, সুপ্রাচীন কাল থেকে চেতনা-প্রসারণের এই আকাঙ্ক্ষা চলে আসছে।

অন্যদিকে—পাশ্চাত্ত্যে

> In Robinson Crusoe, the delight of the union with Nature finds its expression in a story of adventure in which the solitary Man is face to face with solitary Nature, coaxing her, co-operating with her, exploring her secrets, using all his faculties to win her help. This is the heroic love-adventure of the West, the active wooing of the earth.[৬]

অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যে একাকী মানুষ একাকিনী প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয়ের দুর্জয় সংগ্রামে মেতেছে, তাকে জয় করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে তার বরমাল্য, উদ্‌ঘাটিত করেছে তার গোপন রহস্য। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের ধরনটা ভারতবর্ষীয় রীতি থেকে আলাদা।

> Robinson Crusoe's island comes to my mind when I think of some institution where the first great lesson in the perfect union of Man and Nature, not only through love but through active communication and intelligent ways can be had unobstructed.[৭]

এখানে রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মিলনের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, মেরী ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মার্থা উভয় রীতিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের পড়া-শোনা সম্পর্কে লিখেছেন—

> কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থসংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিন্সন ক্রুশো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম।[৮]

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের খসড়ায় পাই—

> ছেলেবেলা হইতে বাংলা বই যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছি সমস্তই গিলিয়া পড়িয়াছি। তখন সাহিত্য এমন ফলাও ছিল না। মৎস্যনারীর গল্প, সুশীলার উপাখ্যান, রবিন্সন ক্রুশো আমাদের পড়িবার খোরাক ছিল। রবিন্সন ক্রুশো কতবার পড়িয়াছি বলিতে পারি না। ছেলেদের পড়িবার এমন বই কি আর জগতে আছে? আশ্চর্য এই যে আজকাল ছেলেদের জন্য রং বেরঙের এত শত বই বাহির হইতেছে অথচ রবিন্সন ক্রুশোর তর্জমা বাজারে পাওয়া যায় না। আমার ত' মনে হয় ভাগ্যে এখন আমি বাংলাদেশে শিশু হইয়া জন্মাই নাই। এখন জন্মিলে রামায়ণ মহাভারত পড়া হইত না, রূপকথা বলিবার লোক পাইতাম না, সেই ছবিওয়ালা রবিন্সন ক্রুশো বইখানি পরম রত্নের মত হাতে আসিয়া পৌঁছিত না।[৯]

ছেলেবেলার এই সব পড়াশোনার কথা কবির মনে পড়েছে বোটে করে গোয়ালন্দের পথে যেতে যেতে। সেখান থেকে ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন চিঠি, সে চিঠিতে রয়েছে পদ্মার চিত্র-ধ্বনিময় অবিস্মরণীয় বর্ণনার সঙ্গে কবি-মনের বিচিত্র অনুভূতি—

> হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হলদে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধু ধু করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকা বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে—দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারিনে—বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধবাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্য-শাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধবাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে। এই বালিচরে নৌকা বাঁধা দেখলে সেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস, রবিন্‌সন ক্রুশো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না—সমস্ত পৃথিবীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চেহারা আমার পক্ষে আর-এক রকম হয়ে যেত।[১০]

দুমাস পরে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ব্যক্ত করেছেন বালকবয়সে পড়া 'পৌলভর্জিনি' ও 'রবিনসন ক্রুশো' কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তখনকার তরুণ মনে। কিন্তু সেখানেই তার শেষ হয় নি। কবি লিখেছেন—

> রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্য কিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময় ছবি দেখলে যে মনে হয়, আহা, এইখানে যদি থাকতুম—ঠিক সেই ইচ্ছাটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়। মনে হয়, একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোন কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ ক্রুশো, পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেতো—এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে।[১১]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অনুদিত 'পৌল ভর্জীনী' 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী রকম মুগ্ধ হয়েছিলেন তার বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। রবিনসন ক্রুশো সম্পর্কেও তাঁর মোহ কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা' বইটির উল্লেখ করা চলে। বইটিতে তিনি লিখেছেন—

> সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দুস্কুলে ভর্তি হই, তখন তার নাম ছিল 'হিন্দু কলেজ'। প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—দ্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe। বালকের পক্ষে এমন সুখপাঠ্য পুস্তক আছে কিনা সন্দেহ।[১২]

ডাফোর (১৬৬০-১৭৩১) রবিনসন ক্রুশো[১৩] সুইফ্‌টের (১৬৬৭-১৭৪৫) গালিভার্স ট্রাভেলসের (১৭২৬) আগে ১৭১৯ সালে বার হয়। তখন বাংলা দেশে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্ব চলছে, পলাশীর যুদ্ধ ঘটতে ৩৮ বছর দেরি। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় (১৮২৫) Bengal Hurkaru পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে St. Andrews Library এবং Hurkaru Library মুদ্রিত ও লভ্য সমস্ত ইংরেজি বই আনছে, তাদের মধ্যে ডাফো, সুইফ্‌ট রিচার্ডসন সকলের রচনাই আছে। ১৮৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (Vernacular Literature Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান স্থির করেন নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রথম অনুবাদ করে বার করা হবে।

> রাবিনসন ক্রুশো। বেকন সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য। ইতিহাসের সমকালীন ঘটনা। আবরক্রাম্বি সাহেবের রচিত মনোগুণ। চেম্বর্স ও নাইট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘোষণা করলেন। কিন্তু দোহাই পাড়লেন অসভ্য জাতিকে সভ্য করার মহান ব্রতের—

> She [Germany] becomes our ally and partner in the execution of the great purposes of Providence for the advancement of mankind।

রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের ঘোষণাকে 'দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী' বলে কঠোর বিদ্রূপ করেছেন।

এই সময় থেকে পল ক্রুগারের নেতৃত্বে একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বুয়রদের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। ক্রুগার তাঁর সমর্থন পেয়েছিলেন জার্মানীর দ্বিতীয় কাইজার উইলহেলম ও বিসমার্কের কাছ থেকে। অনুরূপ ভাবে ইংরেজরাও 'জাতিপ্রেমে'র দোহাই দিয়ে পরবর্তী কালের হিটলারী ধরনে পাল্‌টা আন্দোলন চালাতে থাকে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন সেসিল রোডস্‌ (১৮৫৩-১৯০২) নামে অক্‌সফোর্ডে শিক্ষিত একজন ধনী। তিনি আফ্রিকায় সোনা-হীরার ব্যাবসা করে কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। তাঁর নামেই 'রোডেসিয়া'র (Rhodesia) নামকরণ। এই সময়ে ট্রানস্‌ভালের সোনা-হীরার খনিতে কাজ করতে পাঠানো হল মুখ্যত ইঙ্গ-আমেরিকান খনকদের। তাদের বলা হত উইটল্যান্ডার ('Uitlanders')। অনিবার্য কারণে বুয়রদের সঙ্গে বহিরাগত বিদেশী শ্রমিক-খনকদের গোলমাল বাধল। তারই পরিণতি জাতি-সংঘর্ষ বা racial conflict। সেসিল রোডস্‌ তখন কেপ কলোনীর প্রধান-মন্ত্রী।[১] ১৮৯৫ সালে তিনি ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলেন কী কৌশলে ট্রানস্‌-ভাল সরকারের পতন ঘটিয়ে তার অধিকারভুক্ত রত্নখনি করায়ত্ত করা যায়। বুয়র ও বহিরাগত বিদেশী খনকদের সংঘাতকে একটি অজুহাতরূপে তৈরি করা হল। বুয়রদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালনা করলেন ডা. জেম্‌সন। কিন্তু পল ক্রুগার সেই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৯৬ সালে বুয়রদের এই জয়লাভে জার্মান সম্রাট ক্রুগারকে অভিনন্দনসূচক তার পাঠান। অবশ্য ইংরেজকে হটিয়ে জার্মানীর স্বার্থ কায়েম করাই তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এই অভিনন্দন পাঠানোর ফলে বৃটেন জার্মানীর উপর চটে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার আফ্রিকায় যে দলে-দলে আবিষ্কারকেরা (লিভিংস্টোন, স্টান্‌লি, প্রভৃতি) বা মিশনরিরা যাত্রা করেছিল তার পিছনে শুধু ভৌগোলিক জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল না, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের স্বর্ণতৃষ্ণাও ছিল। London Missionary Society মিশনরিদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে, যেমন পাঠানো হয়েছিল চীনদেশে।

তাই অনুন্নত দেশের ধনসম্পদ অপহরণের দুর্বার রিপু একদিন 'বুয়র যুদ্ধ' ডেকে নিয়ে এল। ১৮৯৯ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৮৯৩ সালে গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। তখন দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনে ভারতীয়দের কোনো সম্মানজনক স্থান ছিল না কোনো ক্ষেত্রে। গান্ধীজি যখন আবদুল্লা শেঠের মামলা নিয়ে ডারবান শহরের আদালতে যান তখন তাঁকে মাথা থেকে পাগড়ি খুলতে বলা হয়েছিল। তিনি সে নির্দেশ মানেন নি। ঐ সময়ে ভারতীয়দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল "semi-barbarous Asiatics or persons belonging to the uncivilized races of Asia." ট্রানস্‌ভাল বা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটেও অর্থাৎ বুয়র-শাসিত অঞ্চলেও ভারতীয়দের অমর্যাদাকর ব্যবহার পেতে হত। গান্ধীজি তারও ভুক্তভোগী।

বুয়র যুদ্ধ যখন বাধল, তখন বৃটিশ সেনা প্রথমে মার খেল খুব বেশি। বুয়রদের হাতে যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন সেকালের 'সাংবাদিক' ও পরবর্তী কালের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্‌টন চার্চিল। গান্ধীজি বুয়রদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে এই যুদ্ধে সাহায্য করা তাঁর 'duty' বা কর্তব্য কর্ম বলে মনে করেছিলেন। যদিও তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "It must be largely conceded that justice is on the side of the Boers." তাঁর জীবনীকার টেন্‌ডুলকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> His loyalty to the empire drove him to side with the British in the teeth of opposition from some of his countrymen. Gandhiji felt that if he demanded rights as a British citizen, it was also his duty, as such, to participate in the defence of the empire.

এই কর্তব্যপালনের জন্য তিনি প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠন করেন। এই সূত্রে তিনি ঘোষণা করেন—

> We do not know how to handle arms. The motive underlying this humble offer is to endeavour to prove that in common with other subjects of the Queen Empress in South Africa, the Indians too are ready to do duty for their sovereign on battlefield.

এই সূত্রে মনে রাখতে হবে বৃটিশ সরকার প্রথমে গান্ধীজির এই প্রস্তাবকে ভালো চোখে দেখেন নি। ১৮৯৯ সালের শেষের দিকে গান্ধীজির সাহায্যদান প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন।

বার্নার্ড শ যিনি ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিক দলভুক্ত ছিলেন, তিনিও সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের জয়গান করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার রত্নখনিগুলির বিশ্বের সর্বজাতিক মালিকানার কথা বলেও মন্তব্য করলেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The British Empire is the only available substitute for a world federation.

গান্ধীজি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষে সেবাকার্য করেন। সেজন্য বৃটিশ সেনাপতি বুলার (Buller) তাঁর কার্যের প্রশংসা করে তাঁকে একটি পদক উপহার দেন। 'বয়েজ স্কাউট' আন্দোলনের স্রষ্টা বেডেন পাওয়েলও বুয়র যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। জেনারেল বুলার বুয়রদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত, তিনি সৈনাপত্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২] তখন কিচেনার সৈন্যাধ্যক্ষ হন। ১৯০২ সালের ৩১শে মে বুয়ররা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই যুদ্ধে বুয়রেরা যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখায় তার সঙ্গে আমাদের দেশের রাজপুতদের তুলনা করা চলে। গান্ধীজির জীবনী-কার লিখেছেন—

> The brave Boer women took part even in fighting and when they could not do that they encouraged their husbands and sons to fight and to die.[৩]

এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে ৫৭৭৪ নিহত ও ২২৮২৯ আহত হয়। বুয়র পক্ষে নিহতের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। বুয়র যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকায় ১৯০০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে আমেরিকায় বুয়র সমর্থক আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছিল, "A message from New York states that Mr. Alger, late Secretary of War, strenuously denounces the Pro-Boer agitation in the United States."

ফ্রান্সের খবরে জানা যায় বুয়রদের সমর্থনে ফরাসি যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে দক্ষিণ-আফ্রিকার যাত্রার সংকল্প করেছিল, "It is the intention of French Volunteers to go to the assistance of the Boers disembarking at Lourenco Marques..."[৪] বুয়রদের সাহায্য দেবার জন্য অগ্রসর জর্মান স্টিমারকে সার্চ করে বৃটিশরা আটক রাখে।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজা-মহারাজারা অর্থ-অশ্ব-সৈন্য দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। ভারতীয় জাতীয় কনগ্রেস বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্নৌ শহরে অনুষ্ঠিত কনগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতে দুর্ভিক্ষ-এর বিশেষ করে ভারতবর্ষে দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের দুঃখকষ্টের কথা আলোচনা করেন। এই সময়ে ১৯০০ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে, কলকাতা টাউন হলে বুয়র যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্যদানের জন্য কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা হয়। ঐ সভায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমীর হোসেন, রেভারেন্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন, জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাচরণ পাল, সীতারাম রায়, হরিরাম গোয়েঙ্কা, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বলেন—

> The war would never heve occured if President Kruger and his followers had continued to acknowledge the Queen's sovereignty in Pretoria and other Places.

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রস্তাব করেন—

> That prayers be offered in places of worship for the victory of British arms and the speedy termination of the war.

এই প্রস্তাব সমর্থন করেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভায় ৬৫,৩০১ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল বুয়র যুদ্ধ তহবিলে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দিয়েছিলেন ৫০০০ টাকা। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও ৫০০০ টাকা দান করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বুয়র যুদ্ধকে কি চোখে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আফ্রিকায় এবং এশিয়ায়, বিশেষত চীনদেশে, বৃটিশ ও অন্যান্য বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন পাশ্চাত্য শক্তিগুলির অন্যায় আক্রমণে কবি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৩০৯ (১৯০২) সালে ১লা বৈশাখ বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি 'নববর্ষ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তখন বুয়র যুদ্ধ শেষ হবার মুখে। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

> কোথা হইতে বণিকের কামান প্রাচীন চীনের কণ্ঠে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে আর আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

সভ্যতাবিস্তারের তথাকথিত মহান দাবিকে কবি এইভাবে ধূলিসাৎ করেন। বুয়র যুদ্ধের উৎসাহদাতা, উগ্র বৃটিশ জাতিপ্রেমের অন্যতম উদ্গাতা সেসিল রোড্স সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে তাঁর 'ইম্পীরিয়লিজম্' প্রবন্ধে (১৩১২)। তিনি লিখেছেন—

> বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন।…
> যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।...সেসিল রোড্স্ একজন ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন, সেইজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা সকলেই জানেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে (১৩১৫) বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে 'অগ্নিযুগ' শুরু হয়েছিল এবং তাকে দমন করবার জন্য বৃটিশ শক্তি যে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেছিল তাকে ধিক্কার দিতে গিয়ে বুয়রদের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন—

> অল্পদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্ম-বুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া, নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধ-ব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 'মার্শাল ল' শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা।

এ ছাড়া 'সমাজভেদ' নামক ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত মৌলিক পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে 'য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র' এবং 'প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম'। চীনে শক্তিমদমত্ত বৃটিশ তথা ইউরোপীয় শক্তিগুলির অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি পুনরায় বুয়রদের উল্লেখ করেছেন—

> সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে,...ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব উল্লিখিত গদ্য প্রবন্ধগুলিতে কবি বুয়রদের সম্বন্ধে যে রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন অনুরূপভাবে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যের (১৩০৮) কয়েকটি কবিতায় পাশ্চাত্ত্য পররাজ্যগ্রাসী শক্তিগুলির অন্তর্নিহিত স্বরূপ বলিষ্ঠ ভাষায় উদ্ঘাটিত করেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল ; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম…
লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়। [৬৪]

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী. গুপ্ত পর্বতের পানে। [৬৫]

চিতার আগুন
পশ্চিমসমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা। [৬৬]

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার। [৯২]

বুয়র যুদ্ধ শুরু হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'বিরোধমূলক আদর্শ' (১৩০৯) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৫] ঐ প্রবন্ধে তিনি 'ন্যাশনাল ধর্মনীতি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজ্মের প্রধান অবলম্বন।

এই সূত্র ধরে তিনি বুয়রদেরও সমালোচনা করেছেন—

> ন্যাশনাল ধর্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোয়ার জাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্য ? তাহাদের হৃদয়ে ন্যাশনাল ধর্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই ?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে জওহরলাল নেহেরু বুয়র যুদ্ধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তার মিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, গান্ধীজির সঙ্গে নয়। নেহেরু লিখেছেন—

> Meanwhile at the end of the century England had a little war of her own in South Africa. The discovery of gold in the Boer Republic of the Transvaal led to this war in 1899. The Boers fought with amazing courage and perseverance for three years against the leading power of Europe. They were crushed and, had to acknowledge defeat.[৬]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'ছবির ঘর' বা জীবনস্মৃতি

আমার যে জীবনস্মৃতি লিখছি আমার বিশ্বাস সাহিত্য হিসাবে এ জিনিসটা কোনো লেখার চেয়ে ন্যূন হবে না—এর মধ্যে বিচিত্ররসের লীলা থাকবে। যদি টাকার অভাব ঘটে তবে 'প্রথম বয়স' নাম দিয়ে এটাকেও বিক্রি করবার চেষ্টা করব—বোধ করি এটা প্রকাশকরা কেউ কিনে নিলে ঠকবে না।...

আমি ওটা [জীবনস্মৃতি] খুব যত্ন করে লিখছি—কৌতুকাবহ হবেই—তাছাড়া ওর রচনাটাও খারাপ হবে না।

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি
৮ নভেম্বর, ১৯১১

'আপনি নিজে কেন লিখলেন না ?'

'সে হয় না, সে হয় না। যে পর্যন্ত হয়, যে পর্যন্ত ছবিমাত্র সে পর্যন্ত তো লিখেছি। কিন্তু যখন সত্যিকারের জীবন শুরু হলো সে আর লেখা যায় না। লিখতে গেলে আবার সেই experience-এর মধ্যে চিন্তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়—সে বড় বেদনা—'

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবীকে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় যখন 'ভারতী' প্রকাশিত হত সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথের রচনাটি ঐ পত্রিকায় বার হয়। ১৯১৫ সালে রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'উৎসর্গ' অংশে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছি—তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত।

'স্মৃতির মায়াপুরী' কথা দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানের যে পরিবেশের সঙ্গে আমার 'আমি' জড়িত সেই পরিবেশ ও 'সেই-আমি' ইতিহাসের রথচক্রের অনিবার্য বেগে অতীতে রূপান্তরিত হবেই। দীর্ঘদিন পরে একদা জাগ্রত জীবনের বিশেষপর্বটি এবং সেই কাল-জগৎ 'স্মৃতির মায়াপুরী'তে পর্যবসিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়। 'মায়াপুরী' শব্দটির মধ্যে অনেক দূরের এক সৌন্দর্যপুরীর রোমাণ্টিক ব্যঞ্জনা আছে, যার আজ ঠিক প্রত্যক্ষ রূপ নেই, অথচ যে মনোলোভন সৌন্দর্যের আধার। সেই দূরাবস্থিত মায়াপুরীতে প্রবেশের জন্য সকলের মনে কৌতূহল ; প্রবেশে অপার বিস্ময়াবহ আনন্দ, যার কিছুবা কৌতুকরসস্নিগ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন তিনি তাঁর 'ছবির ঘরে' খবর নিতে গিয়েছিলেন, তারপর—

> …দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের[১] স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে ; সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না। এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল।……

'যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা' যেন কোনো উৎসাহী পাঠক না করেন এ ইচ্ছা 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম খসড়াতেও ছিল—

> এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব ইহাকে জীবনের পুরাবৃত্ত বলা চলে না—ইহা স্মৃতির ছবি।

এই 'স্মৃতির ছবি' রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন পঞ্চাশ বছরের গণ্ডি পার হয়ে। প্রৌঢ়বয়সের দরজায় পেঁছে—

> পিছন ফিরিয়া এই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

প্রথম খসড়ায় তিনি লিখেছিলেন—

> সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে—দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।[২]

দ্বিতীয় খসড়ায় পাই—

> নিজেকে নিজের বাহিরে দেখিবার একটা বয়স আছে। সেই বয়সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজের জীবনক্ষেত্র, নিজের কাছে অপরাহ্নের আলোকে ছবির মত দেখা দেয়।

লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ 'দর্শকভাবে' 'নিজেকে নিজের বাহিরে' এই শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। আত্মস্মৃতি রচনার প্রধান কথা সেখানে Subject

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিণত হয় Object-এ, অর্থাৎ বিষয়ী পরিণত হয় বিষয়ে। এই নিরাসক্ত আপরাহ্নিক দৃষ্টি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বিদ্যমান এবং আমরা লক্ষ্য করি সত্যেন্দ্রনাথ যাকে 'স্মৃতির মায়াপুরী' বলেছেন রবীন্দ্রনাথ যেন তারই নাম দিয়েছেন 'ছবির ঘর'। স্মৃতি-মণ্ডিত বা-রঞ্জিত ছবিগুলিকে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন শুধুমাত্র শিল্পবোধের দিক থেকে, অন্য কোনও উদ্দেশ্য সামাজিক বা পারমার্থিক নিয়ে নয়—

> নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।…এই স্মৃতিগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী।

দ্বিতীয় খসড়াতে সেজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> একটা গল্পমাত্রের যেটুকু গুরুত্ব ইহাতে তাহার বেশি গুরুত্ব নাই। আমারই জীবন বলিয়া ইহার গৌরব নহে, কোনো মানবজীবনের ছবি বলিয়া সাহিত্যে ইহার স্থান দাবি করিতে পারে—সে দাবি অসঙ্গত হইলে ডিসমিস হইতে বিলম্ব হইবে না।

একান্তভাবে নিজেরই জীবনের ছবি রূপে না দেখে 'কোন মানবজীবনের ছবি' রূপে দেখবার ও দেখাবার যে নির্মোহ, দূরত্ববাচক শিল্পবোধ, 'জীবন স্মৃতি' তারই অভিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সেজন্যই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন—

> যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না।

১৩১১ (১৯০৪) সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার লেখক' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। ঐ গ্রন্থে প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলিত হয় এবং তার সঙ্গে সমকালের বহু জীবিত লেখকের স্বলিখিত জীবন-কথা স্থান পায়। অধিকাংশ রচনাই জীবনের তথ্যপঞ্জীমাত্র তার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা নেই। রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন[৩] (এবং এই লেখাটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) তবে সে লেখা ব্যক্তিজীবনের সর্বপ্রকার প্রসঙ্গমুক্ত, তাঁর কবিসত্তা (poetic self) তথা 'জীবন দেবতা'র উপলব্ধি সেখানে ব্যাখ্যাত। এই ইনট্যুইটিভ ও সাবজেকটিভ রচনায় শুধু 'কবি' নিজেকেই প্রকাশ করেছেন 'ব্যক্তি' রবীন্দ্রনাথকে নয়—

> আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস পাই ১৩০৮ সালে রচিত 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেখানে রবীন্দ্রনাথের কথা 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'।[৪] তাই রবীন্দ্রনাথ হ্যালাম টেনিসন রচিত তাঁর পিতা কবি টেনিসনের দুখণ্ডে গ্রথিত জীবনী পড়ে লিখেছিলেন—

> ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসঙ্গীতের স্বরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' শেষ হয়েছে 'জীবন দেবতা'র উপলব্ধি-পূর্ব যুগে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েই কবি 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁচিশ। এই কারণে কোনো কোনো সমালোচক 'জীবনস্মৃতিকে' তুলনা করেন জর্মান মহাকবি গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) Poetry and Truth : From my own life (Aus meinem Leben ; Dichtung und Wahrheit)-এর সঙ্গে, কেননা গ্যেটের আত্মজীবনস্মৃতি ১৭৭৫ সালে হ্বাইমার যাত্রা অবধি বিবর্ত, অর্থাৎ গ্যেটেও পঁচিশ বছরের পরের জীবনকে আর প্রকাশ্যযোগ্য মনে করেন নি।[৫]

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায়—

> চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়
> কথায় কথায় বাড়ে কথা
> সংশয়ের উপরে উঠিছে সংশয়
> কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা···

কবিতাটি রয়েছে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা, ভাইঝি ইন্দিরাকে উপহার। পরে কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে সংকলিত হয়। এটির রচনাস্থল বান্দোরা (বোম্বাই)। মহর্ষির আত্মজীবনীর যেটি সম্পূর্ণ পাণ্ডু-লিপি, তার হাতের লেখা বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে বান্দোরায় আছেন, সেই ১৮৮৫ সালে মহর্ষির আত্মজীবনী রচনা সমাপ্ত হয়, যদিচ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে। মহর্ষি বান্দোরা থেকে চুঁচড়োয় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ চলে যান নাসিকে, মেজদাদার কাছে। সেখান থেকে ১৮৮৬ সালে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন—

> আমার পিতা এখন চুঁচড়োয় ফিরে গিয়েছেন—আমি তাঁর কাছে দিন-কতক থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের শান্তি লাভ করেছি—আমরা সমুদ্রতীরে থাকতুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্যের মত বোধ হত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেছেন সেটা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।...[৬]

সেই 'অনির্দেশ্য আশা'ই বুঝি রূপ নিল 'জীবনস্মৃতি'-তে পঁচিশ বছর পরে। তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে অধ্যাত্মব্যাকুলতার উন্মেষ ও পরিণতির ধারাটিকেই (১৮৩৮-৫৮) মুখ্যত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্য-সাধনার দিকটিকে। তিনি লিখেছেন—

> জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোন শ্রী থাকেনা। সেইজন্য আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র, অর্থাৎ তাহা আমার লেখক-জীবনের ধারা।[৭]

কাজেই দুটি বই দুই পথে গেছে। একটি অধ্যাত্ম-লোকে অপরটি সাহিত্য-লোকে। দুটি গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যের চিরসম্পদ। প্রথমটি না হলে দ্বিতীয়টি হতো কিনা বলা কঠিন।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ছাড়া আরো কয়েকখানি আত্মচরিত বা আত্মকথা 'জীবনস্মৃতি'র (১৯১২) পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' (১৮৭৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯১), কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনচরিত' (১৯০৪), ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবনী' (১৯০৬), নবীনচন্দ্র সেনের অতিকায় আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৯০৭), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০৯) প্রভৃতি বইয়ের নাম এই সূত্রে অবশ্যই উল্লেখ করা চলে।[৮] তবে রাসসুন্দরী ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই দুটি যথার্থ শিল্পগুণান্বিত। রাজ-নারায়ণ বসুর বইটি অনেকটা জন স্টুয়ার্ট মিল্ (১৮০৬-৭৩)-এর Autobiography (১৮৭৩) ধরনের অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নিজের চিন্তা ও কর্মের ব্যাখ্যা ও তালিকা প্রদান, সর্বতোভাবে তাদের সমর্থন খোঁজার প্রয়াস। নবীনচন্দ্র সেনের বইটি বেশ খোলা-মেলা, তবে নবীনচন্দ্রের গোড়া থেকেই একটু অহমিকা, একটু megalomania ছিল, তার জন্য শিল্প হিসাবে বইটির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। তবে সমকালের সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে পূর্বোল্লিখিত বইগুলির দাম আছে।

আসলে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ মনোধর্মে, কবি-ব্যক্তিত্বে এঁদের সকলের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থেকে এতো পৃথক, এতো স্বতন্ত্র যে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র স্থানও ভিন্ন জগতে হতে বাধ্য। একথা সত্য যে সব মানুষই স্বয়ং-স্বতন্ত্র, কিন্তু এখানে সে অর্থে নয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিকে যে নিজের গলার মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন তার কারণ তিনি প্রাপ্তযৌবন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ করেছিলেন অলোকসামান্যপ্রতিভা। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্র-জীবনের যে-পর্বটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে 'বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবার' তখনো গড়ে ওঠে নি। 'জীবনস্মৃতি' সেই কর্মসংঘাতমুক্ত জীবনপর্বের শিল্পরূপ, সাবজেকটিভ-অবজেকটিভে নিখুঁত মেশামেশি। এই প্রথম একজন অনন্যকর্মা-কবির সাল-তারিখহীন জীবনের স্মৃতি প্রকাশিত হল। তাঁরই কথা তুলে বলতে হয় 'এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।'

অথচ 'জীবনস্মৃতি' যখন 'প্রবাসী'তে বার হচ্ছে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মন্তব্য করেছিলেন—

> 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনচরিত'। রবীন্দ্রনাথ এবার 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে'র বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাত-আট বৎসর বয়সে সংঘটিত বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়িয়া কবিবরের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'জীবনস্মৃতি' পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৯]

ছয় মাস পরে যখন 'জীবনস্মৃতি' শেষ হবার মুখে তখন সমাজপতি পুনরায় লেখেন—

> কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন। আপনার অতীতকে বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে, সৌন্দর্যসৃষ্টি আছে; কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।[১০]

প্রথম মন্তব্যটি অগ্রাহ্য করা চলে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি বিচারযোগ্য। সমাজপতি 'জীবনস্মৃতি'র যে গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন তার সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষকের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু তিনি যে কটাক্ষ করেছেন—"আপনার অতীতকে বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন" —সে-সম্পর্কে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১১]

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছরে পা দিয়ে 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশ শুরু করলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঁচিশ বছরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই জীবন-পর্বকে ঠিক 'সুদূর অতীত' বলা যায় না। আর যে-সব ব্যক্তি ও ঘটনার কথা লিখেছেন স্মৃতিকে নির্ভর করে তার মধ্যে 'বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতি' কিছুমাত্র নেই। 'ছবির ঘর'-এর দুটি দিক আছে—একটি বহিরলোক অপরটি অন্তরলোক। যেখানে ছবির পর ছবি, সে ছবিগুলি ছোটো বড়ো দাগে এমন ভাবে আঁকা, তারা এতো জীবন্ত যেন সব পাঠকই তাঁদের চোখের সামনে দেখছেন। ঘন ঘোর বর্ষার দিনে গলির মোড়ে যাঁর 'কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে' সেই অঘোরবাবু, সেণ্ট জেভিয়ার্সের হৃদয়বান শিক্ষক পেনেরাণ্ডা, লণ্ডনের দরিদ্র সৎ লাটিন শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীকণ্ঠ সিংহ। ভৃত্য ঈশ্বর, পাঁচালী গায়ক কিশোরী চাটুজ্জে। পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিদাদা অক্ষয় চৌধুরী 'ন্যাশনাল' নবগোপাল। বিলেতে মাতৃসমা স্কটগৃহিণী। অথবা 'ভাবে-ভোর' 'গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া' সঙ্গীতমত্ত, কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম শ্লোক আবৃত্তিরত তাঁর কাব্যজীবনের গুরু বিহারীলাল। যেন চলচিত্রের ছবির মতো কবির জীবনটিকে ধরে রেখেছে। শুধু বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির ছবি নয়। যে-কালে তিনি লালিত-বর্ধিত, যে-বাতাস থেকে তিনি নিঃশ্বাস টেনে নিয়েছেন তার কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয়ও 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে। বিশেষত যখন তিনি লেখেন তাঁর 'পনেরো-ষোল হইতে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত' সময়ের কথা, যাকে তিনি 'অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল' বলেছেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের শেক্‌সপীয়র, মিল্‌টন ও বায়রণের প্রভাব এবং বাংলা সাহিত্যে তারই 'ঝড়ের ডাকের নকল' তখন চলছিল।[১২] চিন্তার ক্ষেত্রে বেন্‌থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল ও কোঁতের যুক্তিবাদী উপযোগ-পন্থী দর্শনের[১৩] আধিপত্য দেখা দিয়েছিল, তার বিপরীত পথের মানুষেরও অভাব ছিল না 'ভক্তিই তাহাদের বিলাস'। প্রথমটির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল, দ্বিতীয়টির নয়। তিনি স্পষ্টভাষায় উচ্চারণ করেছেন, এ উচ্চারণ দুঃসাহসিক—

> যদিও এই ধর্ম-বিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিলনা—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।[১৪]

এই চরণগুলি কবির বিবৃতিমাত্র নয়, মন্তব্য নয়, খোলাখুলি স্বীকারোক্তি পর্যায়ের। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর মনে যে 'ধর্মবিদ্রোহ' ও 'বুদ্ধির ঔদ্ধত্য' দেখা দিয়েছিল একথা জানার পর রবীন্দ্রমানসের একটি অধ্যায় পাঠকের কাছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নতুন অর্থ বহন করে আনে। কিন্তু কবি তো সেখানে থেমে থাকেন নি—তাঁর এ দুটি মনোভাবই পরে বদলে গেছে। কাজেই এই বদলের পালা 'জীবনস্মৃতি'তে যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে 'বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত' করার ছাপ নেই। অতীতের 'আমি'-কে বর্তমানের 'আমি' শুধু দেখে না, কৌতুক বোধ করে ক্ষান্ত হয় না, সেই 'আমি'-র মনের আকাশকে যবনিকামুক্ত করে দেখায়। এখানেও তাই ঘটেছে। অবশ্য প্রশ্ন থাকতে পারে কবি-হৃদয় ও কাব্যরচনার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও 'জীবনস্মৃতি'তে অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না। যে বালক-চিত্ত অনুভব করে 'সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল' কিম্বা যৌবনস্পর্শে যে কবি-মন জানায়—

> মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম-কুঞ্জমাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।[১৫]

—এই খুশিটুকু, অবশ্যই তখনকার, কিন্তু তখনকার সেই খুশি-হওয়া অনুভূতি কি সঞ্চিত হয়ে থাকেনি কবির স্মৃতিলোকে? অথবা কুড়ি বছর বয়সে দ্বিতীয়-বার বিলেত যাত্রার [যা ঘটে নি] পূর্বের স্মৃতিচয়ন করে তিনি পাঠক-দের যখন জানাতে চান—

> গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটি সখী রেখোনা মনে' তখনই দেখিলাম, সুর যে যায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যাম-লিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুন্ঠিত হইয়া আছে; তাহা যেন সমস্ত জল-স্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা।[১৬]

রোমাণ্টিক কবি-মনের এই সূক্ষ্ম নিসর্গানুভূতি সংবেদনশীলতা ১৮৮১ সালের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'স্বভাবজ' আরোপিত নয়। অবশ্যই এই অতীত-অনুভবের আশ্রয়স্থল স্মৃতি; কবি-চিত্তের অন্তরলোকের স্মৃতি। 'জল-স্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা' সেকালের আর কোনো বাঙালী কবির অন্তঃকর্ণে এমন-ভাবে ধরা পড়ে নি, ধরা পড়বার কথাও নয়, কেন না আলংকারিকের ভাষায় সেখানে রয়েছে 'কবি-স্বভাব'-এর ভেদ।[১৭] 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত মরণ-চিন্তা যে পরবর্তী কাল জাত নয়, 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' রচনা দুটির কাল ও বক্তব্য বিচার করলেই তা প্রতীয়মান হবে।

তবু মানতে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বাল্য-কৈশোর কালের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে পরবর্তী কালের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাকালে স্বভাবতই পরবর্তী কালের চিন্তার ছাপ ফেলেছেন। শিক্ষা, স্বাদেশিকতা, রেনেসাঁস, বিলাতী সংগীত প্রভৃতি প্রসঙ্গে সেকথা খাটে। অপরদিকে সন্ধ্যা-সংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল কাব্যগুলির যে-ব্যাখ্যা তিনি দান করেছেন—সেগুলি বহুলাংশে পরবর্তী কালের ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্র-নাথের। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর অব্যক্ত আকুতি, বিষাদ ও বেদনা কিম্বা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পিছনের সহসা আনন্দের সূর্যোদয় বা 'ছবি ও গান'-এর মাতাল যৌবন কবির সেদিনকার কবিজীবনে সত্য ছিল না। সেই সত্যের পরিচয় ধীরে ধীরে কবি উন্মোচন বা 'unfold' করে দেখিয়েছেন 'প্রভাতসংগীত' প্রসঙ্গে। বাল্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে গড়ে-ওঠা দিবারাত্রির নিবিড় যোগ 'যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি' করার ফলে কী ভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং 'প্রভাতসংগীতে' এসে সেই ভালোবাসার ধনকে আবার নূতন করে ফিরে পেলেন, তার অনুপম বিবৃতি বারবার শুধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেই মনে পড়ায়।[১৮]

গ্যেটের Aus meinem Leben : 'Dichtung und Wahrheit,' অর্থাৎ 'Truth and Poetry : From my own life' বইটির সঙ্গে 'জীবন-স্মৃতি'র সাদৃশ্যের বিষয় কোনো-কোনো সমালোচক তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' রচনা,[১৯] "তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল" মন্তব্য,[২০] আত্ম-স্মৃতি রচনায় পত্র-ব্যবহার রীতি বর্জনের অভিপ্রায়, ঠিক পঁচিশ বছরে পেঁছে সমাপ্তি-রেখা টানা—গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল মনে পড়াতে পারে। কিন্তু এই মিল প্রধানত বহিরঙ্গের। গ্যেটের বারখন্ডযুক্ত রচনাবলী প্রকাশিত হলে তাঁর জনৈক বন্ধু লেখেন, রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিন্যাস প্রয়োজন এবং গ্যেটের তৎকালীন জীবন ও শিল্পগত মতবাদ জানতে পারলে তাদের আস্বাদ গ্রহণ পাঠকের পক্ষে সহজতর হবে। এই অনুরোধের ফলে গ্যেটে তাঁর আত্ম-স্মৃতি রচনায় অগ্রসর হন। একথা ঠিক উভয়েরই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম কিন্তু গ্যেটের wealthy dilettante বাবা ও কবি-মায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পিতা-মাতার মিল নেই। বাবার কাছ থেকে গ্যেটে পেয়েছিলেন শক্ত পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা, মায়ের কাছ থেকে কবি-কল্পনার যাদু। তাঁর পরিবার, পরিবেশও রবীন্দ্রনাথ থেকে কতো পৃথক। গ্যেটের জীবনে গ্রেচেন, আনেৎ, ফ্রিডারিকা, নৃত্য-শিক্ষকের কন্যাদ্বয় এমীলিয়া ও লুসিণডা প্রভৃতির প্রেম ও উন্মাদনা তাঁর জীবনকে নানা পথে রূপান্তরিত করেছে। শার্লট বফ্‌-এর প্রেমে নৈরাশ্য, মূলত গ্যেটেকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে গিয়েছিল যার থেকে তাঁর মুক্তি ঘটল পত্রোপন্যাস Sorrows of Young Werther (১৭৭৪)-এর সৃষ্টিতে তরুণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জেরুজালেমের মৃত্যুর ঘটনা যার পশ্চাৎপট হিসেবে অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। এই হৃদয়বিহ্বল রচনায় গ্যেটে আত্ম-আরোপ[২১] ঘটালেন। গ্যেটে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী রুশোর'Confessions'র মতো করে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ করেন নি, বরঞ্চ বলা যায় পারেন নি।[২২] যে প্রণয়কথা তিনি দিলীপকুমার রায়ের কাছে বলেছেন বা 'ছেলেবেলা'য় লিখেছেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীকে জানিয়েছেন বৃদ্ধ বয়সে, 'জীবনস্মৃতি'তে তাকে চেপে রেখেছেন। তিনি ছবির ঘরের খবর নিতে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর জীবনের প্রথম প্রেম, 'জীবনের ধ্রুবতারা' কাদম্বরী দেবীর ছবিকে কেন আর একটু মেলে ধরলেন না? কেনই বা মরাঠীতনয়া অ্যানা বা অন্নপূর্ণা তরখড় কবির 'নলিনী' রইলেন উপেক্ষিতা-প্রায় হয়ে? অথবা বিলেতের স্কট পরিবারের দুহিতারা (বিশেষত তৃতীয়াটি) যাঁদের উদ্দেশে 'দিকশূন্য ভট্টাচার্য' ছদ্মনামে লিখেছিলেন প্রেমের কবিতা,[২৩] তাঁদের কথা 'অনুরাগে সিক্ত করি' কেন পাঠালেন না ভাবীকালের পাঠকদের কাছে? যেহেতু এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, কবি-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেজন্যই এ প্রশ্ন তোলা। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'তে কবি অনেক সংযত, সম্বৃত। জীবনের জানালা আরো একটু খুলে দিলে 'লেখক জীবনের ধারা'টি স্পষ্টতর হতো। গ্যেটের আত্মস্মৃতির সঙ্গে আরেকটু সাদৃশ্য ধরা পড়ত। অবশ্য গ্যেটে নিজের প্রণয়-জীবনের বৃত্তান্ত মেলে ধরা সত্ত্বেও সমালোচক বলেছেন—

> The turbulence of a youth of genious is not quite forgotten, but it is hinted with stately reserve.

রবীন্দ্রনাথ সেই 'hint' টুকুও দেন নি।

না দিন, তবুও 'জীবনস্মৃতি' শিল্পসৃষ্টি হিসাবে উচ্চবর্গের সৃষ্টি। আত্মচরিত সাহিত্য সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করি যার থেকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র মূল্য সহজেই নিরূপিত হবে—

> He [the autobiographer] is not the mere annalist of his life, but his philosophic historian. The result is not a scientific record, but a work of art ; an expression of personality, not an objective narrative.[২৪]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকে কোনোদিনই বৈদান্তিক মায়াবাদী বা বৈজ্ঞানিক-জড়বাদী দৃষ্টিতে দেখতে চান নি। এই 'দৃশ্য-গন্ধ-গানে'র জগৎ, যে প্রতিদিন প্রভাতে একটি-একটি করে সৌন্দর্যভরা পৃষ্ঠা খোলে তাকে তিনি 'মায়া' বলে স্বীকার করেন নি। বৈশাখে যার আকাশে-বাতাসে রুদ্র ভৈরবের আহ্বান, বর্ষার জলধারে বিরহের মল্লার, শরতে তপঃশুদ্ধা পার্বতীর মতো 'প্রফুল্লকাশা' শ্রী, হেমন্তে হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতা, শীতে রিক্ত সন্ন্যাসীবেশ, আবার বসন্তে রাগরক্ত তপোভঙ্গ—সেই ধরণীকে তিনি পরিপূর্ণরূপে ভালোবেসেছেন এবং ধরণী তাঁর কাছে মর্ত্যের স্বর্গে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক জড়বাদী সংজ্ঞাকেও অগ্রাহ্য করেছেন—

> এই যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই যে অপরিসীম সত্য, এই যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম, তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি।[১]

তেমনি এই মাটির পৃথিবীর নরনারীর জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য তাঁর কবিচিত্তকে চিরদিন ভরে ছিল। সোনার তরী কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি তাঁর নিজস্ব কবিধর্মকেই প্রকাশ করেছেন আর-এক কবির ভাষণে—

> বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
> বহু দিবসের সুখদুখ আঁকা
> লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা
> সুন্দর ধরাতল।
> ... ...
> প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
> আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
> আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
> শিশিরের মত রবে

মর্ত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, মানুষের প্রতি নিবিড় ভালবাসা এবং জীবনকে সকল সংকীর্ণ পরিধির ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন করে তোলাই তাঁর প্রধান ধর্ম। তাই তিনি মুক্তি খুঁজেছেন আলোয় ঘাসে শিশিরে আর মানবচিত্তের স্নেহে প্রেমে করুণায়। তাই তাঁর ধর্মের ভিত্তি পূজার্চনা, বিজনবাস বা অনশন-উপবাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নয়—প্রীতিই তাঁর ধর্মের সোপান, প্রীতিই তাঁর মুক্তির পাখা। মর্ত্য ও মানব-প্রীতির মধ্য দিয়ে তিনি অসীম, অরূপ, পরমানন্দের স্পর্শ লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ধর্মবোধের উৎসারণে শিশুচিত্তের ভূমিকাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুচিত্ত এসেছে আলোকের দূতরূপে বৃহৎ জীবনের, বিশ্বজীবনের সাড়া জাগাতে—তমসাকীর্ণ হৃদয়ে বহন করে এনেছে পবিত্র রৌদ্রচ্ছটা।

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা বাল্মীকি-প্রতিভায় (১২৮৭) দেখি তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর-প্রসঙ্গ ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথমাংশে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও এই গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ আত্মপ্রকাশ করেছে—তখন রবীন্দ্রনাথ মাত্র বিশ বছরের যুবক। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়; একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল।[২]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, দস্যু বাল্মীকির কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের পিছনে দেখি একটি নিরাশ্রয়া বন্দিনী বালিকার কাতর ম্লান মুখচ্ছবি। দস্যু বাল্মীকি কালীপূজক, হিংসাপন্থী। তার অনুচরেরা যখন বন্দিনী বালিকাকে বলিরূপে ধরে এনেছে তখন বাল্মীকি প্রথমে কৃপাণ আনয়নে আজ্ঞা দিলেও বালিকার কাতর অনুনয়ে প্রাণরক্ষার করুণ আবেদনে তার লেলিহান হিংসাশিখা অবনত হয়েছে—

> এ কেমন হল মন আমার।
> কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে।
> পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেন রে,
> কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
> কী মায়া এ জানে গো,
> পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
> সব ভেসে গেল গো সব ভেসে গেল গো—
> মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

এই 'করুণার প্লাবনে' দস্যু বাল্মীকির চিত্তভূমি প্লাবিত হয়েছে বলেই কবি বাল্মীকির আবির্ভাব ঘটেছে। এই আবির্ভাবের পিছনে শাস্ত্রীয় ধর্মাদর্শ নয়, শিশুচিত্তই সক্রিয়। তাই বাল্মীকি কালীপ্রতিমার পরিবর্তে বাক্‌দেবী সরস্বতীর কৃপালাভ করেছেন। হিংসার উপর জয়ী হয়েছে প্রেম—বাল্মীকির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিংস্র নির্মম চিত্তে প্রবাহিত হয়েছে প্রীতির মন্দাকিনী।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও (১২৯০) এই দ্বন্দ্বের নাটক। এ-সম্পর্কে তিনি আরও বিস্তৃতরূপে লিখেছেন—

> এই কারোয়ারে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া অন্তরের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল. তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল, ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই সীমার মধ্যেও সীমা নাই।[৩]

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর এই নবদর্শন লাভ প্রথাগত বা শাস্ত্রগত পথে আসে নি, এসেছে 'ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা'র পিতৃ-সম্বোধনে, যার ফলে ধর্মনিষ্ঠ ব্রতচারী সন্ন্যাসীর জীবনে স্নেহধারা বহে গেল। কিন্তু পাছে সে সাধনভ্রষ্ট হয় তাই সংসার ত্যাগ করে চলে গেল গুহায়, কিন্তু বার বার মনে ফুটে উঠল বালিকার মুখ, কানে এসে আঘাত করল বালিকার ক্রন্দনধ্বনি—সন্ন্যাসী ফিরে গেল আবার বালিকার স্নেহের বন্ধনে—বালিকাটি তখন জীবনের পরপারে। কিন্তু সে সন্ন্যাসীর চিত্তে জাগিয়ে দিয়ে গেল প্রীতিধর্ম।

প্রকৃতি ও শিশুচিত্ত উভয়ের মধ্যে নিষ্পাপ সৌন্দর্য, অম্লান নবীনতা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে তারা সমসূত্রে গ্রথিত। যে-মুহূর্তে সন্ন্যাসীর হৃদয়ে স্নেহ এলো তখন প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি ভালোবাসতে পারলেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। রাজর্ষি কিশোর-উপন্যাস রূপে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই উপন্যাসে দেখি ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে জীববলির বিরুদ্ধে একদিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। পশুবলির শোণিত গোমতীর নদীস্রোতকে দীর্ঘ দিন রঞ্জিত করলেও পূর্বে রাজার মন কোনোদিন বিচলিত হয় নি। কিন্তু—

> যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিলেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপ্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কালরাত্রে যে একশো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।
>
> হাসি রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এ কিসের দাগ বাবা!'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজা বলিলেন 'রক্তের দাগ মা !'
সে কহিল 'এত রক্ত কেন ?' এখন এক প্রকার কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন ? তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন। একটি ছোট মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'। তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্তানহীন রাজার জীবনে স্বর্গের আশীর্বাদের মতো হাসি ও তাতা দেখা দিয়েছিল। তাদের হৃদয়ের স্পর্শে পৃথিবী তাঁর কাছে সুন্দরতররূপে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই হাসি যখন তার মৃত্যুশয্যায় বিকারের ঘোরে বলতে লাগল 'এত রক্ত কেন' তখন গোবিন্দমাণিক্য চিরদিনের বিশ্বাস, সংস্কার ও আচরিত ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে ঘোষণা করলেন—"মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।"— এখানেও লক্ষণীয় যে রাজা হিংসার পথ বর্জন করেছেন এবং এই পথ-পরিত্যাগের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি বালিকার ব্যাকুল প্রশ্ন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা উল্লেখযোগ্য। ১২৯৭ সালে 'রাজর্ষি'র প্রথমাংশকে অবলম্বন করে 'বিসর্জন' রচিত হয়। পূর্বরচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এখানে যেন যুগ্মভাবে ফিরে এসেছে। বাল্মীকির মতো রঘুপতিও কালীপূজক, গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এই বলিদান নিয়ে। তিনি গোবিন্দমাণিক্যের বলিদান বন্ধের আদেশের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই কালীমূর্তিকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করেছেন। যে-অপর্ণাকে মন্দিরাঙ্গন থেকে বহিস্কৃত করেছেন তাকেই শেষে মাতৃ-সম্বোধন করেছেন। অপর্ণা প্রেমের শক্তিরূপে বিসর্জন নাটকে দেখা দিয়েছে। বালিকা-অপর্ণার জয় এই নাটকে ঘোষিত হয়েছে। বাল্মীকির হৃদয়-পরিবর্তনের পিছনে ছিল একটি বালিকার প্রভাব। নাটকে সেই বালিকার নবরূপ অপর্ণার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিক থেকে সন্ন্যাসী ও 'রঘুর দুহিতা'রও আত্মপ্রকাশ রঘুপতি-অপর্ণার মধ্যে। অবশ্য বিসর্জন নাটকে রঘুপতির রূপান্তরের মূল কারণ জয়সিংহের আত্মবিসর্জন। রঘুপতির কঠোর নির্মম বক্ষকপাটের নিচে জয়সিংহের প্রতি স্নেহফল্গু নিত্যবহমান ছিল। তাই রঘুপতি যখন গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ধ্রুববলির চক্রান্ত করেছেন, তখন নিদ্রিত ধ্রুবকে দেখে তাঁর মনে হল—

> কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
> এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
> পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
> কেঁদেছিল নতুন দেখিয়া চারিদিক,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশু-মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।[8]

রঘুপতির পরিবর্তন ঘটেছে জয়সিংহের আত্মদানের ফলে। পুরোহিত-গুরু রঘুপতির অন্তরালে যে পিতা-রঘুপতির প্রচ্ছন্ন অবস্থান ছিল—শেষে তারই জয় হল। রঘুপতির কালীপ্রতিমা বিসর্জন, হিংসাপথ ত্যাগ, প্রেমের শক্তিকে স্বীকার—সবার পিছনে জয়সিংহ-অপর্ণার প্রভাব। অপর্ণা এসেছে বাল্মীকি প্রতিভার 'বালিকা', প্রকৃতির প্রতিশোধের 'রঘুর দুহিতা' ও রাজর্ষির 'হাসি' চরিত্রের পথ বেয়ে। 'বিসর্জন' আলোচনাকালে একথাটি মনে রাখতে হবে। পূর্বালোচিত 'বালক' পত্রিকার যুগে দেখা যায় কবি শিশুদের নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তারও পূর্বে রচিত প্রভাতসঙ্গীত কাব্যে (১২৯০) দেখি বালক-বালিকাদের জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তিনি তাদের মধ্যে বিস্ময়ের বস্তু খুঁজে পেয়েছেন—

পথের ধারে ঘরের দ্বারে বালিকা এক মেয়ে
ছোটো ভায়েরে পাড়ায় ঘুম কত কী গান গেয়ে।
তাহার পানে চাহিয়া থাকি দিবস যায় চলে
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি হৃদয় যায় গলে।
এতটুকু সে পরাণটিতে এতটা সুধারাশি
কাছেতে তাই দাঁড়িয়ে তারে দেখিতে ভালোবাসি।[৫]

অথবা

হেলিছে কত দুলিছে কত পুলকে ভরা মন
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে আমারি স্নেহধন।
আমারি মুখে চাহিয়া তোর আঁখিটি ফুটি ফুটি
আমারি বুকে আলয় পেয়ে হাসিয়া কুটি কুটি।
... ...
হেথায় আমি রহিব বসে আজ সকল বেলা
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে ভাই-বোনের খেলা।[৬]

কিংবা

চারিদিকে সৌরভ চারিদিকে গীতরব
চারিদিকে সুখ আর হাসি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধো-আধো বুলি
চারিদিকে স্নেহপ্রেমরাশি।[৭]

১২৯৩ সালের 'ভারতী-বালক' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন—

ইহাদের করো আশীর্বাদ
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ।

এই কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরা যুবক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় জুড়ে ছিলেন। তাঁর শিশুপ্রীতির উৎস এখানেই। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন—

> রবি কাকা ছোটছেলে স্বভাবতই ভালোবাসতেন—আমাদের ভাই-বোনকে দিয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয়। বিলেতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই যে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল সেটা শেষজীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। ছেলেদের মন ভোলানোর তাঁর একটি উপায় ছিল নানা রকম মজা করে গান গাওয়া…।[৮]

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

> সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফলবিছানো প্রান্তরে, পাইন বনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিতেছিল বলিতে পারি না।

এই শিশুসঙ্গীদুটি অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাই 'রাজর্ষি' উপন্যাসের হাসি ও তাতা। বাল্যে মাতৃস্নেহচ্যুত রবীন্দ্রনাথের স্নেহবুভুক্ষা তাদের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করেছিল।

বিংশ শতকের শুরুতে ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয় মানুষ-গড়ার আদর্শ নিয়ে শুরু করেন, অন্য কোনও লক্ষ্য নিয়ে নয়। সেজন্যই তিনি প্রচলিত অন্যান্য স্কুলের মতো আট-দশ শ্রেণীযুক্ত গোটা স্কুল একসঙ্গে খোলেন নি। তিনি ছোটদের নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হলেন, বয়স্ক ছাত্রদের প্রথমে গ্রহণ করেন নি। যাদের মনের উপর সমাজ প্রথার কড়া ছাপ পড়ে গেছে—তাদের তিনি সেদিন বর্জনই করেছিলেন। এই বালকদের মধ্যে তিনি লাভ করেছিলেন শান্তি ও আনন্দ। অধ্যাপক মোহিত সেনকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন "আজকাল শিশুছাত্রগুলিকে নিয়ে বিদ্যালয়ে বেশ শান্তিতে আছি।" এ-সম্পর্কে হেমলতা দেবী লিখেছেন—

> শুধু 'শিশু' বইখানি লিখে তিনি শিশুদের মনের খোরাক জোগাননি—কত ভালবাসা দিয়ে তিনি তাদের মনকে গড়ে তুলেছিলেন যারা তাঁর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিক্ষালয়ের শিশুদের প্রতি ব্যবহার দেখেছে তারাই তা জানে। প্রাণ দিয়ে শিশুদের যত্ন করতে চেয়েছেন—যে জায়গায় নিজের হাতে তাদের নাওয়াতে খাওয়াতে পারতেন না সে জায়গায় প্রতি মুহূর্তে শিক্ষালয়ে মাতৃজাতির অভাব অনুভব করতেন গভীরভাবে।[৯]

তাছাড়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ১৩০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী পরলোক গমন করেন। তখন কবি একাধারে পিতা ও মাতার কর্তব্য পালন করেছেন। একদিকে আশ্রমে পাঠরত বালক-ছাত্র অপরদিকে মাতৃহারা পুত্রকন্যা সকলকে তিনি বেষ্টন করে রইলেন, তার মধ্যে পেলেন সুচির আনন্দ।

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর রচিত নাটকগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শারদোৎসব (১৩১৫)। এই নাটকের রূপান্তর 'ঋণশোধ'। পরের নামটির মধ্য দিয়ে নাটকের বক্তব্য যেন সুস্পষ্ট হয়েছে। এই নাটকখানির ভিতরের কথা শিশুবোধ্য নয়। রাজা সন্ন্যাসী বেশে বার হয়েছেন শরতে, আগেকার রাজারা বার হতেন মৃগয়ায়। বেতসিনী নদীর ধারে শারদ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছে—ছেলেরা ঠাকুর্দার সঙ্গে খুশির খেলায় মেতেছে গানে গানে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন, উপনন্দ দূরে মাটিতে বসে গুরু সুরসেনের ঋণশোধ করছে চিত্রবিচিত্র করে পুথি লিখে। সুরসেন ছিলেন গুণী বীণকার, তিনি উপনন্দকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন। এইসূত্রে 'উপনন্দ' নামটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আনন্দই যার একমাত্র সম্পদ সে উপনন্দ। যখন অন্য বালকেরা খুশিতে-হাসিতে শরতের আলোয় ঝলমল করছে তখন উপনন্দ একা পুথি লিখে-লিখে ঋণশোধ করে চলেছে, লক্ষেশ্বরের কাছে-জমা গুরুর ঋণ। দুঃখের মূল্যে সে ঋণশোধ করছে—লাভ করেছে দিব্য আনন্দ। সে-আনন্দের কি তুলনা আছে? ধরণী, আকাশ মেঘ রৌদ্র বৃষ্টি সবার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তারপর শরতের সোনার থালায় তার নবীন ধান্য সাজিয়ে দেয় কত দুঃখবহনের পর—সেই ধরণীর ঋণশোধের পালা। তেমনি উপনন্দ দুঃখের মূল্যে ঋণশোধ করছে—লাভ করছে পরমানন্দ। সেই আনন্দের সাধনার রূপটি রাজ-সন্ন্যাসী উপলব্ধি করলেন বালক-উপনন্দের কাছ থেকে। তাই তিনি বলেছেন—

> লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী বেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে-খবরটি আজ ওই উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

উপনন্দ নিজেই হয়ত জানে না তার এই মহিমার কথা। কিন্তু রাজ-সন্ন্যাসীর শারদোৎসব সার্থক হল উপনন্দ-সাধনার উপলব্ধিতে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'শারদোৎসব' নাটক রচনার তিন বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটক রচনা করেন। পঞ্চক-মহাপঞ্চক ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দুটি বিরোধী জীবনের রূপ দেখানো হয়েছে। মহাপঞ্চক প্রথাগত, আচারসর্বস্ব ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারক, সেই জন্য সে প্রাণের সাধনা, সংগীত সাধনার বিরোধী। অথচ অচলায়তন নাটক আরম্ভ হয়েছে পঞ্চকের ব্যাকুল-ভৈরবীতে : 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না'। মহাপঞ্চক বয়সে ও শাস্ত্রে প্রবীণ—পঞ্চক বয়সে কিশোর আর সকল প্রথা ও আচারের বেড়ালঙ্ঘনকারী। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সেই ধর্মাচারের নিন্দা করেছেন যেখানে 'তুচ্ছ আচারের মরুবালু-রাশি' প্রধান হয়ে উঠেছে। অচলায়তন-এ কিশোর পঞ্চক ব্যতিক্রম। তাকে উপাচার্য বলেন—

> শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন একটা অনিয়ম আছে তাকে কিছুতেই দমন করা গেল না। ওই বালককে আমার ভয় হয়। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ।

কেননা এই কিশোর পঞ্চক অচলায়তনে মুক্তির হাওয়া তুলেছে। যে-আচার্য, 'গুরু' চলে যাবার পর দীর্ঘকাল অচলায়তনে বাস করেছেন, তার সাধনা ও শাস্ত্রকে নির্বিরোধ নিষ্ঠায় মেনে এসেছেন তিনি কিন্তু পঞ্চকের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন মুক্তি। তাই তিনি পঞ্চককে বলেছেন—

> তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন শাস্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।

এই ভাবটি 'মুক্তধারা' (১৩২৯) নাটকে খুড়ো মহারাজ বিশ্বজিতের ভাষণেও শুনতে পাই। বিশ্বজিতের শুভ্র কেশ-বেশ—এই সর্বশুভ্রতার মধ্যে একটি নির্মলতার ভাব আছে। তিনি সকল রাজসিক ও তামসিক বোধের ঊর্ধ্বে। তাঁর নামটির মধ্যে তাঁর জীবনেরই ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটকে রণজিৎ, অভিজিৎ নামগুলি বিশিষ্ট অর্থবোধকরূপে বসিয়েছেন। ঐ নাটকে বিশ্বজিৎ রণজিৎকে বলেছেন—

> একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলাম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করিনি? শেষে কখন ঐ বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এলো—আলোর মতো এলো। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম।

বিশ্বজিৎ দীর্ঘকাল চণ্ডনীতিকে অনুসরণ করে চলেছিলেন—সেদিন শক্তির নির্মমতাকেই জেনেছিলেন সত্য বলে। কিন্তু অভিজিৎ তাঁর চিত্তে আনল স্নেহ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই স্নেহে তিনি সকলকে দেখলেন 'আপন' রূপে—তখনই তিনি যথার্থ বিশ্বজিৎ হলেন। এই বিশ্বজিতের পূর্বরূপ বউঠাকুরাণীর হাটের 'বসন্ত রায়'।

আলোচিত তথ্যগুলি থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে রবীন্দ্রনাথ 'মানবধর্ম' উদ্‌বোধনের ক্ষেত্রে শিশুচিত্তকে কী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেছেন। তার প্রধান কারণ শিশুচিত্ত প্রভাতের নির্মল আলোকের মতো, ঝরণাধারার মতো, বসন্তোদ্‌গমে কচি কিশলয়ের মতো সকল মালিন্য, সকল আবিলতাহীন। প্রথা, আচার, সংস্কারের দৃঢ়ছাপ থেকে তারা তখনো মুক্ত। সেইজন্য দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ যত বালক-বালিকা তাঁর পূর্বালোচিত নাটক-নাটিকায় এনেছেন তাদের কারোরই কোনও লৌকিক বা পারিবারিক পরিচয় নেই। বাল্মীকি প্রতিভা-র নিরাশ্রয়া বালিকা, প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর পিতৃ-পরিত্যক্তা অনার্য বালিকা, বিসর্জন-এর জয়সিংহ ও অপর্ণা, শারদোৎসব-এর উপনন্দ, মুক্তধারা-র অভিজিৎ সকলেই পারিবারিক পরিচয়হীন। আমাদের সেই সীমাবদ্ধ জগতে তারা যেন ভূমার বাণী বহন করে আনে। যে-জীবন আমাদের লৌকিক ও পারিবারিক গণ্ডিতে বাঁধা, সে-জীবনের মধ্যে প্রথা ও আচারের, স্বার্থ ও লোভের অভ্যস্ত মুদ্রণই স্বাভাবিক। কিন্তু যে বালক-বালিকাদের চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আলোচিত গ্রন্থগুলিতে অঙ্কিত করেছেন তারা সকলেই বহিরাগত। রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই পর্যায়ের চরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন। মনে রাখতে হবে ডাকঘর নাটকের 'অমল' মাধব দত্তের নিজের ছেলে নয়, পালিত পুত্র। 'অমল' নামটির অর্থও এই সূত্রে স্মরণীয়। তাকে লৌকিক বা পারিবারিক কোন সংস্কার বাঁধতে পারে নি। সে তার অমলচিত্ত নিয়ে জীবনের মধ্যরাত্রে 'রাজা'র স্পর্শ পেল। সে-ই ডাকঘর থেকে রাজার চিঠি পেয়েছিল। মুক্তধারা নাটকের অভিজিৎ রাজা রণজিতের সন্তান নয়, এক দুর্ভাগিনী মাতা নবজাতককে পরিত্যাগ করে গিয়েছিল মুক্তধারা নদীর কোলে। সে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। যেদিন সে তার প্রকৃত পরিচয় জেনেছে, জেনেছে সে রাজরক্তজাত নয়, সে মুক্তধারার কোলের সন্তান—সেদিন তার সকল রাজোচিত অভিমান, সংস্কার ছিন্ন হয়ে গেছে; রক্তের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে মুক্তধারার কলধ্বনি। সেদিন সে শপথ নিয়েছে জন্মকালের ঋণ তাকে শোধ করতে হবে—মুক্তধারার বন্ধনশৃংখল মোচন করতে হবে। অভিজিৎ চরিত্রটিকে এজন্যই নামহীন গোত্রহীন স্তরে রাখা হয়েছে।

গোরা উপন্যাসে 'গোরা' চরিত্রটি সম্পর্কে একই মন্তব্য প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ 'সিস্টার নিবেদিতা'র আদলে গোরাচরিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন—সেজন্যই গোরা জন্মের দিক থেকে আইরিশ। গোরা জানত না তার রহস্যময় জন্মবৃত্তান্ত, জানত না সে হিন্দু নয়, যে হিন্দু ধর্মের মহিমার জয়গানে গোরা অতন্দ্র সেনানী—একদিন সে জানল সে সেই ধর্মের কেউ নয়—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> কৃষ্ণদয়াল…বলিলেন, 'তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।'
>
> এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল।…তাহার সমস্তই কেবল একটা 'না'।

কিন্তু এই 'না' এর মধ্য দিয়ে গোরা অনুভব করল মুক্তি—সে পরেশ-বাবুকে বলল—

> আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু! আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে ভয় আর আমার নেই—আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।…আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।

সর্বজনীন সত্যের আদর্শটি গোরার মধ্যে ফুটিয়ে তুলবেন বলেই রবীন্দ্রনাথ গোরাকে হিন্দুসমাজে শুধু নয়, কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডিভুক্ত করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা মুক্ত শুভ্র জীবনের সাধনা। সে মুক্তি সংসার-বর্জনে নয়। তিনি বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা মুক্তি-অর্জনে প্রয়াসী নন। স্নেহ-প্রেম-মমতার মধ্য দিয়েই অসীমের, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়—এই তাঁর বিশ্বাস। তাই সংসারবিরাগী যেখানে ইষ্টদেবকে লাভ করবার প্রত্যাশায় পত্নী-পুত্র-পরিজনকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে তখন—

> দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন 'হায়
> আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!'

এই প্রীতির পথই ঈশ্বরের পথ, ধর্মের পথ। খ্রীষ্ট বলেছেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও'। কেননা শিশুদের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন অমর্ত্য বিভা। বেথেলহেমের একটি সরাইয়ে একরাত্রে তিনি মানবশিশুরূপে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ'-কবিতায় তার আভাস দিয়েছেন—

> মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু
> উষার কোলে যেন শুকতারা।
> দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর
> মাথায় এসে পড়ল।
> কবি দিল আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠল
> আকাশে,
> "জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাধবপুরের ধনঞ্জয় ও মহারাষ্ট্রের টিলক

"তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না। তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিকচর্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। সেইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তার পরে বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন 'রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন —এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন—সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল, সেই অধিকার মহৎ অধিকার।"—হারুনা মারু জাহাজ, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ; পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি, যাত্রী।

[১৯১৮ সালে বিলেতে হোমরুল লীগের ডেপুটেশন নিয়ে যাবার ঠিক আগে টিলক এই কথা রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন।]

৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব ?

ধনঞ্জয়। বলব ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয় ; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

—প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবেনা। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দুবছরের খাজনা বাকি—দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবেনা, এতবড় আস্পর্ধা।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারবনা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে।

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝেনা—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়।

—প্রায়শ্চিত্ত, তৃতীয় অঙ্ক

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক ১৩১৬ সালে প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[১]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসস্পৃষ্ট রোমান্সের অনুসরণে লেখা 'বৌঠাকুরাণীর হাট'কে (১৮৮৩) ভেঙ্গে ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশ করতে গেলেন কেন? নাটকের শিল্পগুণের দিক থেকে বিচার করলে 'প্রায়শ্চিত্ত' অতি দুর্বল রচনা। এ নাটক তখনকার পাঠক গ্রহণ করে নি। গ্রহণ যে করবে না, রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানতেন, তবু লিখেছিলেন, কেননা তিনি প্রতাপাদিত্যকে বড়ো করে না দেখিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবাদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' চরিত্রে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' চরিত্রে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ধনঞ্জয়ের মধ্যে যেন গান্ধীজিরই প্রকাশ দেখেছেন।[২] শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 'ধনঞ্জয়' চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ প্রাচীন ভারতীয় সাধনার প্রতীক দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসীর উদ্ভাসন দেখেন, দেখেন 'জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মনায়ক'কে। তিনি স্বীকার করেন 'ধনঞ্জয়ের মধ্যে যা ছিল ভাবাদর্শরূপে, তাই সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের মধ্যে।'[৩]

গান্ধীজি বুয়র যুদ্ধের সময়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারকে সহায়তা করেছেন তার বিরোধিতা করেন নি। তাঁর সমর্থনের কারণ সুস্পষ্ট, সে কারণ সম্পূর্ণ নৈতিক নয়, যাকে বলা যায় Practical তাই। তিনি ভেবেছিলেন ভারতবাসী বৃটিশকে সমর্থন করলে ডমিনিয়ন স্টেটাস্ (পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব ১৯২৮ সালের কন্‌গ্রেস অধিবেশন অবধি গান্ধীজি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ১৯২৯ সালে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি পাশ হয়) পাবার পথ দ্রুততর হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ মিটে যাবার পর তুরস্কের 'খলিফা'র সর্বময় ক্ষমতা-খর্বে বিচলিত ভারতের মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত 'খিলাফৎ-আন্দোলন'কে গান্ধীজির সমর্থন ও অসহযোগ-আন্দোলনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেওয়া কোনও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—এও সেই Practical কারণ, হিন্দু-মুসলমানকে মিলিয়ে নিয়ে বৃটিশ রাজশক্তির উপর চাপ দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন বা আইন-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্যান্য আন্দোলন কোনটিকেই সমর্থন করেননি একথা আমাদের স্মরণে রাখা দরকার।

গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় ১৯১৩ সালের পূর্বে হয়নি। গোপাল কৃষ্ণ গোখেল দ্বারা প্রেরিত এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন্ দক্ষিণ আফ্রিকায় গোখেল-শিষ্য গান্ধীজি পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য যান। তার পূর্বে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ছিলনা, পরিচয় ছিল বলে সাক্ষ্য মেলে না। কাজেই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' চরিত্রে সমকালীন গান্ধীজির ছায়াপাত ঘটেছে, এ ধরনের অভিমত মেনে নেওয়া শক্ত।

এই সূত্রে আমার মনে হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর উক্তির মধ্যে বালগঙ্গাধর টিলকের (১৮৫৬-১৯২০) একটি উক্তির ছায়া হয়ত বা পড়েছিল। টিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ও সম্পর্ক কেমন ছিল তার বিশদ পরিচয় দেবার পূর্বে একটি বিশেষ সময়ে টিলকের ভূমিকা ও উক্তির আলোচনা করি। ১৮৯৬-৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই নিদারুণ খাদ্যাভাবের দিনে সরকারী কর্মচারিদের মৃত্যুমুখী প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না বরঞ্চ সেই 'দয়াময়ী' মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে খাজনার হার সাত গুণ বাড়ানো হয়েছিল। সেদিন 'কেশরী' পত্রিকায় টিলক লেখেন—

> Will you kill yourself by timidity and starvation? If you have money to pay Government dues pay them by all means. But if you have not, will you sell your things away only to avoid wrath of the subordinate Government officers? Can you not be bold even when in the grip of death? We can stand any number of famines but what shall we do with sheepish people? Had such a famine broken out in England and had the Prime Minister been as apathetic as our Viceroy his Government would have tumbled down in no time.[8]

প্রকৃতপক্ষে টিলক এবং 'সার্বজনিক সভা'র সভ্যেরা সেদিন অনশনক্লিষ্ট সাধারণ মানুষকে সরকারী খাজনা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁরা চাষীদের স্থানীয় শাসক-কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করতে উৎসাহিত করেছিলেন। পরবর্তী কালে গান্ধীজির চম্পারণ-সত্যাগ্রহ টিলকের আন্দোলনের উত্তরাধিকারী। শুধু তাই নয় টিলক বাংলাদেশে যখন 'স্বদেশী' বা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন চলছিল সেই সময় (১৯০৬) ঘোষণা করেছিলেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> Our ideal is freedom, which means absence of foreign control, Our method is passive resistance which means an organized determination to refuse to render any voluntary or honorary service to the government.[৫]

এখানে টিলক কথিত 'Passive resistance' শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়। টিলক আয়ারল্যাণ্ডের পার্নেলের রাজনীতিকে অনুসরণ করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া মাধবপুরেও পড়েছিল। সেখানেও ক্ষুধার্ত ছেলে-পিলেরা অন্ন পায় নি, তার উপর নেমে এসেছিল প্রতাপাদিত্যের কঠিন প্রতাপ। তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী বলেছিল—

> বেশি যখন ঘরে থাকে তোমাকে দিই,...আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

এসব কথার মধ্যে মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষের দিনে টিলকের পুরুষ-আহ্বান কি শোনা যায় না? মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ক্ষুধিতের, উৎপীড়িতের ক্রন্দন কি সেদিনকার বাংলাদেশে এসে পেঁছয় নি? অবশ্যই পেঁছেছিল।

উল্লেখযোগ্য যে একই সময়ে বোম্বাইতে প্লেগ (১৮৯৬) দেখা দিলে টিলক তাঁর স্বেচ্ছাসেবক দলকে নিয়ে মহামারীগ্রস্ত দেশবাসীকে রক্ষা করবার কাজে নামেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্লেগ দমনের নামে অমানুষিক নির্যাতন শুরু করেন জনসাধারণের উপর। জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল।[৬] মহারাষ্ট্রে বৃটিশ-বিরোধী কয়েকটি গুপ্তসমিতি বা বিপ্লবী সমিতি এ সময় গড়ে উঠেছিল। টিলকের অনুগামী চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা প্লেগ অফিসার মিঃ র‍্যাণ্ড ও তাঁর সঙ্গী লেফ্‌টন্যান্ট আয়ার্স্টকে গুলি করে হত্যা করেন (২২ জুন, ১৮৯৭)।[৭] তাঁদের ফাঁসি হয়। টিলকের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে নির্বাসিত করা হয়। র‍্যাণ্ড-হত্যার পরে ১৮৯৭ সালে ২৭শে জুলাই তারিখে রাত দশটায় বোম্বাই শহরে Indian penal Code-এর 124A ধারা বলে টিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছিল তাঁর 'শিবাজীর উক্তি' কবিতা রচনা, শিবাজী উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁ হত্যার সমর্থন। এই গ্রেফ্‌তারের খবর কলকাতায় এসে পেঁছলে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্ট হল। সেদিন কবি রবীন্দ্রনাথ নির্বিকার ছিলেন না, নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

তিনি, হেমচন্দ্র বসু মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'টিলকের মোকদ্দমার সাহায্যকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠাইয়াছিলেন'।[৮] এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমল হোম লিখেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টিলক কলিকাতায় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থা জানাইলেন। কলিকাতা হইতে কৌঁসুলী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য অমৃত-বাজার পত্রিকা' আপিসে পরামর্শসভা আহূত হইল। আমন্ত্রিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি সভা-কক্ষে শুভ্র উত্তরীয় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন, ললাটে তাঁহার রক্ত-তিলক! টিলকের জন্য কলিকাতার কৌঁসুলী নিয়োগের ব্যয়নির্বাহার্থ চাঁদা তুলিবার কাজে রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে যোগদান করিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, চাঁদার জন্য তারকনাথ পালিত মহাশয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গিয়া একহাজার টাকা আদায় করেন। প্রায় সতেরো হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার দুই জন বিজ্ঞ ইংরাজ ব্যারিস্টার—পিউ ও গার্থ সাহেবকে বোম্বাইয়ে পাঠানো হয়। তাঁহাদের জুনিয়র হিসাবে যান আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।[৯]

টিলকের মামলা ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে শুরু হয়। আঠারো মাস সশ্রম কারা-দন্ডে টিলক দন্ডিত হন। সারা ভারত স্তম্ভিত হয়ে গেল। টিলকের সশ্রম কারাদন্ডাদেশ ঘোষিত হবার পর বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে লেখেন—

> তিলকের সমস্ত খবর কাগজে পড়িয়াছেন। এক্ষণে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিবার খরচা সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। আপনাদের অঞ্চলের জমিদার বর্গের নিকট হইতে কিছু কিছু যোগাড় করিতে পারেন না? আমরা মেয়েদের কাছ হইতে কিছু কিছু পাইতেছি।
>
> আমি দুই-একদিনের মধ্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিব। যদি তিলকের চাঁদা সম্বন্ধে কোনো সংবাদ দিবার থাকে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বাড়ির ঠিকানায় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখিবেন।
>
> [২৯শে আশ্বিন, ১৩০৪]

বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে স্পেশাল আপিল করা হয়েছিল বোম্বাই হাই-কোর্ট প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে। এই আপিলের মামলায় টিলকের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এইচ্ এইচ্ অ্যাসকুইথ, যিনি পরে ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু আপিলে জিৎ হল না। তবে টিলককে আঠারো মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হয় নি, বারোমাস পরে টিলক মুক্তি পান। নারকেলের ছোবড়া থেকে তাঁকে হাতে করে দড়ি পাকাতে হত জেলের কয়েদী রূপে।[১০] কিন্তু সেখানেই বৃটিশ সরকার থামল না, তারা দেশব্যাপী প্রতিবাদকে স্তব্ধ করবার জন্য ১৮৯৮ সালে Secret Press Committee স্থাপন করে। সেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কমিটির সুপারিশ হল 'সিডিশন বিল' পাশ করে ভারতবাসীর প্রতিবাদের কন্ঠকে রুদ্ধ করা। আমাদের দেশের সেই অবমাননা-উৎপীড়নের মুহূর্তে 'সিডিশন-বিল' পাশ হবার ঠিক পূর্বদিনে টাউনহলে রবীন্দ্রনাথ পড়লেন সেই অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ 'কন্ঠরোধ'।[১১] মহারাষ্ট্রের ঘটনাবলী কবিকে কতদূর বিচলিত করেছিল এই ভাষণ প্রবন্ধে তার জ্বলন্ত পরিচয় আছে—

> যদিচ ইংরাজ আমাদের একেশ্বর রাজা এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এ দেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন—ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি।...কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনাচেষ্টায়, বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ংকর! আশ্চর্য ইহা আমরা পূর্বে কেহ সন্দেহই করি নাই! একদিন শুনিলাম, অপরাধিবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফ্‌তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্নমেণ্ট সাক্ষীসাবুদ-বিচার বিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনাশহরের বক্ষের উপর রাজদন্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর! ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে।...কান্ডটি সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় তারের খবর আসিল রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্‌-এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটু ভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে।...একদিকে পুরাতন আইন-শৃংখলের মরিচা সাফ হইল।[১২] আবার অন্যদিকে রাজ-কারখানায় নূতন লৌহশৃংখল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে [১৩] সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে। আমরা এতই ভয়ংকর!

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর বৃটিশ রাজশক্তির অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

> আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি, দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটি মাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোনো কারণ নাই। দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছিনা তাহাতে আমার কোনো গৌরব নাই।

কলকাতা শহরে প্লেগ দেখা দেয় বোম্বাইয়ের কিছু পরে। রবীন্দ্রনাথের মনে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোম্বাইতে প্লেগ, প্লেগদমন কর্তৃপক্ষের অত্যাচার, নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসন এবং সিডিশন বিল পাশ প্রভৃতি ব্যাপার জাগ্রত ছিল তিনি তাই লিখলেন—

> এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয় জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমা ধৈর্য ও সমবেদনা—ফৌজ কেল্লা ও গুলি গোলার অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল।... পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদ প্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি—ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে, বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এবার প্যুনিটিভ পুলিশ, নাটুনিগ্রহ, সিডিশন বিলের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করিনা।[১৪]

মহারাষ্ট্রের সেই দুঃখের রাত্রে টিলক ও তাঁর সহযোগীরা ছিলেন নির্যাতিত জনসাধারণের পাশে। সেজন্যই টিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ পোষণ করলেন।

টিলক মহারাষ্ট্রে 'গণপতি উৎসব' (১৮৯৩) প্রবর্তন করেন। একথা সত্য বোম্বাইতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কিছু পরে (১৮৯৩ সালে ১১ আগস্ট তারিখে শুরু হয়) 'গণপতি উৎসব'-এর প্রচলন হয়। হিন্দু জনসাধারণকে ঐক্যবন্ধ করার প্রধান পথ ধর্মীয় উৎসব পালন। মহারাষ্ট্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা গজাসুরহন্তা 'গণপতি'কে টিলক বেছে নিলেন। ক্রমে গজাসুর হলেন বিদেশী-শাসনের প্রতীক। রামগোপাল জানিয়েছেন কিছু পরে 'Moslems also took part.' এর পর টিলক 'শিবাজী উৎসবে'র সূচনা করেন (১৮৯৫)।[১৫] মারাঠার অতীত সুপ্ত দেশপ্রেমকে তিনি উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন 'শিবাজী'কে অবলম্বন করে।

১৮৯৭ সালে এপ্রিল মাসে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় তিনি রায়গড়ে শিবাজীর ধ্বংসোন্মুখ স্মৃতিসৌধ পুনর্নির্মাণের জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই হল 'শিবাজী উৎসবে'র শুরু। ১৮৯৭ সালে ১৫ জুন তারিখে 'কেশরী'তে প্রকাশিত হয় 'শিবাজীর উক্তি' নামক দীর্ঘ কবিতা। লেখকের নাম ছিল না, আসলে ঐটি টিলকেরই রচনা। প্লেগের জন্য 'শিবাজী উৎসব' কয়েকদিন স্থগিত থাকলেও পুনরায় ১২ জুন তারিখে ঐ উৎসব আরম্ভ হয়। স্মরণ আছে তার কিছুকাল পরে ২৭ শে জুলাই (১৮৯৭) টিলক গ্রেফ্তার হন।

এই ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'প্রতিনিধি' কবিতা।[১৬] ঐ কবিতায় শিবাজীগুরু রামদাস স্বামী শিবাজীকে বলেছেন—

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
প্যালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।[১৭]

বাংলাদেশে শিবাজী উৎসবের ঢেউ কিভাবে এসেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেবার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে বলা যায় তখন যাঁরা চরমপন্থী (Extremist) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ সালে অরবিন্দ বোম্বাইয়ের 'Indu Prakash' পত্রিকায় কংগ্রেসের আপোষকামী নেতৃত্বের নিন্দা করেন। ১৮৯৭ সালে বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) বলেন কংগ্রেস সাধারণ মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীগোষ্ঠী ও বাংলার বিপ্লবীগোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এইক্ষেত্রে অরবিন্দের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সূত্রে সখারাম গণেশ দেউস্করের (১৮৬৯-১৯১২) নামও স্মরণীয়। এই তেজস্বী স্বদেশ প্রেমিক মারাঠী-বাঙালী ব্রাহ্মণ টিলকের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। টিলকের প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবকে বাংলাদেশে প্রচারের ভার নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবীগোষ্ঠী ও সখারাম গণেশ দেউস্কর। ১৯০২ সালে কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব'-এর সূচনা হয়। পরে সখারাম 'শিবাজীর দীক্ষা' (১৯০৪) নামে যে-পুস্তিকা রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তারই ভূমিকা-স্বরূপ 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখেছেন।[১৮] সখারামের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাছাড়া যে দুজন বন্ধুর সহযোগে তিনি টিলকের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহ ও ব্যবহারজীবি প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, টিলকের অনুরাগী ও গুপ্ত সমিতির উৎসাহদাতা ছিলেন। আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভা-নেত্রী অ্যানি বেসান্ত এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টিলকপন্থী, বিপ্লবীদের বন্ধু, রবীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি তাঁর নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঐ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ না করলে শুধুমাত্র সখারাম গণেশ দেউস্করের অনুরোধে কবিতাটি লিখতেন না। শরৎকুমার রায় রচিত 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' (১৯০৮) গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে লিখেছেন—

> মারাঠার ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্বোধনের সহিত জড়িত, সেই জন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।

অথচ বাংলাদেশে মহারাষ্ট্র-প্রত্যাগত তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী প্রবর্তিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'প্রতাপাদিত্য-উৎসব'কে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করা দূরে থাকুক তিনি তার বিরোধিতা করেন এবং সরলাকে ভৎর্সনা করেন। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী' ও 'প্রতাপাদিত্য'কে একপর্যায়ে দাঁড় করান নি। শিবাজীর রাষ্ট্রগঠনকে তিনি 'ধর্মরাজ্য' বলেছেন, হিন্দুরাজ্য নয়।

বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তার মনোবলকে ভেঙে দেবার জন্য জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জনের চক্রান্ত তখন শুরু হয়েছে। ১৯০১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা ও মাদ্রাজ ভাগ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। ১৯০৩ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব রিজ্‌লে কর্তৃক প্রকাশিত একটি সার্কুলারে বাংলাদেশকে ভাগ করার প্রস্তাব সুস্পষ্ট ভাষায় করা হয়। প্রস্তাবিত হয় যে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ সহ ঢাকা ও মৈমনসিং জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। ১৯০৪ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে হেনরি কটন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষে বলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে জুলাই মাসে লন্ডনে ভারত সচিব বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। তার প্রতিবাদে ৭ আগস্ট কলকাতায় বিরাট সভা হয়। ১৬ অক্‌টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ায় 'রাখীবন্ধন' উৎসব পালিত হল (৩০ শে আশ্বিন)। রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সংগীত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচনা করলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'।

এই পটভূমিকায় স্বভাবতই বাংলার 'প্রতাপাদিত্য' national hero বা জাতীয় বীর অ্যাখ্যা পেলেন। রাজপুতানার রাণাপ্রতাপের সঙ্গে মিলিয়ে প্রতাপাদিত্যের জয়গান করা হল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখলেন 'প্রতাপাদিত্য' নাটক (১৯০৩)। স্টারে অভিনীত হতে লাগল বিপুল দর্শক সমক্ষে। ক্লাসিক থিয়েটারে 'বঙ্গের শেষ বীর' অর্থাৎ 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে এই বাড়াবাড়ি অসহ্য হল। তিনি তাঁর প্রথম বয়সে 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসেই প্রতাপাদিত্যের চেয়ে 'বসন্ত রায়'কে বড়ো করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দস্যুবাল্মীকি, রাজপুরোহিত রঘুপতি ও রাজা প্রতাপাদিত্য সকলকেই কালীপূজক রূপে দেখিয়েছেন। শক্তির প্রতাপ বা প্রতাপের শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো সমর্থন করেননি। তাই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে—সে বৈষ্ণব বাউল, লোকধর্মনায়ক। তার চরিত্রে রয়েছে আত্মশক্তির বহ্নি, তাকে নির্বাপিত করতে পারে এমন রাজশক্তি কোথাও নেই।

১৯০৬ সালে জুন মাসে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় 'শিবাজী-উৎসব' পালিত হয়। ৫ জুন তারিখে টিলক বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে উচ্ছ্বসিত সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। বাংলার বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে সভাপতির পদের জন্য টিলকের নাম প্রস্তাব করেন। অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বন্দ্যোপাধ্যায় দাদাভাই নওরোজির নাম প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত নওরোজি সভাপতি হন। এই সময় টিলকের সঙ্গে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন কোনদিনই ঠিক করেন নি। বৃটিশ রাজশক্তির কাছে আবেদন-নিবেদনের থালাবহন নীতি সমর্থন করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি মডারেটদের সঙ্গে মিলতে পারেন নি। একস্ট্রিমিস্টদের পন্থাও তিনি পূর্ণ সমর্থন করেন নি। তবে তাঁর শ্রদ্ধা ও অন্তরের সমর্থন অনেকটাই টিলক অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি ছিল। তাই অরবিন্দের মামলার সময় তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার গ্রাহক হতে।[২০]

এই প্রসঙ্গে ১৩১৪ সালে (১৯০৭) পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষায় সভাপতির ভাষণটি উল্লেখ করা যেতে পারে।[২১] এই ভাষণে তিনি টিলক-পন্থী অর্থাৎ এক্সট্রিমিস্ট দল সম্পর্কে যে মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা উদ্‌ধৃত করার প্রয়োজন আছে—

> এক্‌স্ট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায় সে দলটা কোথায়। জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে সকলের চেয়ে বড়ো এবং মূল এক্সট্রিমিস্ট কে। চরমপন্থীত্বের ধর্মই এই যে একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিকে সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধহয় আর কখনও হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্যবেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ খড়্‌গহস্ত।...
>
> এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরম পন্থা নহে। ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই। এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীব ভাবে হইতে পারে? এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোনো শান্ত নীতি অবলম্বন করিলেন না, তিনি চরমের দিকে চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবলই দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন।... আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই, বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন, সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে—আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি। সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতি-বৃত্তিক্রিয়া যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন।...স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতে পারি না। বিদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্বল স্নায়ুতে সবল ভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তবে বড়ো কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এদিকে যখন কার্জন, মর্লি, ইবেটসন, গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিশ ও পুলিশ রাজকর্তা, নির্বাসন, জেল, বেত্রদণ্ড, দলন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যে এ যে ক্রমশই উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়েছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেইসঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে—প্রবল ভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এসবও আমাদের যায় নাই এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনও আমাদের মধ্যে তারা কাজ করিতেছে।

১৯১৭ সালে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে, টিলক বোম্বাইতে গঠন করেন 'ন্যাশনাল লীগ' এবং মাদ্রাজে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতাকামী আয়ারল্যান্ডের 'হোমরুল' আন্দোলনের অনুসরণে প্রতিষ্ঠা করেন 'হোমরুল' লীগ ১৯১৬। বেসান্ত ও টিলকের মধ্যে মতৈক্য ছিল। তাই বোম্বাই প্রবেশের অনুমতি পেলেন না, টিলকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তাঁকে দেওয়া হল না। ১৯১৭ সালে ১৬ জুন বেসান্ত তাঁর দুই সহকর্মী সহ অন্তরায়িত (interned) হলেন। রবীন্দ্রনাথ এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[২২] বাংলার বিপ্লবীগোষ্ঠী ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের সম্মেলনের সভাপতিত্বের জন্য বেসান্তের নাম প্রস্তাব করেন। মডারেটরা আপত্তি করেন। ফলে অভ্যর্থনা সমিতি ভেঙ্গে দুটি দল হল। মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, ফজলুক হক প্রভৃতির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতি হতে সম্মত হন এই শর্তে যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস বেসান্তকে সভানেত্রী মনোনীত করবেন। শেষ পর্যন্ত বেসান্ত সভানেত্রী হওয়ার রবীন্দ্রনাথ সরে আসেন ও রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। (এই সময়ে টিলকের রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত একটি টেলিগ্রাম বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র সদনে' রক্ষিত আছে)। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে নেতৃবর্গ কলকাতায় এলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' ভবনে তাঁদের 'ডাকঘর' অভিনয় দেখানো হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন টিলক, বেসান্ত, মদনমোহন মালব্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও গান্ধীজি। 'বিদায়-কালে টিলক রবীন্দ্রনাথের অভিবাদনযুক্তকর তাঁহার হাত দুখানির মধ্যে লইয়া কপালে ঠেকাইলেন'।[২৩]

স্যর ভালেন্‌টাইন চিরোল (Valentine Chirol) ১৯১০ সালে Indian Unrest নামে একখানি বই লেখেন। ঐ বইটিতে টিলকের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণ ও মন্তব্য টিলকের কাছে অবমাননাকর বলে মনে হয়। কিন্তু টিলক তখন বর্মায় [মান্দালয়ে] নির্বাসিত (১৯০৮-১৪)। ১৯১৫ সালে ১ অক্‌টোবর তারিখে টিলক চিরোলকে 'নোটিশ' দেন অবমাননাকর মন্তব্য-গুলিকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য। কিন্তু প্রত্যাহৃত না হওয়ায় লন্ডনে কিংস বেঞ্চে ১৯১৯ সালে ২৯ জানুয়ারি তারিখে মামলার শুনানি শুরু হয়। এ মামলায় টিলক পরাজিত হন। কিন্তু তাঁর এ পরাজয়ে তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নি। টিলক-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করা একান্ত দরকার। টিলক বৃটিশের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হবার পর কারাবাস ভোগ করে যখন বাইরে এলেন তখন নিজেকে মনে করলেন অশুচি। তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ ছিল। তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' করলেন হিন্দুধর্ম ও সমাজনির্দিষ্ট পন্থায়। রবীন্দ্রনাথের গোরা কারাদন্ড ভোগ শেষে 'প্রায়শ্চিত্ত' করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিল। গোরাও টিলকের মতো দেশপ্রেমিক, স্বধর্মগর্বী, লোক কল্যাণকামী ও তেজস্বী পুরুষ একথা মনে রাখতে পারি। রবীন্দ্রনাথ টিলকের 'প্রায়শ্চিত্ত' সমর্থন করেন নি। তিনি লিখলেন—

> তিলক রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন—সেখানে অনিবার্য রাজত্বের বিধানে তাঁহাকে দূষিত অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে, মাথা মুড়াইয়া গোঁফ কামাইয়া কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সমাজ তাঁহাকে আহবান করিতেছে। তিলক যে সত্য রাজদ্রোহী একথা কেহ বিশ্বাস করে না। এবং যদি বা করিত সেজন্য তাহাকে দণ্ডণীয় করিত না, কিন্তু যে অনিচ্ছাকৃত অনাচার তাঁহার সাধুচরিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই তাহাই তাঁহার পক্ষে পাপ এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তক মুণ্ডন![২৪]

এই সূত্রেই জোগ লিখেছেন—"Rabindranath Tagore put the issue in a nutshell when he observed : 'You do not purify the sacrificial fire or the sacred waters of the Ganges."[২৫]

টিলকের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ পুনায় যান। সেখানে 'সার্বজনিক সভা'য় তিনি লোকমান্য টিলক সম্পর্কে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[২৬] কাজেই ১৮৯৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত টিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল মানতেই হয়। এবং এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে স্বধর্মনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা দরিদ্রবান্ধব 'লোকমান্য' টিলক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ছায়া ফেলেছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অচলায়তন' প্রসঙ্গ

'অচলায়তন' নাটকখানির আখ্যানভাগ মূলতঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত Nepalese Buddhist Literature (১৮৮২) থেকে সংগৃহীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধসাহিত্য থেকে বহু আখ্যান রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাটকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য উপগুপ্ত-বাসবদত্তা, শ্যামা-বজ্রসেন প্রভৃতি কাহিনীকে তিনি নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মালিনী এবং অচলায়তনের আখ্যান রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

'দিব্যাবদানমালা'-র অন্তর্ভুক্ত 'পঞ্চক' কাহিনীতে পাই—

> একদা বিষণ্ণচিত্ত এক ব্রাহ্মণকে এক বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে তাঁর পত্নী আসন্নপ্রসবা এবং পূর্বজাত সন্তানগুলি মারা গেছে। এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবার আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ। বৃদ্ধা তাঁর পত্নীর প্রসবকালে তাকে সংবাদ দিতে বলল। যথাসময়ে পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে বৃদ্ধা ঐ শিশুটির মুখে মাখন পুরে তাকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে দাসীর হাতে দিয়ে বলল, একে বাজারের চৌমাথায় নিয়ে যাও এবং কোনো ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে দেখলে বলবে 'শিশুটি আপনাকে প্রণাম করছে'—তারপর সূর্যাস্ত হলে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। এবারে ছেলেটি বেঁচে গেল, নাম হল মহাপঞ্চক। তার পরের ছেলেটির নাম পঞ্চক রাখা হল। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর মহাপঞ্চক সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন এবং অবিলম্বে তিনি 'অর্হৎ' স্তরে উন্নীত হলেন। পঞ্চক নির্বোধ হল, কোনো শিক্ষাই লাভ করতে পারল না সেজন্য মহাপঞ্চক তাকে সঙঘারাম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পঞ্চক পথপার্শ্বে কাঁদতে লাগল—ভগবান বুদ্ধদেব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পঞ্চককে ডেকে নিলেন এবং জনৈক ভিক্ষুকে নির্দেশ দিলেন পঞ্চককে শিক্ষাদানের। সে-ও শীঘ্র 'অর্হত্ত্ব লাভ করল।

এই আখ্যানের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চক ও মহাপঞ্চককে দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চরিত্ররূপে দেখিয়েছিলেন। মহাপঞ্চক প্রাণের ধর্ম, রসের ধর্ম, আনন্দের ধর্মকে স্বীকার করতে চায় না। মন্ত্র, ও প্রথাসিদ্ধ ধর্মাচারকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। প্রাণের ধর্মের চেয়ে প্রথার ধর্ম বড়ো হয়ে উঠলে সেখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবেশ করে একজটা দেবী, কালঝণ্টি, মহাতামস ব্রত, আভিচারিক মন্ত্র লৌকিক-তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তাই তখন ধর্ম চলে গেল, ধর্মমোহ বড়ো হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ধর্মে বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে॥ —ধর্মমোহ, পরিশেষ

এরই পরিচয় অচলায়তনে ফুটেছে। এখানে তাই দেখতে পাই ধর্মমোহ নিয়ে এলো সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা। অচলায়তনিকদের সাধনার পথ অনুসরণের জন্য জনৈক শোণপাংশুর আগ্রহ হয়েছিল কিন্তু তাকে তার এই অপরাধের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল—

দাদাঠাকুর॥ কীরে এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন।
প্রথম শোণপাংশু॥ চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।
দাদাঠাকুর॥ কে মেরেছে।
দ্বিতীয় শোণপাংশু॥ স্থবির পত্তনের রাজা।
পঞ্চক॥ আমাদের রাজা? কেন মারতে গেল কেন।
দ্বিতীয় শোণপাংশু॥ স্থবিরক হয়ে উঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।
তৃতীয় শোণপাংশু॥ আগে এদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।
চতুর্থ শোণপাংশু॥ আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

মনে হয় এই অংশ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত (অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত অংশ) রামচন্দ্র শম্বুক কাহিনীর 'সংস্কার' ছিল। অনার্য শম্বুক আর্যনির্দিষ্ট সাধনায় ব্রতী হয়েছিল বলে রামচন্দ্র সেই শম্বুককে বধ করেন। কেননা, শম্বুকের তপস্যা ব্রাহ্মণ তনয়ের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই ঘটনা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে সুকৌশলে 'অচলায়তন' নাটকে বসিয়েছেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। শম্বুক বধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে, শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। —ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকভেদ, বর্ণভেদকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নিন্দা করেছেন। আমাদের সমাজের 'তথাকথিত' নিম্নবর্ণকে, সেই শক্তিমান সম্প্রদায়কে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করা যে ধর্মেরই অবমাননা সকথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার মুক্তকন্ঠে ঘোষণা করেছেন—

এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটি ঘুড়ি পড়িয়াছিল। সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। —ধর্মের অধিকার

এই সূত্রে 'অচলায়তন' নাটকের নামগুলির রূপক ব্যাখ্যা আলোচনা করা যেতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় অচলায়তন যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সে রাজ্যের নাম 'স্থবির পত্তন', রাজার নাম 'মন্থরগুপ্ত' তাদের পরিচয় 'স্থবিরক'। অচলায়তন, স্থবির পত্তন, মন্থরগুপ্ত ও স্থবিরক নাম চারটি পাশাপাশি রাখলেই এদের অন্তর্নিহিত ভাব-ঐক্যটি ধরা পড়ে। ধর্ম ও প্রাণের বেগ এখানে স্থবির ও মন্থর, তার মধ্যে সচল জীবন ও ধর্মের স্রোতস্বিনীরূপ নেই। তাই কবি লিখেছেন—

যে নদী হারাতে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ' পারে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

এবং সেখানে 'তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথকে' গ্রাস করে। অচলায়তনে তাই ঘটেছে। সেজন্যেই অচলায়তন, স্থবির পত্তন, মন্থরগুপ্ত প্রভৃতি নাম নির্বাচন করা হয়েছে।

শোণপাংশুর অর্থ যারা গায়ে গেরুয়া মাটি মাখে। কিন্তু সে-অর্থ এখানে নয়। শোণ পুষ্পের রং লাল। লাল রঙের মধ্যে ভাঙনের, ধ্বংসের ইঙ্গিত আছে। তাই শোণপাংশুদের হাতে অস্ত্র, মাথায় লাল টুপি। তারা নিরীহ অহিংস নয়।

মহাপঞ্চক ॥ তোমার পশ্চাতে ও অস্ত্রধারী কারা ?
দাদাঠাকুর ॥ এরা আমার অনুবর্তী—এরা শোণপাংশু।
সকলে ॥ শোণপাংশু।
মহাপঞ্চক ॥ এরাই তোমার অনুবর্তী ?
দাদাঠাকুর ॥ হাঁ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাপঞ্চক ॥ এই মন্ত্রহীন, কর্মহীন ম্লেচ্ছদল।

* * *

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলাটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

শোণপাংশুদের মধ্যে শুধু যে আমাদের দেশের অন্ত্যজ বর্ণিত অথচ শক্তিমান কর্মবীর জন-সম্প্রদায়ের কথা আছে তাই নয় তারা ভাঙনের দুর্বার শক্তি। অফুরন্ত প্রাণের বন্যা 'ম্লেচ্ছ' শব্দটির মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের প্রচণ্ড গতিধর্মী শক্তির কথাও বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির' কবিতায় যে কর্মযোগী শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মহিমা উদ্‌গীত হয়েছে শোণপাংশুদের ভূমিকা সে প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'দর্ভক' শব্দের অর্থ কোমল তৃণ। চৈতন্যদেবের রচিত বলে স্বীকৃত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে সংকলিত 'শিক্ষাষ্টক' পর্যায়ের শ্লোকে 'বৈষ্ণব-লক্ষণ' পাই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা
অমানিনা মান দেয়ঃ কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"

তৃণের চেয়েও নত হবে চৈতন্যদেবের নির্দেশিত এই বৈষ্ণব-লক্ষণই বোধ হয় দর্ভক নামের পিছনে বিদ্যমান। এই দর্ভকেরা অন্ত্যজ, পতিত জাতি। চৈতন্যদেব তাঁর যুগে এই স্পর্ধিত ঘোষণা করেছিলেন—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ"

এই দর্ভকদের পল্লীতে গুরু এসেছেন দাদাঠাকুর বেশে নয় 'গোঁসাই'-এর বেশে। দাদাঠাকুর আচার্যের গুরু, শোণপাংশুদের 'সকল কাজের কাজি' আর দর্ভকদের 'গোঁসাই'। দর্ভকেরা বলে আমরা শাস্ত্র জানি না, আমরা নাম গান করি।

এই সহজ 'অহেতুক' ভক্তি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ-পতিসর অঞ্চলে পদ্মা ইছামতী বিধৌত জগতে বাসকালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন এই বৈষ্ণব-বাউলদের আনন্দময় সাধনা। লালনশাহ ফকির ছাড়াও জগা কৈবর্ত, গগন হরকরা সকলেই সমাজের প্রচলিত আচার-বিচার প্রথা থেকে দূরে আনন্দময় ভক্তির সাধক। জগা কৈবর্ত ও গগন হরকরা কেউই উচ্চবর্ণের হিন্দু নন।

'গুরু'র রূপ অচলায়তনের পূর্বে এমন ভাবে আমরা পাইনি। শারদোৎসবের রাজ-সন্ন্যাসী বা ঠাকুরদা কিম্বা ডাকঘরের ঠাকুরদার সঙ্গে তার মিল নেই। এখানে তিনি 'মানবযাত্রী', ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে, শস্ত্রপাণি হয়ে এসেছেন অচলায়তনকে ভেঙে নবজীবনের মন্দিরে পরিণত করবার জন্যে। নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১-০২) এর সূচনা ছিল—

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। —প্রার্থনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাদাঠাকুর অচলায়তন ভাঙতে এলেন যোদ্ধবেশে। সেখানে তিনি কঠোর ও নির্মম, অন্যায় ও অধর্মের বিলোপ সাধনে বজ্রমুষ্টি।

মহাপঞ্চক ॥ তুমি গুরু? তবে এই শত্রু বেশে কেন?

দাদাঠাকুর ॥ এইতো আমার গুরুর বেশ। তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

—তাই গুরুর অনুবর্তী শোণপাংশুরা অচলায়তনের যে দেয়াল ভেঙে দিয়েছিল সে ভাঙন বিনা রক্তপাতে হয়নি।

দাদাঠাকুর ॥ ওই ভিতের উপর কাল দুপুররাতে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গেছে।

'অচলায়তন' প্রকাশিত হলে এর বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন সংযত অথচ দৃপ্ত ভাষায়। এই সময় শ্রীযুত অমল হোম মহাশয়কে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন—

> অচলায়তন নিয়ে বাংলাদেশে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রমহলেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখছি। তোমার ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের বোলো যে ভারতের ধর্মসাধনকে ছোট করার জন্য শোণ-পাংশুদের বড় করা হয়েছে একথা ভুল। ধর্মের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।
>
> অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই অস্বীকার করিনি—আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই, কিন্তু সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি। প্রাচীনের জয় ঘোষণার করতালি আজ আমার পক্ষে কঠিন নয়, একদিন তা পেয়েওছি; কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছড়িয়ে প্রিয় হতে চাইনে—আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত যত দুঃখই পাই না কেন।

কিন্তু তবুও মহাপঞ্চক চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ আপোষপন্থী হয়েছেন। মহাপঞ্চক চরিত্রটিকে প্রথাবদ্ধ, আচারসর্বস্ব ধর্মদর্শের প্রতীক রূপে দেখালেও, তাকে গুরুর কাছে নত করালেও, অচলায়তনকে ভেঙে দিলেও গুরুকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন মহাপঞ্চককে শোণপাংশুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা সহকারে আধ্যাত্মিক চির-জীবন লাভের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম' এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃতরসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন… কিন্তু হঠাৎ দ্বারভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত রয়ে গেল।

অনেকে মহাপঞ্চককে আহ্বানের ব্যাখ্যা হিসাবে নূতন ও পুরাতনের এই অংশকে উৎকলন করেছেন কিন্তু মহাপঞ্চক কি প্রাচীন ভারতের ধর্মসাধনা বা বা প্রাণসাধনার যথার্থ প্রতীক? তার মধ্যে কি কোথাও মৈত্রেয়ী-প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে? সে নিষ্ঠাবান, কিন্তু বিকৃত, পুঁথিসর্বস্ব ধর্মের প্রতিভূ মাত্র। সে কালঝণ্টি দেবীর কাছে চণ্ডবলির সমর্থক, একজটা দেবীর পূজক, মহাতামস ব্রত পালনের নির্মম রক্ষক। এখানে রবীন্দ্রনাথ আংশিকভাবে সংস্কারবাদকেই সমর্থন করেছেন। ররীন্দ্রনাথ অবশ্য দাদাঠাকুরের বকলমে মহাপঞ্চকের 'দৃষ্টি' খুলে যাবার কথা বলেছেন। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ বইয়ের মধ্যে আছে কি? সে কৃচ্ছ্রসাধন জানে, যোগ-প্রাণায়াম জানে কিন্তু মৈত্রেয়ী সাধনার ব্যাকুলতা তার মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই—সে নব-আয়তন গঠনের ডাকে সাড়াও দেয় নি—

> সঞ্জীব ॥ মহাপঞ্চক দাদা, তুমিও এসো না।
> মহাপঞ্চক ॥ না, আমি না।

মহাপঞ্চকের এই প্রত্যাখ্যান মর্যাদাভ্রষ্ট ক্ষুব্ধ মানুষের মনোভাব মাত্র।

কাজেই অচলায়তনে আচার্যের জ্ঞান, শোণপাংশুর কর্ম ও দর্ভকের ভক্তির সম্মিলনের কথা থাকলেও মহাপঞ্চকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আয়ার্ল্যাণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ

আয়াল'্যাণ্ড ও বঙ্গদেশ পরস্পর বহু দূরবর্তী কিন্তু বৃটিশ শাসন ও শোষণের দিক থেকে, স্বাধীনতার ও সংস্কৃতির আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা খুব কাছাকাছি। ভাবতে আনন্দ হয় 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' রামমোহন রায় তাঁর সম্পাদিত (১৭৭২-১৮৩৩) ফার্সি ভাষার 'মিরাৎ-উল্-আখবার' পত্রিকার ১১ অক্টোবর, ১৮২২ সংখ্যায় আয়াল'্যাণ্ডে বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করেন।[১] সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির নাম 'আয়াল'্যাণ্ড : তার দুর্দশা ও নৈরাশ্যের কারণ'। রচনাটির গোড়ায় দ্বীপময় দেশটির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। তারপর রামমোহন লিখেছেন—

> ইংলণ্ডের রাজারা ন্যায় বিচারের দিকে চক্ষু মুদে বসে আছেন, জমির আইরিশ মালিকদের জমি কেড়ে নিয়ে নিজেদের 'পরগাছা'দের দান করে দিয়েছেন।

আইরিশদের অসন্তোষের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐ রচনাটিতে বলা হয়—

> এই দ্বীপের অধিবাসীরা সবাই খ্রীস্টান হলেও তারা ইংলণ্ডের চার্চের [প্রোটেস্ট্যাণ্ট] কাছে নতজানু হতে অনিচ্ছুক কেননা তারা মহামান্য পোপের নির্দেশের অনুগামী [রোমান ক্যাথলিক]। তাদের নিজেদের ধর্মাচরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের ভূমি রাজস্ব থেকে মেটে না, অথচ ইংলণ্ড কর্তৃক প্রেরিত ইংরেজ প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজকদের বৃত্তি আইরিশ ক্যাথলিকদেরই যোগাতে হয় 'কর' (ট্যাক্স) প্রদানের দ্বারা।

রচনাটির শেষে কবি শেখ সাদীর কবিতা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে প্রজাবর্গের মঙ্গলের কথা ভাবতে। রামমোহন বলেছেন 'ক্যাথলিকদের মুক্তি' ('Catholic Emancipation') আয়াল'্যাণ্ডের জনসাধারণের একটি মৌলিক অধিকার এবং এই দাবি পূরণ করা শাসকগণের অবশ্যকর্তব্য।

এর পাঁচ বছব পরে (১৮২৭) 'জুরী অ্যাক্ট' কার্যকর হয়। এর প্রতিবাদে রামমোহন মি. জে. ক্রফোর্ডকে এক পত্র লেখেন যেন হিন্দু ও মুসলমান আবেদনকারীদের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ-পত্র বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশনে পেশ করা হয়। কেননা উক্ত জুরী প্রথায় কোনো হিন্দু বা মুসলমানের 'গ্রাণ্ড জুরী'তে আসন পাবার উপায় নেই। সে অধিকার আছে একমাত্র খ্রীস্টানদের, এমন কি সে যদি 'কালা আদমী' হয় তা হলেও। এই সূত্রে রামমোহন আয়াল'্যাণ্ড ও ভারতের তাৎপর্যময় উল্লেখ করেছেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

It should not be lost sight of, that the position of India is very different from that of Ireland, to any quarter of which an English fleet may suddenly convey a body of troops that may force its way in the requisite direction and succeed in suppressing every effort of a refractory spirit. Were India to share one-fourth of the knowledge and energy of that country, she would prove from her remote situation, her riches and her vast population, either useful and profitable as a willing province, *an ally of the British Empire or troublesome and annoying as a determined enemy.*

(১৮ অগস্ট, ১৮২৮)

এই পত্রে বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভবিষ্যতে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার ও তার ফলে স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা সংক্রান্ত কথাও আছে।[২] এই পত্র প্রেরণের তিন বৎসর পর বৃটিশ পার্লামেন্টে 'রিফর্ম বিল' পাশ হয়, রামমোহন তখন বিলেতে। এর অনুরূপ বিধান রচিত হয় আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের জন্য। 'রিফর্ম বিল'গুলি পাশ হওয়ায় গভীর আনন্দ ব্যক্ত করে তিনি উইলিয়ম রাথবোনকে লেখেন, এই ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি দেখেছেন "The salvation of the nation, nay of the whole world".

আয়ার্ল্যান্ডে বৃটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে রামমোহনের কঠোর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে অজ্ঞাতনামা বন্ধুকে লিখিত একটি পত্রে। সেখানে তিনি বলেছেন—

In justice to my conscience and feelings I cannot express approbation of the Irish Coercion bill and its authors and supporters.[৩] (১৯ মে ১৮৩৩)

রামমোহনের পর দ্বারকানাথের প্রসঙ্গ আসে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৫ সালে দ্বিতীয় বার বিলেতে যান। অগস্ট মাসের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি আয়ার্ল্যান্ড পরিদর্শন করেন। ঐ সময়ে তিনি আইরিশ নেতা ডানিয়েল ও' কোনেল-এর (১৭৭৫-১৮৪৭) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

They discussed their common problems as subjects of foreign rule; but when O' Connell saw the solution as independence, Dwarakanath looked forward to a stronger union based on racial and religious equality.[৪]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আয়াল'্যাণ্ডে একবার দুভি'ক্ষের সময় দ্বারকানাথের সাহায্যের কথা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (২৫ অগস্ট, ১৮৪২) পত্রিকা থেকে জানা যায়।

এর বহুকাল পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন পড়াশোনার জন্য বিলেতে ছিলেন (১৮৭৮-৭৯) একদিন তিনি পাল'ামেণ্টের অধিবেশনে দর্শ'করূপে উপস্থিত হন। তিনি একখানি পত্রে লিখেছেন—

> আমরা যখন গেলেম তখন O' donnel নামে একজন Irish member ভারত সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। Press Act-এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Irish member-রা House-এ অত্যন্ত অপ্রিয়—তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেলো।[৫]

O'donnel আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জুলুদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যদের অত্যাচারেরও নিন্দা করেন এবং প্রশ্ন তোলেন এই ধরনের অত্যাচার কি খ্রীস্টানদের অনুচিত নয় ?

ঐ পত্রেই রবীন্দ্রনাথ জানান "আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বারদের প্রতি টান।" রবীন্দ্রনাথ পার্লামেণ্টের ঐ অধিবেশনেই শোনেন আইরিশ হোমরুল বিল নিয়ে গ্লাডস্টোন ও জন ব্রাইটের বক্তৃতা। এইসূত্রে ও' ডোনেল-এর সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তের উল্লেখ আলোচনা করা যেতে পারে। রমেশচন্দ্র বিলেত থেকে তাঁর দৌহিত্রী সুষমাকে লিখেছেন—

> I have given to hard work and politics. I have seen all who could help us in our India matters—not only Hume and Sir Henry Cotton and O' donnell and Gokhale who have been doing their utmost—but also the Indian Secretary John Morley.[৬]

দেখা যাচ্ছে রামমোহন ভাবছেন সেই ১৮২২ সালে আয়াল'্যাণ্ডে বৃটিশ-সৃষ্ট দৈন্য-দুর্দ'শার কথা, তেমনি ও' ডোনেল ভারতে ১৮৭৮ সালে লর্ড' লিটন প্ররোচিত 'ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। নিজেরা ইংরেজদের দ্বারা বঞ্চিত ও উৎপীড়িত বলেই আইরিশরা ভারতবাসী ও আফ্রিকার জুলুদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। লর্ড' লিটনের এই অ্যাক্ট রচিত হয়েছিল ১৮৭০ সালের Irish Coercion Act-এর মডেলে। আইরিশদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে খর্ব' করবার জন্য তাঁদের ছাপাখানা এবং মুদ্রণের সমস্ত যন্ত্রপাতি এমন কি কাগজ-কালি পর্য'ন্ত দখল বা বাজেয়াপ্ত করবার ক্ষমতা ঐ অ্যাক্টে সরকারকে (বৃটিশ) দেওয়া হল। যদি কদাচ সতর্ক'বাণী লঙ্ঘিত হয় তাহলে সরকার 'ওয়ারেণ্ট' বলে ছাপাখানায় ঢুকে সার্চ' করতে পারবে। আদালতের আশ্রয় না নিয়েও সরকার তার খুশিমত ব্যবস্থা নিতে পারবে। এর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিন বছর আগে ১৮৬৭তে 'ফেনিয়ান বিদ্রোহ' ঘটে যার নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে 'ম্যানচেস্টারে' ফাঁসি দেওয়া হয় সে কথা এই সূত্রে স্মরণীয়।

ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডের যে-অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৭৯৮ সালে তারই জের চলেছিল ১৮০৩ সালে রবার্ট এমেটের প্রাণদণ্ডে। ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—

> I acted as an Irishman, determined on delevering my country from this doubly-riveted despotism I wished to place her independence beyond the reach of any power on earth.

এই সংগ্রামের ধারা নানারূপে বহমান ছিল।

আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে বিংশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮) চলাকালীন অ্যানি বেশান্ট (১৮৪৭—১৯৩৩) 'অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগ' স্থাপন করেন (সেপ্টেম্বর ১৯১৬)। মনে রাখতে হবে অ্যানি বেশান্ট ছিলেন আইরিশ দুহিতা।[৭] ১৮৯৩ সালে ১৬ নভেম্বর তিনি ভারতে আসেন। বেশান্ট 'হোমরুল'-এর পক্ষে যে-প্রচার শুরু করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার তাকে বরদাস্ত করেন নি, অতএব তিনি 'ইনটার্নড' বা অন্তরীণ-পাশে আবদ্ধ হলেন। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ও রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রকাশ্যসভায় পড়লেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ (১১ অগস্ট ১৯১৭)। পরে তিনি ইংলণ্ড-বাসীদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি' ('open letter') 'The Internment of Mrs. Besant' প্রকাশ করলেন বেশান্টের পক্ষ নিয়ে (The Bengalee, 7th Sep, 1917)। বেশান্ট স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের সমধর্মী সংস্থা গড়ে ওঠে বালগঙ্গাধর টিলকের (১৮৫৬-১৯২০) হাতে কয়েক মাস আগে (এপ্রিল ১৯১৬)। বেশান্ট যে National University স্থাপন করেন তার প্রথম 'চ্যান্সেলর' বা আচার্য হন রবীন্দ্রনাথ (১৯১৭); হোমরুল সংস্থার প্রেরণাস্থল অবশ্যই আইজাক বাট (Isaac Butt) স্থাপিত 'হোমরুল অ্যাসোসিয়েসন' (স্থাপন বর্ষ ১৮৭০)। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার অর্জন। চার্লস্ স্টুয়ার্ট পার্নেল (১৮৪৬—৯১) 'হোমরুল কনফেডারেশন'-এর সভাপতি হন ১৮৭৭ সালে। নিয়মতান্ত্রিক শাসনের পক্ষপাতী হলেও তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে ১৮৮১ সালে ১৭ অক্টোবর তারিখে গ্রেফ্তার হন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃষকদের 'no rent' আন্দোলন জোরদার করতে বলেন যতদিন না, ব্রিটিশ সরকার আয়ার্ল্যাণ্ডে আইরিশদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেন। মনে রাখতে হবে ১৮৭৯ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রবল শস্যহানিও ঘটে। পার্নেলের এই পন্থাকে অরবিন্দ ঘোষ 'passive resistance' বলেছেন।[৮] টিলকও মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে (১৮৯৬—৯৭) কৃষকদের কাছে 'no rent'-এর ডাক দিয়েছিলেন। তাঁরও প্রেরণা পেয়েছিলেন পার্নেলের 'no rent' আন্দোলন থেকে।[৯]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর এক আইরিশ দুহিতা মার্গারেট নোবল্ (১৮৬৭-১৯১১) স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা 'নিবেদিতা' নামে দীক্ষিতা হন, তিনি অরবিন্দ ঘোষ পরিচালিত বিপ্লবীগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।[১০] সেজন্য স্বামীজির তিরোধানের (১৯০২) পরই তিনি বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, এরকম বক্তব্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ করতে হয়েছিল। বৃটিশ-বিরোধী ভারতপ্রাণা 'নিবেদিতা'র আদলে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'কে আইরিশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রচনা করেন 'লোকমাতা নিবেদিতা' প্রবন্ধ।

আইরিশ হোমরুল আন্দোলন থেকে পৃথক-অস্তিত্ব বিপ্লবীসংস্থা 'ফেনিয়ান দল' গঠিত হয় ১৮৬০ সালে। তাঁরা বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব বা স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করেন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৭৭৫-৮২) ও ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) থেকে। তাঁরা যে-যে অভ্যুত্থান ঘটান সেগুলিকে বৃটিশ রাজশক্তি পশুবলে দমন করেন ১৮৬৭ ও ১৮৮৩ সালে। বহু যুবক ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেন। এসব ঘটনা মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব বা বঙ্গদেশে অশ্রুত ছিল না। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের র্যাণ্ড ও আয়ারস্টকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা ফেনিয়ানদের মনে পড়ায়। তখনো 'সিন্ফিন্' দল গড়ে ওঠেনি। মদনলাল ধীংড়া (১৮৮৭-১৯০৯) বিলেতে স্যর কার্জন উইলিকে ১৯০৯ সালে ১ জুলাই গুলি করে হত্যা করেন। ১৭ অগাস্ট তাঁর ফাঁসি হয়। আইরিশ বিপ্লবীদের পত্রিকায় এই আত্মবলির প্রশংসা করা হয়। 'সিন্ফিন্' শব্দটির অর্থ 'We ourselves alone'। এই দলের প্রথম দিকে যাঁর প্রভাব কার্যকর ছিল তিনি হলেন অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ফ্রানসিস্ ডিক্ (Francis Deak); তাঁর পন্থা ছিল রক্তপাতহীন বিপ্লব passive resistance-এর মধ্য দিয়ে।[১১]

কিন্তু ফেনিয়ানদের সংগঠনের প্রসঙ্গে আমেরিকা-প্রত্যাগত স্টিফেন্সের (১৮২৪-১৯০১) স্থাপিত 'দি ফেনিয়ান ব্রাদারহুড' (১৮৫৮) ও তাঁর দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা 'দি আইরিশ পিপল্' (১৮৬৩)-এর ভূমিকা স্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক থেকে। ১৮৬৫ সালে গ্রেফতার হবার সময় তিনি বলেন—

> I do not recognize British law—its right or even its existence in Ireland. I defy and despise any punishment it may inflict.

তখন মনে পড়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) কথা। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে তাঁর সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় রাষ্ট্রদ্রোহী রচনার জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। তিনিও উপস্থাপিত অভিযোগের প্রত্যুত্তরে অনুরূপ বলিষ্ঠ উক্তি করেছিলেন। দণ্ডলাভের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই 'ফেনিয়ান ব্রাদারহুড' দলের সভ্যদের গুপ্ত শপথ নিতে হতো। এই দল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীভুক্ত আইরিশ সৈন্যদের মধ্যে গোপনে কাজ করে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাদের দ্বারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটাতে চায়। পনের হাজার আইরিশ সৈন্য রাজি ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। অনুরূপ পরিকল্পনা করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫) এবং তিনিও লাভ করেন একই ব্যর্থতা। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই বিদ্রোহ ঘটবার কথা ছিল।

'সিন্‌ফিন্‌' দলের প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয় ১৯০৫ সালে, যদিচ এই সংগঠন ১৯০০ সাল থেকে নিজেদের প্রস্তুতি-পর্ব গড়ে তুলেছিল। হাঙ্গেরীর জার্মান অর্থনীতিবিদ্‌ ফ্রেডারিক লিস্‌ট (Frederick List) দলের মতবাদ গঠনে সহায়তা করেন। 'সিন্‌ফিন্‌' দলের মূল সংগঠক আর্থার গ্রিফিথস্‌ হোমরুল আন্দোলনের পরিণতিতে নৈরাশ্য বোধ করেন। নিজে 'ইউনাইটেড আইরিশম্যান' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন (১৮৯৯) ও আইরিশদের নতুন করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও বৃটিশ-পণ্য বয়কটের দ্বারা বৃটিশ-বিরোধী করে তুলতে থাকেন।[১২] ১৯০৫ সালে 'সিন্‌ফিন্‌' দলের প্রথম অধিবেশনে তিনি বলেন—

> Our policy, in a word, is to lead our people to reliance in themselves and to establish in Ireland's Capital a national legislature endowed with the moral authority of the Irish nation.
>
> If we place our duty to our country before our personal interests, and live not each for himself but each for all, the might of England cannot prevent our ultimate victory.

তৎকালীন 'সিন্‌ফিন্‌' দলের চেয়ে চরমপন্থায় অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন 'দি আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' দল। তাঁরা তাই নতুন পত্রিকা বার করলেন 'আইরিশ ফ্রিডম্‌' (১৯১০)। তাঁদের আদর্শ ছিলেন আইরিশ বিদ্রোহের শহীদ উল্‌ফটোন (১৭৬৩-৯৮)। ১৭৯৮ সালে আইরিশ স্বদেশপ্রেমী বিপ্লবীরা যে বিদ্রোহ ঘটান সেই বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ, বঙ্গদেশে প্রজাস্বার্থ-বিরোধী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) যিনি প্রবর্তক। ভারতে তিনি আসেন ১৭৮৬ সালে, পরে যান আয়ার্ল্যাণ্ডে। বিদ্রোহীদের নেতাদের ধরে-পাকড়ে হত্যার নির্দেশ দেন। বিপ্লবী উল্‌ফটোন-হত্যা তারই দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে কন্‌গ্রেসে যাঁরা মডারেট বা 'নরমপন্থী' ছিলেন যেমন রাসবিহারী ঘোষ, প্রকাশ্যে তিনি এক্‌স্ট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী বলে পরিচিত টিলক, অরবিন্দ প্রভৃতিকে 'সিন্‌ফিন্‌' আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 'স্বদেশী' আন্দোলনের এক অংশ গুপ্তহত্যা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি (১১ অগাস্ট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৯০৮) প্রভৃতি রুদ্রপন্থা রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল, তিনি নিজেকে কিছু পূর্বেই সরিয়ে নিয়েছিলেন আন্দোলন থেকে। কিন্তু 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতায় তিনি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করলেন 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' কারারুদ্ধ দেশকর্মী অরবিন্দের প্রতি।[১৩] একটি কথা এই সূত্রে মনে রাখতে হবে যে সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বিশিষ্ট বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে আয়াল'্যান্ডে যান ও আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সিন্‌ফিন্‌রা ও আইরিশ ব্রাদারহুডেরা হোমরুল দাবি বর্জন করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শুরু হতে আপৎকালে 'আইরিশ হোমরুল অ্যাক্‌ট' পাশ হয়। এর আগে ১৮৮৬ ও ১৮৯৩ সালে এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি। গ্ল্যাডস্টোন চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে এবার হোমরুল অ্যাক্‌ট পাশ হলেও এর কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয় যুদ্ধের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে। ফলে আয়াল'্যান্ডে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৯১৪ সালে ৪ অগাস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। এই অগাস্ট মাসে 'আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' এক সভায় প্রস্তাব নেয়—

> There must be an Irish insurrection before the end of England's war[১৪]

আইরিশ বিপ্লবীরা, সিন্‌ফিন্‌রা 'শত্রুর শত্রু' জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য চেয়েছিল এবং আশা করেছিল পেয়ে যাবে। স্যর রজার কেজমেন্ট (Sir Roger Casement) ছিলেন আলস্টারের প্রোটেসট্যান্ট পরিবারের ছেলে, প্রাকতন ব্রিটিশ কন্‌সাল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার তিনি ছিলেন 'দি আইরিশ ভলান্‌টিয়াস'' (১৯১৩) বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।[১৫] ঘোর ব্রিটিশ-বিরোধী কেজমেন্ট ১৯১৪ সালে 'আইরিশ ভলান্‌টিয়াস'' দলের প্রতিনিধি হিসেবে জার্মানীতে ছিলেন। তিনি জার্মানী থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তাছাড়া যে-সব আইরিশ সৈন্য যুদ্ধবন্দী রূপে জার্মানীতে ছিল তাদের নিয়ে 'আইরিশ ব্রিগেড' গঠনের প্রয়াস পান। তিনি চেয়েছিলেন এই 'ব্রিগেড'কে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে জার্মান সরকার আয়াল'্যান্ডে পাঠান। কেজমেন্ট খবর পান ২৩ এপ্রিল ইস্টার রবিবারে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হবে। তিনি আয়াল'্যান্ডে একটি জার্মান ডুবো জাহাজ থেকে নামামাত্র গ্রেফতার হন। জার্মান জাহাজ 'লুবেক' (Lubek) ৯ এপ্রিল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা হয়েছিল কিন্তু ২১ এপ্রিল ইংরেজের যুদ্ধ জাহাজ গোপনসূত্র থেকে খবর পেয়ে তাকে কোণঠাসা করে ফেলে এবং জাহাজের ক্যাপটেন নিজেই জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়।

এই সময়ে বার্লিনে 'স্বাধীন ভারত কমিটি' গঠিত হয় মহেন্দ্রপ্রতাপ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজির ভ্রাতা) বরকতউল্লাহ ও ওবেদুল্লাসিন্ধীদের নিয়ে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বঙ্গদেশের বিপ্লবীরাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানী থেকে প্রেরিত অস্ত্রের আশায় বসে ছিলেন। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "ম্যাভেরিক' 'অ্যান লারসেন' মাল আনবে ঠিক থাকে।…কিন্তু ফরাসী আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিভাগ আমেরিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়।…'ম্যাভেরিক' ধরা পড়া যখন অবধারিত দেখে তখন কাগজপত্র ও সামান্য যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সে-সব সমুদ্রজলে ফেলে দিয়ে জাভায় চলে যায়। সেখানে ডাচেরা লোকজনসুদ্ধ জাহাজটিকে অবরুদ্ধ করে। 'লারসেন' ভারতে পৌঁছতে পারেনি। জর্মান জাহাজ থেকে অস্ত্রসংগ্রহের ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত যতীন মুখার্জি ('বাঘা যতীন') বীরের মতো লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন বালেশ্বরে বুড়ীবালামের তীরে (৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)[১৬]

যে 'insurrection'-এর প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯১৪ সালে ৪ অগাস্ট তারিখে তার কার্যকর বিস্ফোরণ ঘটল ১৯১৬ সালে 'ইস্টার মনডে'র দ্বিপ্রহরে (Monday, 24th April) ডাবলিন শহরে। জেনারেল পোস্ট অফিস দখল করার পর তাই হয়ে দাঁড়াল প্যাট্রিক পিয়ার্স, জেমস কনোলি প্রভৃতি বিপ্লবী নেতাদের প্রধান যুদ্ধ ঘাঁটি। আদালত, রেলওয়ে স্টেশন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন বিধ্বস্ত করা হল। 'ম্যাগাজিন ফোর্ট' বা অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হল। ছয়দিন ধরে বিপ্লবীরা আয়ার্ল্যাণ্ডের বিরাট অংশকে 'স্বাধীন' করে রেখেছিল। পিয়ার্স ঘোষণা করলেন—

> Irish men and Irish women: In the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nation hood Ireland, through us, summous her children to her flag and strikes for her freedom.[১৭]

সূর্য সেনের নেতৃত্বে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতির পরিচালনায় ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় ১৮ এপ্রিল রাত্রে, গুডফ্রাইডের ঠিক আগে। অনন্ত সিং জানিয়েছেন তাঁরা এইক্ষেত্রে ১৯১৬ সালের আইরিশ ইস্টার বিদ্রোহকে অনুসরণ করেছিলেন। আইরিশ ইস্টার বিদ্রোহ-জাত এক সপ্তাহের 'স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ড' শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সৃষ্ট চারদিনের 'স্বাধীন চট্টগ্রাম'ও জালালাবাদের যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। ডাবলিনের জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জেমস কনোলি, প্যাট্রিক পিয়ার্স প্রভৃতি আত্মসমর্পণ করেন—নিরপরাধ মানুষ যাতে পাশবিক নিষ্পেষণ থেকে অব্যাহতি পায়। পিয়ার্স, জেমস কনোলি, টমাস কেণ্ট, জন ম্যাকব্রাইড, এডওয়ার্ড ড্যালি প্রভৃতিকে পর-পর গুলি করে হত্যা করা হয়; পোলিশ মহিলা-বিপ্লবী কনসট্যানস জর্জিয়ানা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মার্কিয়েভিচ (Constance Georgina Markievicz), এমোন ডি ভ্যালেরা প্রভৃতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ধরা দেবার পূর্বে এই মহিলা তাঁর রিভলবারকে সাশ্রু চুম্বন করেন। এই সূত্রে মনে পড়ে যায় চট্টগ্রামের বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওহদেদারের, কল্পনা দত্তের (যোশী) কথা।

উইলিয়ম্ বাটলার য়েটস্ (১৮৭১-১৯৫৭) আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ইস্টার বিদ্রোহের পর যখন বিপ্লবীদের গুলি করে মারা হলো, নির্যাতন-নিষ্পেষণের সীমা রইল না, তাকে নিয়ে য়েটস্ রচনা করেছিলেন তাঁর কবিতা—Easter 1916—(২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬)

Now that I am old and ill
Turns into a question till
I lie awake night after night
And never get the answers right
Did that play of mine send out
Certain men the English shot ?

এখানে য়েটস্ তাঁর একাঙ্ক নাটক 'ক্যাথলিন্ নি হউলিহান' (১৮৯৮)-এর প্রসঙ্গ করেছেন। আইরিশ মরমিয়া কবি নাট্যকার ও সমবায়কর্মী জর্জ উইলিয়ম রাসেল (১৮৬৭-১৯৩৫) যিনি A. E. নামে পরিচিত, কায়মনোবাক্যে দেশব্রতী তবে হিংসাত্মক ও রুদ্রপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তিনি আত্মবিসর্জিত বীরদের উদ্দেশে লিখেছিলেন—

Their dream had left me numb and cold
        But yet my spirit rose in pride,
Refashioning in burnished gold
        The images of those who died
Or were shut in the penal cell
Here's to you Pearse, your dream not mine
But yet the thought for this you fell
Has turned life's waters into wine.

—(Salutation)[১৮]

আমাদের মনে রাখা দরকার ১৯১৬-র এই ইস্টার বিদ্রোহকে জুলাই মাসে লেনিন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[১৯]

রবীন্দ্রনাথ আয়ার্ল্যাণ্ডে বৃটিশের অন্যায় আধিপত্য ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধী হলেও রুদ্রপন্থা বা বিভীষিকা সৃষ্টির পন্থাকে প্রথম থেকেই নিন্দা করেছেন—

অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই—অবশ্য রোগীর ধাত বুঝিয়া। যাহারা খৃষ্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> মনে পশুবলের উপাসক অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না; খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোন ঔষধ কি তাহারা মানে !……ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিষ জাতি। তাহারাও খুনী, এই জন্য ডাকের পরিবর্তে ডাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে।……কিন্তু আমরা ত খুনী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না ;[২০]

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন ১৮৮২ সালের মে মাসে আয়ার্ল্যাণ্ডের চিফ সেক্রেটারি লর্ড ফ্রেডারিক ক্যাভেনডিশ ও আণ্ডার সেক্রেটারি মি বার্ককে আইরিশ বিপ্লবীরা (Invincibles') ফিনিক্স পার্কে হত্যা করে। সেজন্য ১৮৮৩ সালে পাঁচ জন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়। এই ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি ঐ ধরনের মন্তব্য করেছেন ১৮৮৪ সালে। পরেও করেছেন, তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' ভাষণ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

> আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় ইস্কুল মাস্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশের স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছে— এবং এও বলা বাহুল্য যে সেই ইতিহাস রাজা-প্রজা উভয় পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইনবিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ— অনতিকাল পূর্বে আয়র্লণ্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।
>
> (অগ্রহায়ণ ১৩৩৮)

কিন্তু অত্যাচারিত আইরিশদের প্রতি রয়ে গেছে তাঁর সহানুভূতি। বঙ্গদেশে যে যুবশক্তি প্রলয় হুতাশনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তাঁদের ত্যাগের মহিমা ও শৌর্যের দীপ্তিকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন কিন্তু প্রলয়-পন্থাই যে যথার্থ পথ রবীন্দ্রনাথ কখনো তাকে মানেন নি, বরঞ্চ তার নিন্দা করেছেন (দ্রষ্টব্য 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ)।

১৯১৬-র ইস্টার বিদ্রোহ নিষ্ঠুরতম উপায়ে দমানো হলো কিন্তু 'সে আগ্ন নিভিল না, বরঞ্চ দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল'।[২১] ১৯১৭-র নির্বাচনে 'সিনফিন'রা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করল, ১০৫টির মধ্যে ৭৩টি আসন অধিকার করল। ১৯১৮-র শেষ থেকে শুরু হল ইঙ্গ-আইরিশ সংঘর্ষ, যুদ্ধেরই নামান্তর। ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে 'Assembly of Ireland' (Dáil Éireann)-এর নির্বাচিত 'ডেপুটি'রা মিলিত হয়ে ঘোষণা করলেন 'The Republic of Ireland' (Saorotát Éireann).

ঐ বছরই এপ্রিল মাসে 'সিনফিন' দলের এক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন ডি' ভ্যালেরা, আর্থার গ্রিফিথস হন সহ-সভাপতি।

আয়ার্ল্যাণ্ডে বৃটিশ-শাসনের প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে 'সিনফিন' দল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শহরে-গ্রামে নিজেদের 'স্বরাজ'-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং 'in which people often preferred the Sinn Fe'in courts to the established courts'.[২২]

১৯১৯-এর ডিসেম্বরে লয়েড জর্জ 'হোমরুল বিল'-এর সংশোধনী অ্যাক্ট করতে চাইলেন যার ফলে আয়াল'্যাণ্ড থেকে 'আলস্টার' (যেখানে বৃটিশ প্রসাদপুষ্ট প্রোটেস্ট্যাণ্টরা সর্বেসর্বা) পৃথক হয়ে যাবে। ১৯২০-র ডিসেম্বরে এই প্রস্তাব 'অ্যাক্ট' রূপ পেল। বৃটিশ-শাসকপুষ্ট কার্সন খুশী হলেও সিনফিনরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। ১৯২০ থেকেই ইঙ্গ-আইরিশ সংঘর্ষ প্রবল হলো। 'ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড ট্যান্স' (Black and Tans) (যুদ্ধফেরত সৈন্য, কুখ্যাত খুনী গুণ্ডাদের নিয়ে গঠিত) এবং 'রয়াল আইরিশ কনস্টেবুলারী' প্রভৃতি মিলে ঘর জ্বালিয়ে, শস্য পুড়িয়ে; গুলি চালিয়ে নিরীহ নর-নারীর জীবনে নারকীয় অধ্যায় রচনা করল। আইরিশ বিপ্লবীরাও এর সশস্ত্র যোগ্য উত্তর দিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যতঃ মাইকেল কলিন্স ও রিচার্ড মুলকাহাই (Richard Mulkahy)। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে স্যর জন অ্যানডারসন এই পর্বে আয়াল'্যাণ্ডে বৃটিশ শাসন-যন্ত্রের বর্বর দমননীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেজন্যই পরে তাঁকে বিপ্লব-দমন প্রচেষ্টায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয় বঙ্গদেশের গভর্নর রূপে। আমরা জানি অ্যানডারসনী আমলের বিপ্লব-দমন প্রচেষ্টাকে বঙ্গদেশেও বলা হোত 'ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড ট্যান' নীতি। সে কলঙ্কিত ইতিহাস সকলের জানা। রবীন্দ্রনাথ আয়াল'্যাণ্ডের এই অত্যাচারী ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-ট্যান্স'-এর পরিভাষা করেছিলেন 'কৃষ্ণপিঙ্গল'। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

> আয়ারল্যাণ্ডে কৃষ্ণপিঙ্গল উপদ্রবের কথা মনে আছে তো? এতবড় নিষ্ঠুর উচ্ছৃংখলতা সমস্ত য়ুরোপের সামনেই ঘটছে অথচ তাদের পরস্পরে রক্তের সম্বন্ধ আছে।[২৩]

১৯২১ সালের গোড়ায় যখন আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করেছেন S. S. Rhyndam জাহাজ যোগে, সেই জাহাজ থেকে এণ্ডরুজকে লিখছেন—

> Just see what hideous crimes are being committed by British 'patriotism' in Ireland! It is a python which refuses to disgorge this living creature which struggles to live its separate life.[২৪]

বন্ধু এণ্ডরুজকে পুনরায় লিখছেন—"Things that are happening in Ireland are ugly." (1920-21); এর অনেকদিন পরে ১৯৩৩ সালে লিখেছেন 'কালান্তর' প্রবন্ধ। ঐ সালে হিটলারের নাৎসি দলের অধিকারে চলে যায় জার্মানী। ঐ প্রবন্ধে ইউরোপীয় ও জাপানী আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ অগ্নিবর্ষণ করেছেন। সেই সূত্রে তিনি লিখলেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আয়ার্ল্যান্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না।[২৫]

বঙ্গদেশে এই বর্বর দমননীতির বাহক হয়েছিলেন স্যর জন অ্যানডারসন্। একবার বিপ্লবীরা তাঁকে লেবঙ্ (দার্জিলিং)-এ গুলি করে মারবার চেষ্টা করেন।[২৬] তিনি বেঁচে যান ভাগ্যক্রমে। আমরা লজ্জায় মুখ ঢাকি যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের আক্রমণের শুধু তীব্র নিন্দা করেই শেষ করেন না, তিনি এই কুখ্যাত অ্যানডারসন্‌কে তারযোগে জানান—

> Recent attack on your life is a matter of shame and regret to all of us in Bengal.

এর কি কোনো অনিবার্য প্রয়োজন ছিল সেদিনের পটভূমিকায়? অনুরূপ ভাবে শান্তিনিকেতনে কবি কর্তৃক অ্যানডারসনের অভ্যর্থনাও তাঁর নিজের বা দেশের বা বিশ্বভারতীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি।

আয়ার্ল্যান্ডে বৃটিশ বিরোধিতার মূল কারণ ছিল সর্বদিক থেকে আইরিশ ক্যাথলিকদের (যারা বিপুল ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ) নিষ্পেষণ। প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ ও ইংরেজ জমিদার শ্রেণীকে দেওয়া হয়েছিল লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ। কোনো ক্যাথলিক পার্লামেন্টের বা অঞ্চলের নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে না, সৈন্য বা নৌ-বিভাগে 'কমিশন্ড' পদ পাবে না, কোনো উচ্চ-পর্যায়ের পেশায় যুক্ত হবে না, কোনো স্কুল খুলবার বা পরিচালনার অধিকার তার থাকবে না, ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে না, শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারবে না, কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবে না, সম্পত্তি মর্টগেজ দেবার বা নেবার ক্ষমতা থাকবে না অথচ তাদের 'স্পেশাল ট্যাক্স' দিতে হবে ইত্যাদি। এসব তো পরবর্তী কালের হিটলারের 'ইহুদী ধ্বংস' কার্যক্রমকে মনে পড়ায়। এলিজাবেথ ক্রমওয়েলের সময় থেকে এই ধারা চলে আসছিল। ১৮২৯ সালে Catholic Emancipation Act পাশ হয় ড্যানিয়েল ও' কোনেল (১৭৭৫-১৮৪৭)-এর চেষ্টায় ও কর্মে। কিন্তু আইরিশ ক্যাথলিক ভোটারদের ভোটাধিকার পাবার জন্য প্রয়োজন হবে দশ পাউন্ড অথচ ইংলন্ডে সেখানে মাত্র চল্লিশ শিলিং। কিন্তু আসল লড়াই ছিল জমির লড়াই। জমিতে যুগযুগ ধরে আইরিশ কৃষকদের যে ন্যায্য অধিকার ছিল তা লুপ্ত হল। বৃটিশসৃষ্ট মূলতঃ প্রোটেস্ট্যান্ট জমিদারেরা যে-কোনো কৃষককে জমি থেকে উৎখাত বা উচ্ছেদ করে দিতে পারত। তারপর সেই জমি অন্য কাউকে বিলি করে দিত। ১৮৬৭ সালে 'ফেনিয়ান' দল যে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সাময়িক ভাবে তা ব্যর্থ হলেও নির্যাতিত ও শোষিত চাষীসমাজে জমিতে কৃষকের মালিকানা ফিরে পাবার দাবি তাতে অনেক বেশি জোরদার হয়েছিল। হোমরুল আন্দোলনের সমান্তরাল ভাবে চলেছিল জমিতে ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য ক্যাথলিক কৃষকের আন্দোলন। হোমরুল আন্দোলনের নেতা চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল নিজে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইঙ্গ-আইরিশ ভূম্যধিকারী হলেও, চাইলেন দশ লক্ষ আইরিশ ক্যাথলিক কৃষকের প্রত্যেকে নিজের জমি পাবে এবং সেকেলে জমিদারী প্রথার বদলে জমিতে 'মালিকানাস্বত্ব' (peasant proprietorship) প্রতিষ্ঠিত হবে।[২৭] ১৮৭৯ সালে স্থাপিত হলো Land League। ব্যাপক সহিংস প্রজা-অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল।[২৮] ১৮৮১ সালের 'ল্যাণ্ড অ্যাক্ট'-এ জমিতে কৃষকের স্বত্ব বহুলাংশে স্বীকৃত হল। যে 'Three F's' অর্থাৎ 'fair rent', 'fixity of tenure' এবং 'free sale'-এর জন্য আন্দোলন চলছিল ১৮৮১ সালের অ্যাক্ট-এ তার ব্যবস্থা হলো। ব্যাপক ও তীব্র কৃষক আন্দোলন তথা জাতীয় আন্দোলনকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করবার জন্য এই 'অ্যাক্ট' পাশ করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কৃষকদের নিজের জমির পূর্ণ মালিকানা ফিরে পাওয়া তখনো দূরের কথা। ১৮৯১ সালের 'ল্যাণ্ড পারচেজ বিল' পাশ হবার ফলে ঐ পথে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল আইরিশ ক্যাথলিক কৃষকেরা। ১৯০৩-এর 'অ্যাক্টে' জমিদারদের ভূমির পরিমাণ ও ক্ষমতা খর্বিত হলো।

বঙ্গদেশে কর্নওয়ালিশের আমলে বৃটিশসৃষ্ট নতুন জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) প্রচলিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজার সর্বনাশ কী ভাবে হয়েছে তার বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হয় বঙ্কিম-বর্ণিত পরাণ মণ্ডল বা হাসিম শেখ যথাক্রমে তপশিলী হিন্দু ও মুসলমান প্রজা। উচ্চবর্ণের 'রাজা' বা 'নবাবেরা' সবাই বৃটিশস্বার্থ রক্ষাকারী ও প্রজাশোষক। প্রজাদের স্বার্থরক্ষার একটি সামান্য প্রচেষ্টা দেখা যায় ১৮৫৯ সালে (The Tenancy Act of 1859) কিন্তু তাও সর্বত্র জমিদার জোতদাররা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিল। অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি ও প্রজা উচ্ছেদ পুরোমাত্রায় চলছিল। আসলে ঐ অ্যাক্টে প্রকৃত প্রজাদের জমি ভোগদখলের অধিকার (occupancy right) আদৌ দেওয়া হয়নি। রঙপুর জেলার কালেক্টার গ্লেজিয়ার লিখেছিলেন—

> The protection of only occupancy ryots would leave more than half of the tenantry unprotected.[২৯]

এই সবেরই ফল ১৮৭৩ সালে পাবনায় প্রচণ্ড প্রজাবিদ্রোহ। আমাদের 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকাগুলি সবাই প্রজাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কেননা তারা জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিল। শুধু রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন মোটামুটিভাবে প্রজাদের পক্ষে। তিনি 'An Apology for the Pabna Rioters' প্রবন্ধ লেখেন তাঁর বিশিষ্ট ছদ্মনাম 'Archydae'তে।[৩০]

বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে চাষী-প্রজাদের স্বার্থরক্ষার আরেকটি প্রচেষ্টার নমুনা ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (Bengal Tenancy Act of 1885)। লর্ড ডাফরিনের আমলে এটি পাশ হয়। লর্ড ডাফরিন ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অকটেভিয়ান হিউম ছিলেন ভারতের জাতীয় কনগ্রেস গঠনের মূলে। পূর্বে তিনি উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে 'আলস্টার'-এর ভাইস-অ্যাডমিরাল ছিলেন (১৮৮৩)। বৃটিশ রাজশক্তি-পোষিত প্রোটেস্ট্যান্ট-শাসিত 'আলস্টার' ছিল আইরিশদের স্বাধীনতা আন্দোলনের চিরশত্রু। ডাফরিন আয়ার্ল্যাণ্ডের ভূমি-সমস্যার বিষয় পূর্ব থেকেই বিশেষভাবে জানতেন। ১৮৪৫-৪৬-এর মহাদুর্ভিক্ষ (Great Famine)-এর ফলে চাষীদের প্রচণ্ড ক্ষতি, মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগ, ভূম্যধিকারীদের ভূমিকা সবই তিনি জানতেন।[৩১]

তাঁর রচিত 'Irish Emigration and the Tenure of Land in Ireland' বই (১৮৬৭) এবং আইরিশ ভূমি-সমস্যা নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি (১৮৭০-৭৮) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ডাফরিন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন ১৮৮৪ সালে। তাঁর কার্যকাল শেষ হয় ১৮৮৭ তে। ১৮৮৫ সালে 'বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট' পাশ হয় এবং 'ভারতীয় জাতীয় কনগ্রেস' তাঁরই উৎসাহে গঠিত হয়। এর পূর্বে ১৮৮০ সালে Rent Commission 'Rent bill'-এর যে খশড়া তৈরি করেছিল, বলতে গেলে ১৮৫৯ সালে চাষী-প্রজাদের স্বার্থ-রক্ষার যে সামান্য প্রচেষ্টা হয়েছিল সেটি তারই পরিণতি। ১৮৮০ সালে 'ইণ্ডিয়ান ফেমিন কমিশন' তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন—

> The condition of the rent law and the way in which it is administered in Bengal are a very grave hindrance to its agricultural prosperity and that large portious of the agricultural population remain, mainly owing to this cause, in a state of poverty at all times dangerously near to actual starvation and unable to resist the additional strain of famine.

একদিকে উড়িষ্যা, বিহার ও বঙ্গের অংশবিশেষে বার বার দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া অন্যদিকে আইরিশ কৃষকদের সমস্যা ও সমাধানে বিভিন্ন প্রচেষ্টা এই কমিশন-রিপোর্টের ও Rent bill-এর খশড়ার পিছনে কার্যকর ছিল। বাংলার জমিদারসভাও মনে করেন আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রজা-অসন্তোষের ঘটনাবলী 'Rent bill' রচনার পিছনে বিদ্যমান ছিল। Rent Law Commission আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রজা বিদ্রোহের কথা সরাসরি উল্লেখ না করলেও ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ঐ প্রসঙ্গ যে বার বার উঠেছিল তার প্রমাণ আছে। সেজন্যই ফেমিন কমিশনের সদস্য কানিংহাম বলেছিলেন—

> The grave political and social dangers to which an unpoverished, degraded and rack-rented peasantry gives rise are assuming everywhere a more menacing aspect.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতবন্ধু লর্ড রিপনের সময়ের বিখ্যাত ইলবার্ট বিলের রচয়িতা ইলবার্ট এই 'Rent bill'-এর পক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে বঙ্গ-বিহারের প্রজা-অসন্তোষ প্রাধান্য পায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর মন্তব্য উৎকলনযোগ্য—

> It would not be wrong to conclude that the critical turn in the Irish situation had a role in creating such a pervasive sense of emergency. *The influence of the Irish question on the original draft of the bill is un-mistakable.* The phrase 'Three F's' was often used in the official reports to describe the main changes contemplated by the Rent bill. *The un-common emphasis on eviction is explainable only by the Irish influence.*[৩২]

আমাদের দেশে 'জাতীয়-আন্দোলন' ও চাষীপ্রজা-আন্দোলন বাহুবন্ধ হয়ে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে নামতে পারেনি। তার পিছনে হিন্দু-মুসলমান জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থ অবশ্যই ছিল, বৃটিশ-বিরোধিতার কার্যক্রমও ভিন্ন রূপ নিয়েছিল। তার ইতিহাস এখানে আলোচনা করা গেল না। এখানে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে বঙ্গদেশে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার যেটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন 'বিল'-এর মধ্য দিয়ে, তার পিছনে ছিল আয়াল'্যান্ডের কম্পমান ছায়া।

হোমরুল আন্দোলন, ফেনিয়ান-আইরিশ ব্রাদারহুড-সিনফিন আন্দোলন বা ল্যান্ড-লীগের আন্দোলন সবারই মূলে সুগভীর দেশপ্রীতি। স্বাধিকার-অর্জন বা স্বরাজ-সাধনের প্রয়াস তারই বহিঃপ্রকাশ। তারই অনিবার্য ফল ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে 'স্বদেশী' আইরিশ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রবর্তনা। একেই বলা হয়েছে 'The Irish Renaissance'. পরাধীনতার বেদনা আয়াল'্যান্ডকে নিয়ে যায় স্বদেশের মূলানুসন্ধানে, নিজেদের জাতিগত সত্তার পুনরাবিষ্কারে যাকে এখন বলা হচ্ছে সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় 'সার্চ ফর আইডেন্টিটি' (Search for Identity). পার্নেলের মৃত্যুর পর (১৮৯১) স্থাপিত হয় 'গেলিক লীগ' (Gaelic League) ১৮৯৩ সালে, যার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল আয়াল'্যান্ডের নিজস্ব সংস্কৃতির ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ কেলটিক রিভাইভ্যাল ('The Celtic Revival') সাধন। ডগলাস হাইড ছিলেন (Douglas Hyde) এই আন্দোলনের নেতা। তিনি তাঁর জীবৎকালে (১৮৬০-১৯৪৯) প্রাচীন আইরিশ লোককথা, লোকগাথা, লোকগীত প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংকলন করেন। মাটির তলদেশ থেকে তুলে আনেন তাদের, এই প্রচেষ্টায় অভিনন্দন জানান তরুণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

য়েটস্। য়েটস্, লেডি গ্রেগরি, সিংগ্ (Synge) সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এর দ্বারা। হাইড-এর শ্লোগান ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডকে অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাবধারা থেকে মুক্ত করা ('De-Anglicisation of Ireland') ও নিজেদের লুপ্ত-প্রায় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটানো। ১৮৮২ সালে তিনি 'National Literary Society'-র একটি বক্তৃতায় বলেন তাঁদের কর্তব্য হবে আইরিশ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নবরূপে জাতীয় জীবনে প্রোথিত করা। ভাষা-আন্দোলনে 'গেলিক লীগ' প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক, জাতীয়তাবাদী ও সংযুক্তিবাদী (Unionist) সকলকে মেলাতে পেরেছিল। হোমরুল আন্দোলনের চেয়ে সে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করেছিল। য়েটস্ তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন 'contact with the soil and with the un-spoiled people'—দেশের মাটি ও খাঁটি মানুষের সঙ্গে সংযোগ। এই আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> কিছুকাল হইতে আয়র্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়র্লণ্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।… আয়র্লণ্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল।[৩৩]

১৯০৮ সালে ডাবলিনে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' (National University) স্থাপিত হলে 'গেলিক লীগ' দাবি করেছিল ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষায় 'আইরিশ ভাষা'কে 'আবশ্যিক' করতে হবে। প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে ভাষা-আন্দোলন চালালেন হাইড, জিতলেন সেই লড়াইতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ভাষা' অবশ্য পাঠ হয় ১৯০৬ সাল থেকে স্মরণীয় পুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে।

বঙ্গদেশে অনুরূপ প্রচেষ্টা করেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪)। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশিত হয় 'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২)। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠান। জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

> প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

কিন্তু সেদিন তিনি সফলকাম হতে পারেননি।

একটি স্মরণীয় মিল লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হলো 'গেলিক লীগ' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রতিষ্ঠার কাল। উভয়েরই প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৩ সালে।[৩৪] 'দি হিস্ট্রি অব আইরিশ লিটারেচার' রচিত হয় ১৮৯৯ সালে। আর দীনেশচন্দ্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম বার হয় ১৮৯৬-তে। হাইড লোকগীতিকা 'Fionn and Fianna' তুলে ধরলেন সবার কাছে যা একদা ম্যাকফারসনের 'Ossian' কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'মৈমনসিং গীতিকা' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু (রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা) মধ্য-প্রদেশের 'গোঁড়' আদিবাসীদের রচিত একটি 'গীতিকা' ভাষান্তরিত করে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

'গেলিক লীগ' আইরিশ ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান রচনায় অগ্রণী হয়েছিল, যেমন হয়েছিল লোকসাহিত্য সংগ্রহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও পাণ্ডুলিপি সন্ধান, ব্যাকরণ, অভিধান রচনা, আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় ছাত্রদের আহবান করে বলেন—

> বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল।...
>
> গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।...
>
> দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষদ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন...[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ নিজে পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, মেয়েলি ছড়া, মেয়েলি ব্রত, লোকসংগীত সংগ্রহ করেন; 'হারামণি' নামে তাদের প্রকাশ করেন এবং 'সারি' 'বাউল' সুর লাগান নিজের লেখা 'স্বদেশী' গানে। সংগ্রহ করেন কাঁথা, শিকে, আলপনার নকশা—লোকশিল্পের নানা উপাদান।

শুধু যে এইসব ক্ষেত্রে আয়াল´্যাণ্ডের স্বদেশ ও স্বভাষার আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের বঙ্গদেশের মিল তাই নয়; যে-ঔপনিবেশিক অবস্থায় দুটি দেশই দীর্ঘদিন রাহুগ্রস্ত, তার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসংকট প্রায় একই পর্যায়ের।

আয়াল´্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একজন আইরিশ ঐতিহাসিক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা এইভাবে করেছেন—

> at that tender age I realized that what we were being taught was English history with only an occasional side-glance of Ireland. But it was well-driven into our heads that King Henry II of England had invaded and conquered Ireland in 1169... It was

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

> explained that the good Kings Henry II had not come to Ireland merely for the purpose of conquering the 'semi-barbarous inhabitants' but also to guide them firmly towards enlightenment ![৩৬]

ঠিক অনুরূপ ঘটনা আমাদের বঙ্গদেশে ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' থেকে শুরু করে বহু প্রবন্ধে; ভাষণে এই ট্রাজিডিকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে আলোচ্য তাঁর 'শিক্ষাসংস্কার' (১৯০৬) প্রবন্ধটি। তিনি লিখেছেন—

> এমন সময় 'স্পীকার' নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে আইরিশ শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়, যখন বর্বর আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিভিয়া গেল সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে আয়র্লণ্ডেই বিদ্যার সময়ে চর্চা জাগিয়াছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লণ্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। অনেকটা আমাদের দেশের টোলের মতো।[৩৭] …প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু শেখানো হইত তবুও সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ।…এলিজাবেথের সময় লড়াই হইয়া আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তবিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।…

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৯০৫) প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত তাহাই পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এই প্রবন্ধ রচনার অনেক আগে বঙ্গদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে পর-ভাষার প্রয়োগজাত সংকট থেকে উদ্ধারের উপায়স্বরূপ তিনি লিখেছিলেন—

> বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্দশার সঙ্গে বঙ্গদেশে বৃটিশ পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থার দুঃখকর পরিণতির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন—

> আয়র্লণ্ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।…বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না, আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয় সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাকসন্ করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বুঝা কঠিন নহে।

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে— ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে।

এই শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।[৩৯]

আয়াল'্যাণ্ডের নিজস্ব নাট্য-আন্দোলন 'ন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটি' (১৮৮২)। 'গেলিক লীগ'-এর (১৮৯৩) আইরিশ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-সাধন প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। দেশজ সংস্কৃতির প্রতি ব্যাকুল মমতা ও অটুট শ্রদ্ধার পশ্চাদ্ভূমি অবশ্যই স্বদেশপ্রীতি। পরশাসন, পরভাষা, পরশিক্ষা, সব কিছু থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'নববর্ষের গান' (১৩০৯, ১ বৈশাখ) কবিতায়—

'ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়'

বিদেশী 'ভিক্ষাভূষণের' বদলে 'উত্তরীয়' গ্রহণের শপথ আইরিশ নাট্য-আন্দোলনে লক্ষণীয়। ১৭৯৮ সালে আয়াল'্যাণ্ডে বৃটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের শতবর্ষে অর্থাৎ ১৮৯৮ তে 'কিনভারা'য় ডিউরাস হাউসে (Duras House) মিলিত হন য়েটস্, লেডি গ্রেগরি ও এডওয়াড' মার্টি'ন। এখানেই প্রকৃতপক্ষে আয়াল'্যাণ্ডের নিজস্ব থিয়েটার 'অ্যাবি থিয়েটার' পরিকল্পিত ও গঠিত হয়।[৪০] লেডি গ্রেগরীর সঙ্গে য়েটসের পরিচয় ঘটে ১৮৯৫ সালে। তিনি য়েটসের জন্য পল্লীর দেশের রূপকথা অর্থাৎ 'কেলটিক' কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করেন। নাট্য সূত্রে আশ্চর্য মিল দেখি স্তানিস্লাভস্কি ও ডানশেংকোর নাট্যচিন্তা ও প্রয়োগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন প্রচেষ্টা এই একই ১৮৯৮ সালে। স্তানিস্লাভস্কির প্রয়াসেই গড়ে ওঠে 'মস্কো আর্ট থিয়েটার'।

এডওয়াড' মার্টি'ন নাট্য-আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'A Plea for a National Theatre in Ireland' নামক প্রচার-পুস্তিকায় লেখেন—

Is it not time that our dramatic art should be placed

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

on a national basis ?....teaching them to act plays in the Irish language ? (Oct. 1901)

অনুরূপ চিন্তা আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পাই সম-সময়ে—

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না।···বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। ···স্থূল বিলাতী বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।[৪১]

য়েটস্‌ বলছেন ১৯০৩ সালে আইরিশ নাটক ও মঞ্চ সম্পর্কে—

I think the theatre must be reformed in its plays, its speaking, its acting and its scenery for there is nothing good about it at present···

There must be nothing un-necessary, nothing that will distract the attention, no restless mimicries of the surface of life.

অপিচ

The background should be of as little importance as the background of a portrait group and it should, when possible, be of *one colour* or of one tint, that the persons on the stage wherever they stand may harmonize with it or contrust with it and pre-occupy our attention. Their outline should be clear and not broken up into the outline of windows and wains colling or lost into the edges of colours...

...it will give rise the imagination liberty and without returning to the bareness of the Elizabethan Stage.[৪২]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই সূত্রে উৎকলন করা যেতে পারে—

গর্ভ ও গর্ভাঙ্কের পরিবর্তন কালে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো নামানো আমার মতে অনাবশ্যক। এইরূপ সন্ধিস্থলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় আলো জ্বালাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট। নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অত্যাচার—উহা ছেলেভোলানো খেলা। প্রাচীন ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল না। তখন নটদিগের ও দর্শকদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের সাহিত্যগত নাট্যবস্তুর প্রতি।[৪৩]

আইরিশ নাট্য-আন্দোলন ইংরেজদের নাটকের কথাবস্তু, প্রকরণ ও মঞ্চরীতি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বর্জ'ন করে স্বদেশের প্রাচীন কথা ও লোককাহিনীকে গ্রহণ করে নতুন নাট্যবস্তু, প্রতীক ধর্ম' ও মঞ্চরীতি গড়ে তুলেছিল 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি'' রচনার প্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি, উত্তেজক 'ঐতিহাসিক' নাটককে ছেড়ে প্রবেশ করতে চাইলেন জাতীয় সত্তার মর্ম'মূলে। তাঁর নাটকের উপাদান 'পৌরাণিক' 'ঐতিহাসিক' ও 'সামাজিক' নাটক ছেড়ে অন্য জগতের। তিনিও বিলিতি নাটকের স্থূলতা বর্জ'ন করলেন 'শারদোৎসব' (১৯০৮) থেকে। গ্রহণ করলেন প্রতীক ধর্ম' ('খেয়া' কাব্য থেকে যার শুরু) সংস্কৃত নাটকের মঞ্চ-ঐতিহ্য ও বাঙালীর নিজস্ব 'যাত্রা'র গীতপ্রবণতা তথা লোকসাধারণের (people) বিচিত্র মেলা। প্রকরণে কখনো এলো নান্দী, সূত্রধার; রাজা, মন্ত্রী, রাজকবি, রাণী, সখী কখনো বা ছেলের দল, ঠাকুরদা। নীলকণ্ঠ বা মধুকাণের (মধুসূদন কিন্নর) যাত্রার ঢং, কথা ও গান, আবার কথা আবার গান। 'যাত্রা'র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়; সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।
>
> আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শ'ক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভ'র করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।[৪৪]

শারদোৎসবের কথাবস্তু রূপকথা (folk-tale) থেকে এসেছে বলে অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন—

> রূপকথার নিঃসন্তান রাজা পরলোকে গেলে তাঁর পাটহাতী বেরত উত্তরাধিকারী বেছে নিতে। আর রাজার সন্তান-সম্ভাবনা না থাকলে তিনি যেতেন তপস্যায় সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজে অথবা গুরুর আশ্রমে (—যেমন করেছিলেন কালিদাসের দিলীপ) অথবা নিঃসন্তান পত্নীকে নির্বাসন দিয়ে থাকলে রাজা সেই সন্তানের (বা পত্নীর) খোঁজে বেরতেন। সম্রাট বিজয়াদিত্য রাজকার্য' থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে অজ্ঞাতবাসে বেরিয়েছিলেন খানিকটা সেই কারণে···সুরসেনের স্নেহপুষ্ট, গোত্র পরিচয়হীন অনাথবালক উপনন্দ রূপকথায় হতো সম্রাট বিজয়াদিত্যেরই পরিত্যক্ত পত্নীর গর্ভ'জাত সন্তান।[৪৫]

এ কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, দুটি বৃটিশ-শাসিত উপনিবেশে পরাধীনতার বন্ধনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উত্থান ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাবার ব্যাকুল প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আইরিশ নাট্য ও নাট্যচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কথা বলা অযৌক্তিক হবে। কিন্তু জাতির মর্মমূলে পেঁছবার, তার গভীর সত্যটিকে তুলে ধরবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সমান্তরাল কাজ করেছেন আইরিশ নাট্যকারদের মতো এ কথা মানতেই হবে। (১৯০৮-১২) কালপর্বে রচিত নাটকগুলিতে (শারদোৎসব থেকে ডাকঘর) রবীন্দ্রনাথ ভিতরের কথাটার পরে জোর দেন বেশি, সহজ আটপৌরে কথায় বেজে ওঠে যেন গানের মৃদু স্বর, সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, যাকে সংস্কৃত ধ্বনিবাদীরা বলেন ব্যঞ্জনা, কখনো কথাবস্তু পায় প্রতীকী ধর্ম যেমন পেয়েছে য়েটস্ বা সিঙের নাটকে। য়েটস্ রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ[৪৬] 'The Post Office'-এর ভূমিকায় তাই লেখেন—

> when this little play was performed in London a year ago by the Irish players, some friends of mine discovered much detailed allegory, the Headman being one principle of social life, the Curdseller or The Gaffer another; but the meaning is less intellectual, more emotional and simple.

এ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনার স্থান এখানে নেই। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে এ-প্রসঙ্গ শেষ করছি। আইরিশ বিপ্লবী টেরেন্স ম্যাকস্যুইনি বৃটিশ-শাসিত ব্রিক্স্টন কারাগারে ৭৪ দিন অনশনের পর ১৯২০ সালে ২৮শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'কর্ক' শহরের মেয়র ছিলেন; তথা কবি ও নাট্যকার। তাঁর এই মৃত্যুবরণের খবর যখন য়েটস্-এর কাছে পেঁছল, তিনি ১৯০৪ সালে রচিত 'The King's Threshold' নাটকের শেষাংশ বদল করলেন।[৪৭]

বঙ্গদেশের বীর বিপ্লবী যতীন দাস (১৯০৪-১৯২৯) ম্যাকস্যুইনির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোরের রোরস্টল জেলে আত্মাহুতি দেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'তপতী' নাটকের মহলায় ব্যস্ত ছিলেন, বীরের এ আত্মদানের খবর আসা মাত্র তিনি মহলা বন্ধ করে দিলেন। সে রাত্রে গান লিখলেন—

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ···
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের প্রবাহ।

গানটিকে স্থান দিলেন 'তপতী' নাটকের গোড়ায় প্রতীকী অর্থ জুড়ে। সুমিত্রাও তো অগ্নিতে মৃত্যু বরণ করেন।

আর একটি কথা নাট্যপ্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলি। কবি উইলিয়ম বাটলার য়েটস-এর 'পর রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে য়েটস্ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি লেখেন—

আয়র্লণ্ড নিজের চিত্তস্বাতন্ত্র প্রকাশ করিবার চেষ্টায় নিজের ভাষা, কথা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-এক জন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি য়েটস্‌ তাঁহাদেরই একজন। তিনি আয়ল'ণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি য়েটস্‌ বা মরমীয়া কবি এ. ই.-র শ্রদ্ধার কথা সকলেরই জানা। তার সঙ্গে একটি পত্রিকা 'The Irish Citizen'-এর মন্তব্যও উৎকলন করি—

> These poems (referring to the Gardener) take their place, without question, not far from the summit of 'English Literature.' They are perhaps, the forerunners (in conjuction with the poems of W. B. Yeats and A. E.) of the greatest movement in European Literature yet experienced—its coming emergence from the low levels of "realism" and intellectualism merely to the plane of its true voice as the exponent of a divine humanity.[৪৯]

স্বতঃই রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'মিস্টিক'-উপলব্ধি সমালোচককে মুগ্ধ করেছিল বেশি। এবং আমরা জানি এই 'মিস্টিসিজম্‌' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিল 'প্রতীকী'-রচনার পথে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইরিশ কবি টমাস ম্যুরের (১৭৭৯-১৮৫২) 'Irish Melodies' বইটির পরিচয় ঘটে ১৮৭৮ সালের পূর্বেই জোড়াসাঁকোয়।[৫০] ১৮৪৬-এর এই 'নতুন সংস্করণ'-এর যে-'ভূমিকা' কবি ম্যুর লিখেছিলেন প্রকাশকের অনুরোধে সেখানে তিনি জানিয়েছেন—

> The whole source and soul of the Irish Melodies lies in their matchless music. As I have already said in song, I was only as the wind to the sleeping harp and "all the wild sweetness I waked was its own."

এই সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, পড়েছিলেন।[৫১] কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) স্কট, ম্যুর ও বায়রণের ভক্ত ছিলেন, মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) যাঁদের বলেন 'the lesser poets.' এঁরা তিনজনই স্বাধীনতার উদ্গাতা, পরাধীনতার বিরোধী। রঙ্গলাল ম্যুরের 'Glories of Brien the Brave' এবং 'From Life without Freedom' অবলম্বনে লেখেন 'পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্য'-এর (১৮৫৮) 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি। টমাস ম্যুর ফরাসি বিপ্লবের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১৭৮৯) ও আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি এমেটের প্রাণদণ্ডে (১৮০৩) মর্মাহত হন, স্বদেশের 'হৃদয় হতে' গীতি ও গীতিকা সংগ্রহ করে নতুন রূপ দান করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়ার্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই তাহা আমার কল্পনার মধ্যেই ছিল।…আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না।[৫২]

বিলেতে রওনা হবার পূর্বেই (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথ 'আইরিশ মেলডীজ' থেকে অনুবাদ করা আরম্ভ করেন, 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৪ মাঘ (১৮৭৭, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি তার প্রমাণ। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 'জীবন উৎসর্গ' নামে অনূদিত কবিতাটিও (১২৮৬, কার্তিক ; ১৮৭৯, অক্টোবর-নভেম্বর) এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে-সব গান 'আইরিশ মেলডীজ' থেকে রচনা করেছেন তাদের পরিচয় শান্তিদেব ঘোষ, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, প্রশান্ত পাল দিয়েছেন।[৫৩] যে-সব কবিতায় বা গানে ম্যুর তাঁর বন্দিনী স্বদেশের তথা স্বদেশপ্রেমের জয়গান করেছেন তার কোনো কোনোটির শিরোনামেও রবীন্দ্রনাথ পেন্সিলে দাগ দিয়েছেন—যেমন 'Tho' The Last Glimpse of Erin With Sorrow I See'। এই গানটি রচনার সময় ম্যুরকে ইংলণ্ডে আটকে রাখা হয়, তাই তিনি দেশজননীর উদ্দেশে লেখেন—

In exile thy bosom shall still be my home,
And thine eyes make my climate wherever we roam.
*
And I'll gaze on thy gold hair as graceful it wreathes
And hang over thy soft harp, as wildly it breathes ;

তখন নিজের পরাধীনা মাতৃভুমির রূপটি বুঝি রবীন্দ্রনাথের মনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। 'স্বদেশী' আন্দোলনের তপ্ত হাওয়ায় তিনিও লিখেছিলেন—

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী !

রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন 'প্রলয়শক্তি' ও 'সৃজনশক্তি'র কথা দেশের পরাধীনতা মোচনের পন্থার ক্ষেত্রে। তাঁকে আকর্ষণ করে 'সৃজনশক্তি' যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গড়বার সক্রিয় ভার নেয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগে (উনিশের শতকের শেষে) লক্ষ করেছিলেন শিক্ষিত ও অর্থবান সমাজের সঙ্গে গ্রাম তথা গ্রামবাসীর যোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ১৩১১ (১৯০৪) 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে গ্রামকে বাঁচাবার পজিটিভ পরিকল্পনা তিনি পেশ করেছিলেন, তবে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য নয়, বঙ্গদেশের হতদরিদ্র গ্রাম-সমাজের কথা মনে রেখে। তিনি নিজে তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তাঁর প্রার্থিত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়াস পান। চাষীরা যাতে সুদখোর মহাজনের হাত থেকে বাঁচতে পারে তার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তিনি লিখেছেন—

> যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম।[৫৪]

পল্লীর কাজ করবার জন্যই তিনি রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন হাতে-কলমে কাজ শিখবার জন্য। তিনি চাষীদের ডেকে বলেছিলেন—

> তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো ও সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো। তাহলে অনায়াসে ট্রাকটর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র চাষ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায় আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।[৫৫]

কিন্তু অনেক আগেই ১৯১৮ সালে এ ধরনের চিন্তা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন—

> যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত।...

অপিচ

> কিন্তু একশো দেড়শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে।...
>
> আমার কাছে মনে হয় এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইতে পারে।[৫৬]

এই প্রবন্ধটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ আয়ার্ল্যান্ডে স্যার হরেস প্লাঙ্কেট (১৮৫৪-১৯৩২) ও দেশপ্রেমী, মরমিয়া কবি ও সমবায় কর্মী জর্জ উইলিয়ম রাসেল (১৮৬৭-১৯৩৫) (যিনি A. E. নামে বিখ্যাত) কর্তৃক পরিচালিত সমবায়-আন্দোলন ও তার বিস্ময়কর ফলাফল সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। আইরিশ বিপ্লবীরা বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন, সেই 'প্রলয়শক্তি'র চেয়ে সমবায়ী 'সৃজনশক্তি'কে তাঁরা বড়ো

১৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে দেখেছিলেন। স্যর হরেস্ প্লাঙ্কেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় ১৯২০ সালে জুলাই মাসে আমেরিকা থেকে লণ্ডনে ফেরার পর। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> এবার বিলাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্মবীর স্যর হোরেস্ প্লাঙ্কেটের সহিত কবির পরিচয় হইল। স্যর হোরেস ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৯ পর্যন্ত আমেরিকায় গো-পালনাদি করিয়া দেশে ফেরেন এবং তৎপর দেশের কৃষির উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আদর্শবাদী তবে তাঁহার আদর্শবাদ কঠোরভাবে বস্তুকেন্দ্রিক। তিনি কবিকে বলিলেন "আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রথম প্রথম অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই আমাদিগকে নতুন অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে।" এই মনীষী ও কর্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হওয়ায় পল্লী সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার বহু বৎসরের পরিকল্পনাকে মূর্তিদানের ইচ্ছা বলবত্তর হইল বলিয়া আমাদের মনে হয়।[৫৭]

আয়ার্ল্যাণ্ডে বার বার শস্যহানি, দুর্ভিক্ষের হানা, ঔপনিবেশিক শোষণ, ক্ষুধার্ত চাষীর মৃত্যু ও বহু লোকের দেশত্যাগ প্লাঙ্কেটকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি পথ খুঁজেছিলেন ও পেয়েছিলেন। তিনি নিজে জমিদার এবং ধর্মে প্রোটেস্ট্যাণ্ট (রবীন্দ্রনাথও জমিদার ও 'ব্রাহ্ম') হলেও তিনি বুঝেছিলেন কৃষির উন্নতি ও পল্লীর উন্নতি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিলেন অপেক্ষাকৃত কম-মূল্যের আমদানীকৃত বিদেশী খাদ্যবস্তু এই দুর্ভোগের মূলে। তিনি তাই সমবায়নীতির পথ ধরলেন; দেখলেন ডিম ও দুগ্ধ উৎপাদনের ও বিপণনের ক্ষেত্রে আয়ার্ল্যাণ্ড যদি ব্যাপকভাবে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে কোনো বিদেশী সংস্থা তাকে দুর্বল করতে পারবে না। এই সাধু-সংকল্প নিয়ে তিনি গঠন করলেন 'The Irish Agriculture Organisation Society' (১৮৯৪)। এই সমবায়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল আত্মবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথও এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন কতো-ভাবে। মরমিয়া-কবি নাট্যকার থিয়সফিস্ট কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসায় কারো চেয়ে একচুল কম নন, সেই A. E. যোগ দিলেন প্ল্যাঙ্কেটের সঙ্গে কর্মযজ্ঞে। (একথা সত্য ১৮৮৫ সালের ভূমি সংস্কার আইনের ফলে চাষীরা সরকারি অনুদানে নিজস্ব জমি-জোতের অধিকারী হবার কিছু সুযোগ পেয়েছিল)। প্ল্যাঙ্কেট তাঁকে গ্রামীন সমবায়-ব্যাঙ্ক গড়বার ভার দেন যাতে রায়ত চাষীরা 'profiteering money lenders'-এর হাত থেকে বাঁচতে পারে। একই কাজ রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই করেছেন তবে সফল হতে পারেননি। তিনি আমাদের দেশে তৎকালে প্রচলিত সরকারি সমবায়-ব্যবস্থাকে প্রশংসা করতে পারেননি—

> আক্ষেপের বিষয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।[৫৮]

নিজের দেশে সমবায়ের অসাফল্য এবং আয়াল'্যাণ্ডে তার অভাবনীয় প্রসার ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় গ্রামকেন্দ্রিক, কৃষিপণ্যভিত্তিক সমবায়ে দুগ্ধ উৎপাদন ও মুরগীপালন তথা বস্ত্রবয়ন প্রভৃতির প্রচলনে প্রণোদিত করে। তাই ১৯২১-এ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর ১৯২২-এ শ্রীনিকেতন গড়েন। জর্জ উইলিয়ম রাসেল, যিনি A. E. নামে পৃথিবীখ্যাত, তাঁর 'The National Being' বইটি রবীন্দ্রনাথ খুব আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে পড়েছিলেন।[৫৯] বইটির অধিকাংশ স্থলে পেনসিলের দাগ, সম্মতিসূচক রেখা, যেমন—

> If we are to build a body for the soul of Ireland it ought not to be a matter of reckless estimates or jerry-building. We have been told, during my life time at least, not to criticise leaders, to trust leaders and so intellectual discussion ceased and the high principles on which national action should be leased became less and less understood, less and less common possessions. The nation was not conceived of as a democracy freely discussing its laws, but as a secret society with political chiefs meeting in the dark and issuing orders. No doubt our political chieftains loved their country but love has many degrees of expression from the basest to the highest. (p. 7)

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সঙ্গে এর মিল লক্ষণীয়। সমবায়-পদ্ধতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছেন A. E.—

> The co-operative movement connects with living links the home, to the nation the circumference of his being. The farmers of the new generation will grow up in social order where all the transactions will be communal and national enterprises, that will mean a change of national character. (p. 28)

এই ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায়। তাই তিনি বড়ো করে পাশে দাগ দিয়ে রাখেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অথবা লেখক যখন দৃঢ়ভাবে জানান—

The creation of a rural civilization is the greatest need of our time. (p. 64)

রবীন্দ্রনাথ একথাটি নানাভাবে বলে এসেছেন বিংশ শতকের গোড়া থেকে। তাঁর নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনলেন A. E.-র এই বইটিতে। জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে লিখেছেন—

তোমাদের 'কর্মী' পড়ে দেখলুম। বেশ ভালই হয়েছে। এই কাগজে তোমরা Æ-র National Being এর মর্মটা যদি পাঠকদের দাও ত ভাল হবে। আমাদের একটা কথা বুঝতে হবে, কালের সঙ্গে যারা সামঞ্জস্য না ক'রে উজানে ঠেলে সাবেক যুগে ফিরে যেতে চায়, তারা কালের দ্বারা নিহত হয়। বর্তমান কালের মধ্যে যে ব্যাধি আছে বর্তমানের ক্ষেত্রেই তার ঔষধ বেরবে। ...Æ-র বইয়ে যে ঔষধ ও পথ্যের আলোচনা আছে তাতে কোনো অন্ধ সংস্কারকে সহায় মানা হয়নি—তাতে বর্তমানের সঙ্গেই বর্তমানের আপোষের কথা আছে।[৬০]

A. E.-র রচিত বইটির বিস্তৃত সমালোচনা করেন পিয়রসন (১৮৮১-১৯২৩) 'Practical Swaraj' নামে।[৬১] এখানে তিনি A. E.-র একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—

We have no more a real democracy in the world to-day. Democracy in politics has in no country led to democracy in economic life.

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন A.E.-র জীবনে, কর্মে ও তাঁর রচনায় 'Ideal'-এর সঙ্গে 'Practical'-এর সমন্বয়। দেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতি তাঁকে 'সৃজনশক্তি'র দিকে চালিত করেছে, বিদ্বেষ বা হিংসার পথে নয়। বৃটিশ সৈন্যদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন আয়ার্ল্যান্ডের জনসাধারণের পক্ষ থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

Race hatred is the cheapest and basest of all national passions. (p. 150)

এই সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মনের মিল দেখতে পাই। আর একটি তথ্য বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করা প্রয়োজন—রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি "The complete man must never be sacrificed to the patriotic man"—A. E. উদ্ধৃত করেন খণ্ডিত স্বাধীন আয়ার্ল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'The Irish Statesman'-এ (১৯২৫) এবং পরিশেষে লেখেন—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

How often in Ireland have we not been asked to sacrifice our complete humanity, beauty, love, justice as an offering to patriotism?...It is bad patriotism, which demands from us the sacrifice of things which are higher than itself.

আমাদের দেশের রাজনীতিতে আবেদন-নিবেদন, বা চোখ-রাঙিয়ে শাসানো বা সশস্ত্র গ্নপ্তহত্যা বা প্রতিহত্যার পথ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। ভিক্ষাবৃত্তি, হুমকি বৃত্তি বা পিস্তল বৃত্তিতে তাঁর আস্থা ছিল না। A.E.-র সঙ্গে তিনি তাঁর আদর্শগত সহমর্মিতা অনুভব করেন। তবে লেডি আগাস্তা গ্রেগরি রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছিলেন। 'ন্যাশনালিজম্' আর 'পেট্রিয়টিজম্' সমার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই 'জাতীয়তাবাদের' নামে নিজেদের রাষ্ট্রিক স্বার্থের পোষণ, ও পররাজ্য গ্রাসকে নিন্দা করেছেন। ১৯০১ সালে য়ুরোপীয় বণিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এশিয়া ও আফ্রিকায় 'অজগর নীতি'র তীব্র বিরোধিতা করতে গিয়ে লিখেছেন—

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
দুর্বলে ভাসাতে চাহে ছলের বন্যায়।

—(নৈবেদ্য)[৬২]

১৯১৬-র মে মাসে রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ ও পিয়রসনকে নিয়ে জাপান যান। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জাপানে রবীন্দ্রনাথ 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism)[৬৩]-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। লেডি গ্রেগরি রবীন্দ্রনাথের ঐ বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করে তাঁর ডায়েরি-তে লেখেন—

Tagore has just given a lecture against Nationalism; if Nationalism means Imperialism—away with it—but patriotism i.e. affection for the land of our earliest association will survive;[৬৪] (22 Nov. 1916)

তিনি রবীন্দ্রনাথকে তখন ঠিক বুঝতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করেছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদকে। ১৯২০-র জুন মাসের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ফিরলে স্যর হরেস প্লাঙ্কেটের সঙ্গে দেখা হয়। পিয়রসন জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল আয়াল'্যান্ড পরিদর্শনের। কিন্তু তখন সেখানে ইঙ্গ-আইরিশ সংঘর্ষ চলছে, তাই যাওয়া হল না। গেলে প্রলয়শক্তির ও সৃজনশক্তির দ্বৈতরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধ হতো।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুষঙ্গ

'The National Being' বইটির কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তেমনি 'পথের সঞ্চয়' বইটিতে সংকলিত 'কবি য়েটস্' প্রবন্ধে বাস্তবপন্থী ঔপন্যাসিক জর্জ ম্যুরের 'Hail and Farewell' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। বইটি দুষ্প্রাপ্য। জর্জ ম্যুর (১৮৫২-১৯৩৩) রচিত এই উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক। তিন পর্বে বিন্যস্ত Ave, Salve, Vale, রচনাকাল ১৯১১-১৯১৪।

এই উপন্যাসটি সম্পর্কে লেডি গ্রেগরি তাঁর 'Seventy Years' গ্রন্থে (তাঁর আত্মকড়চা) লিখেছেন যে বইটি 'helped planning of the Irish Literary Theatre'. তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডকে শুধু উপন্যাসে নয়, ছোট-গল্পেও নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'The Untilled Field' (১৯০৩) বইটির কথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'Hail and Farewell' উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'Ave' পড়েছিলেন।[৬৫] পরের পর্বগুলি নয়। প্রথম পর্বের গোড়ায় 'overture' অংশে ম্যুর জানিয়েছেন ১৮৯৪ সালে তিনি এবং এডওয়ার্ড মার্টিন (১৮৫৯-১৯২৩) একসঙ্গে লণ্ডনে বাস করতেন। এখানেই তিনি জানলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের নবজাগরণের বার্তা—

> Ireland is awaking at last out of the great sleep of Catholicism.

এবং গভীর বেদনায়, তাঁর মনে হলো—

> Strange that Ireland should have produced so little literature, for there is a pathos in Ireland in its people, in its landscapes and in its ruins. (p. 5)

সেই রাত্রেই তিনি—

> roamed in imagination from castle to castle…I have not thought of Ireland for ten years and to-night in an hour's space I have dreamed Ireland from end to end. (p. 6)

সেই স্বপ্ন ও সাধনা রূপ পেয়েছে 'Hail and Farewell' উপন্যাসে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উল্লেখপঞ্জী

FORWARDED WITH COMPLIMENTS FROM
THE DEPARTMENT OF EDUCATION
GOVERNMENT OF INDIA

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার

১. Presidency College Register, Part 1, 1927

২. তদেব, 'left while in the 2nd class', p 471

৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; 'চরিতকথা'

৪. 'আত্মীয় সভা'র পরে 'গৌড়ীয় সমাজ' ১৮২৩ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সঙ্গে রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না।

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২৪-৫

৬. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী', দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩০০ ; দ্র. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', তৃতীয় ভাগ, পৃ. ২৫

৭. ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি—শ্রীসত্যরঞ্জন বসু, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ. ২৯

৮. পত্রসংখ্যা ২৪, 'পত্রাবলী', সংকলক প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

৯. Long, "Early Bengali Literature and Newspapers". The Calcutta Review; January-June, 1850.

১০. চতুর্থ উপদেশ, "প্রাণময় কোষ", ৯ চৈত্র ১৮১২ শক (১৮৯০)

১১. দ্বিতীয় উপদেশ, "পৃথিবী", ১৮ ফাল্গুন, ১৮১২ শক

১২. ২৪ অধ্যায়, "স্বদেশপ্রীতি", 'ধর্মতত্ত্ব' পৃ. ৬৬১ (সাহিত্য সংসদ সং)

১৩. "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি", ৯ম উপদেশ

১৪. 'আত্মজীবনী', বিংশ পরিচ্ছেদ

১৫. তদেব, পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ। মহর্ষি কথিত ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুলিখিত আত্মজীবনীর যে পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত আছে সেখানে দেখি প্রথমে লিখিত হয়েছিল 'পবিত্র পুরুষের' তারপর 'রচয়িতার', শেষে কেটে লেখা হয় 'অখিল মাতার'।

১৬. 'তদেব', সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।
আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে প্রথম লেখা হয়—

> বৃক্ষ পর্বতের আড়াল দিয়া আকাশ হইতে অর্ধচন্দ্রের শুক্ল ভগ্নরেখা পথের স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িতেছে। সেই রেখাই আমার দীপ হইল।...চলিতে চলিতে দেখিলাম যেন একটি চক্ষু আমার উপর পড়িয়া রহিয়াছে...

১৭. তদেব, একবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮. তদেব, দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৯. তদেব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২০. ‘মধুস্মৃতি’, ১ম সং, পৃ. ৭৪৪
২১. শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’, পৃ. ১৯

রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবী

১. “আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার”, ‘প্রদীপ’ ১৩০৬, ভাদ্র
২. ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’, অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪৬০
৩. “পিতৃস্মৃতি”, প্রবাসী, ১৩১৮ কার্তিক
৪. ‘জীবনস্মৃতি’, পৃ. ৩৯, বিশ্বভারতী সং
৫. ‘প্রবাসী’, ১৩৪৮ ফাল্গুন
৬. ‘প্রবাসী’, ১৩৩৭ বৈশাখ
৭. ‘ঘরোয়া’, পৃ. ৫৫
৮. তদেব, পৃ. ৫৭
৯. ‘প্রবাসী’, ১৩১৮ কার্তিক
১০. ‘জীবনস্মৃতি’, “মৃত্যুশোক”
১১. “অভাব”, ‘শান্তিনিকেতন’, প্রথম
১২. ‘জীবনস্মৃতি’, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২২৭, বিশ্বভারতী
১৩. “কর্ণকুন্তী সংবাদ”, ‘কাহিনী’।

ব্রাইটন ও ‘মেদিনা ভিলা’র বাসিন্দা

১. ‘জীবনস্মৃতি’, পৃ. ৭৭-৭৮
২. —Page's Court Directory for Brighton & Hove 1879
৩. জীবনস্মৃতি, পৃ. ৮৮

হেনরি মরলি, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র

১. ‘রবীন্দ্রজীবনী’, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৭
২. ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’, রানী চন্দ, পৃ. ৮১-৮২। তাঁর সম্পর্কে ইংরেজ চরিতকার লিখেছেন—

> His teaching power was unique, not only from the mastery of the facts but from his personal warmth and geniality—Dictionary of National Biography.

৩. ভাষণ, ডিসেম্বর ১৯৩২ ; ‘শিক্ষা’ গ্রন্থে সংকলিত।
৪. ‘তীর্থঙ্কর’ পৃ. ১৫১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধটির ঠিক নাম হল "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ"। ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চার সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখকের নামের স্থলে "শ্রী সঃ" দেখা যায়। পরে সত্যেন্দ্রনাথ এই রচনাটিকে 'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থের "পরিশিষ্ট" রূপে গ্রন্থভুক্ত করেন।

৬. 'জীবনস্মৃতি', "লোকেন পালিত", পৃ. ৯৭-৯৮

৭. 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', রানী চন্দ, পৃ. ৮৩-৮৪

৮. য়ুনিভার্সিটি কলেজের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন—

I regret there are no records now existing which give the length of time he actually studied here.

—প্রবন্ধ লেখককে লিখিত পত্র।

৯. থিয়োডোর গোল্ডস্টুকর (১৮২১-৭২) লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৫০ সাল থেকে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন এই মনীষীর উদ্দেশে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যে।

১০. বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৯-১৯১৬)

১১. *A Nation in Making*: Oxford University Press, 1927

১২. ১৮৬৯ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের 'Open Competitive Examination' হয়। রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ তিনজনই সে পরীক্ষায় পাস করেন। তখন নিয়ম ছিল ঐ পরীক্ষার প্রার্থীকে উনিশ বছরের বেশি ও একুশ বছরের কম বয়সী হতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় (১৮৬৩) বয়স লিখেছিলেন ষোলো বছর। কাজেই ১৮৬৯ সালে একুশ বছরের বেশি হয়। সেজন্য তাঁর সম্পর্কে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। বিহারীলাল গুপ্ত এবং মহারাষ্ট্রের শ্রীপদ বাবাজি ঠাকুরও একই সমস্যায় পড়েছিলেন বয়সের ব্যাপারে। বিহারীলাল গুপ্তের বাধা সহজেই কেটে গেল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদের নাম সরিয়ে নেওয়া হল সফল প্রতিযোগীদের নামের তালিকা থেকে। বাংলা দেশে এই নিয়ে জোর আন্দোলন হয় এবং মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল সকলেই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় বয়স গণনার রীতির পার্থক্য দেখিয়ে সুরেন্দ্রনাথের দাবি সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ কুইন্স বেঞ্চের কাছে আবেদনে সুফল পান।

১৩. মরলি ১৮৪৯ সালে কয়েকটি কটাক্ষগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন, তার একটি হল "How to make home unhealthy"। রচনাটি ডিকেন্সের (১৮১২-৭০) নজরে পড়ে। তিনি মরলিকে তাঁর সম্পাদিত 'Household Words' পত্রিকায় লিখতে বলেন। মরলি লেখেন "Adventures in Skitzland"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং নিজের লিভারপুলের স্কুলের পাট গুটিয়ে 'Household words' পত্রিকা ও 'Examiner' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ডিকেন্সের সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'Household Words', সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে লিখেছেন বলে পত্রিকার নাম ভুল হয়েছে। তারপর ১৮৫৭ সালে তিনি কিংস কলেজে সান্ধ্যবিভাগে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ থেকে তিনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে যোগ দেন।

১৪. *A Nation in Making :* My first visit to England, p. 21

১৫. য়ুনিভার্সিটি কলেজের রেজিস্ট্রার লিখেছেন—

Loken Palit was registered as a student for three sessions 1879-80, 1880-81, 1881-82. According to a list of fees for that period, it would seem that he was at College for the whole of the three sessions Oct. to June in each case.

—প্রবন্ধ-লেখককে লিখিত পত্র, ১৩ই মার্চ ১৯৬২।

তিন সঙ্গী

১. লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫-১৯১৫)

১. IOR : Bengal Civil Leave Pay, L/AG/21/8/33
IOR : L/AG/33/5

২. 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় ১৩২১ সালে ১৬ই আশ্বিন, শনিবার কোজাগর লক্ষ্মীপূজার দিন তারকনাথের মৃত্যু হয়। 'হিতবাদী' লেখেন—

> দুঃখের বিষয় মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী কি জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত কেহই নিকটে ছিলেন না। পালিত-পত্নী আপনার চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করাইবার জন্য তখন বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। আর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথও কার্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি সংবাদ পাইয়াই সত্বর মোটর গাড়িতে নিমতলা ঘাটে পেঁছিয়া পিতৃ-সৎকার সম্পাদন করেন। ...লোকেন্দ্রনাথ পালিত কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত এডভোকেট।

লোকেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হিসেবে যোগদানের পর কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁর সুনাম হয়েছিল। না হলে 'হিতবাদী' তাঁকে বিখ্যাত অ্যাডভোকেট লিখতেন না। পিতার মৃত্যুর পর লোকেন্দ্রনাথ বিলেতে ফিরে যান ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩. ১৮৯৪ সালে ১৬ই জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন—
গত সন্ধ্যাবেলায় জনসংখ্যার একটা তালিকা দিলেই বুঝতে পারবে পঞ্চাশ নম্বরের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি। কুমুদ, লোকেন, সতু, তারকবাবু, লিল, সত্য, অরু, নরু, আমি, ছোট বউ…ইত্যাদি
—চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড

অপিচ—স্বর্ণকুমারী দেবীর কাশিয়াবাগানের বাড়িতেও প্রায়ই ছুটিতে আসতেন লোকেন্দ্র। সরলা দেবী লিখেছেন যে লোকেন্দ্র তাঁকে ও তাঁর দিদিকে (হিরন্ময়ী) একবার প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা দেন; বিষয়—Love and Friendship। সরলাকে তিনি একশো খানা ছবি সমেত Spectroscope উপহার দেন। —'জীবনের ঝরাপাতা', পৃ. ৯৭, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭

৪. The Bengalee, 29th January 1912

৫. 'চিঠিপত্র', পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৭। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তারিখ দিয়েছেন ৬ মে ১৯১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তারিখ ভুল করেছেন, কেন না লোকেন্দ্র সস্ত্রীক বিলেতে পেঁছান ৬ জুন, ১৯১৩।

৬. ইন্দিরা দেবী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে বলেছিলেন।

৭. জ্ঞানদানন্দিনী বার্ধক্যবশত ভুল করে লিখেছেন মেবল: তারকনাথ পালিতের পত্নী। 'পুরাতনী', পৃ. ৩৯। আসলে লোকেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

৮. 'চিঠিপত্র', অষ্টম খন্ড, পৃ. ১৯১

৯. রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০১

১০. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। লোকেন্দ্রের অন্য একটি কৌতুককর মন্তব্য উদ্ধৃত করি—

> Friends are like shoes—they must be worn enough to fit into our creases and individualities before they are thoroughly comfortable. An easy shoe and an easy friend should not pinch anywhere.
> —L. P. 22. 11. 88

১১. 'ছিন্নপত্রাবলী', বিশ্বভারতী।

১২. 'ছিন্নপত্রাবলী', পৃ. ২৫১। Amiel's Journal, The Journal Intimate of Henri Frederic Amiel (1821-1881). First published in French 1882 December. Eng. Translation, Mrs Humphry Ward, 1887. "আমিয়েলের বিখ্যাত জর্ণাল যখন বাহির হয়, শাস্ত্রীমহাশয় সেই বইয়ের খবর দেবেন্দ্রনাথকে দিতে আসিয়া দেখেন যে দেবেন্দ্রনাথই তাঁহাকে সাক্ষাৎমাত্রে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন 'Amiel's Journal

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিনি পড়িয়াছেন কিনা। তারপরে দেখেন সে শুধু বই তিনি পড়েন নাই, স্থানে স্থানে সে বইয়ের অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে"। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', অজিত চক্রবর্তী, পৃ. ৪৫৪, জিজ্ঞাসা (সং)

১৩. 'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৮৩

১৪. তদেব।

১৫. চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০

১৬. তদেব।

১৭. চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১১২

১৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

এই টাকার জোগাড় হয় নাই। টাকা লোকেনের ছিল না, তারক পালিতের টাকা। এই টাকা শোধ করেন ১৯১৭ সালে, তখন সে টাকার মালিক বিশ্ববিদ্যালয়; কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে মুক্তি লাভ করেন।

—'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯

বক্তব্যে কিছু ত্রুটি আছে। স্যর তারকনাথ পালিত ১৯১২ সালে জুন মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য ২ কিস্তিতে মোট সাড়ে পনের লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ ট্রাস্ট-এ দাতার মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, বসন্তকুমার মল্লিক ও নীলরতন সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়—

Read a letter from Sir Rabindranath Tagore Kt. D. Litt requesting that he may be allowed to pay in June next the sum of Rs. 30.000 which he borrowed from the late Sri T. N. Palit.

Resolved that time be allowed to Sir Rabindranath till the 30th of June 1917 to pay the sum of Rs. 30,000 borrowed from the late Sir T N. Palit. —(May 11, 1917)

আরও পাওয়া যায়—

The Registrar reported that Sir Rabindranath Tagore one of the debtors of the Sir T. N. Palit had paid in full the principal and interest for May 1917. —(8 June, 1917)

পাঁচ হাজার টাকার সুদ বেড়ে ৩০,০০০ হাজার হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে যে ২০,০০০ হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহের কথা লিখেছিলেন মনে হয় পরে সেই টাকাটি তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে নেওয়া। সেইটি সুদে-আসলে বেড়ে ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির টাকা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই ঋণ শোধ করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৯. 'দ্বিজেন্দ্রলাল', দেবকুমার রায়চৌধুরী

২০. 'চিঠিপত্র', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩

২১. তদেব, পৃ. ৩০

২২. 'জীবনের ঝরাপাতা', পৃ. ৯৬

২৩. দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৫৪৪। এই গানটি সম্পর্কে লোকেন্দ্র বলেছিলেন, undoubtedly the very-very-very best and noblest national song that I have heard or read in my life. তদেব, পৃ. ৫৪৫

২৪. 'জীবনস্মৃতি', "লোকেন পালিত"। প্রথম তিন বছর সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪র্থ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হন।

২৫. 'সাধনা'; ১২৯৮, ফাল্গুন

২৬. 'সাহিত্যের সত্য', "সাধনা", ১২৯৮ চৈত্র

২৭. 'সাধনা', ১২৯৯ বৈশাখ।

২৮. রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তিনি 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপিঁয়' মূল ফরাসিতে পড়েন নি, ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলেন।

২৯. "সাহিত্যের উপাদান"; 'সাধনা', ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ

৩০. তদেব।

৩১, তদেব।

৩২. 'সাধনা', ১২৯৯ আষাঢ়

৩৩. প্রিয়নাথ সেন Mademoiselle de Maupin (1835) গ্রন্থের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'পুরুষের উক্তি কবিতার 'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণার' অংশটি উদ্ধৃত করে লেখেন—"তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অসীম সুন্দর গদ্যকাব্যের নায়িকা নায়কের সহিত কেবলমাত্র একরাত্রি প্রেম সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ হইয়া বলিয়াছেন—'তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন করিবে। আমি তোমার চিরবাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য উৎসুক থাকিবে।"

—"মানসী", 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' পৃ. ৪৫

এই সূত্রে 'প্রদীপ' পত্রিকায় (১৩০৭ পৌষ) প্রবোধচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'একখানি ফরাসী উপন্যাস' প্রবন্ধটি সকলেরই পড়া উচিত। পূর্বোক্ত উপন্যাস-খানির এমন সহৃদয় আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

৩৪. 'সাধনা', ১২৯৯ শ্রাবণ

৩৫. 'দ্বিজেন্দ্রলাল', দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৫৬৫, ১৩২৪। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণ স্মরণীয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৬. *The Death of a Star*—L. Palit, Modern Review, August 1911; *Fruitless Cry*—L. Palit, Modern Review, May 1911। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সদনে লোকেন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপি নেই। শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুগ্রহপূর্বক এই অনূদিত কবিতা দুটির প্রকাশকাল আমাকে জানান।

৩৭. 'সাধনা', ১২৯৯ মাঘ। রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার হেরফের" 'রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে' পঠিত হয় এবং 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৯৯ পৌষ। লোকেন্দ্রনাথের রচনাটি পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি তখন রাজসাহীতে।

৩৮. বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ ঘটলেও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথবাবুকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন। মনে হয় সেজন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রদ্ধা-ভাজন ব্যক্তি, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মাস্টারমশাইয়ের নাম চন্দ্রনাথবাবু।

৩৯. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের রেকর্ডস্।

২. প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬)

১. 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সমালোচনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই।—
—প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, নিবেদন। সেজন্য অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছে।

২. গীতিনাট্য, ১৮৯৯।

৩. ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত ও ১৮৯৯ সালে অভিনীত।

৪. ১৯০০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত।

৫. ১৯০১ সালে জুন মাসে প্রকাশিত।

৬. ১৯০৭ সালে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত।

৭. এই প্রহসনটির প্রথমে নাম ছিল 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭) পরে হয় 'অলীকবাবু' (১৯০০)। এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে প্রিয়নাথ লিখেছেন—"এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু অলীক-প্রকাশ সাজিয়াছিলেন।" এই অভিনয় হয় ১৮৭৭ সালে। প্রিয়নাথের সমালোচনাটি 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৬ সালে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮. ১৮৮১, কার্তিক-ফাল্গুন।

৯. "এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমাকে কাব্য রচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন"। 'জীবনস্মৃতি', পৃ. ১১৯

১০. "রাস্কিন"—'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি'। "রাস্কিন" প্রবন্ধটি 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৭-এর বৈশাখ থেকে শুরু হয় এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সমাপ্ত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১১. 'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড।

১২. "Some Celebreties", Modern Review, May 1927।

১৩. তদেব।

১৪. 'জীবনস্মৃতি', "প্রিয়বাবু" অধ্যায়।

১৫. সাহিত্য, ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

১৬. সাহিত্য, ১৩১৬ কার্তিক।

১৭. প্রমথ চৌধুরী, ১৩৩৪ চৈত্র। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী।

১৮. রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন—

তোমার মনে আছে 'মানসী'র এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলে। সেই লেখাটি সুরেনদের কাছে ছিল—কোন সম্পাদক সন্ধান পাইয়া ছাপাইবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপের উপক্রম করিয়াছেন।

—'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৪

১৯. ৭ আষাঢ় ১৩০৬, 'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড।

২০. তদেব, ২ জুলাই ১৮৮৯। সেইজন্যই বোধ করি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রিয়নাথের চিঠি প্রেরিত হয়নি।

২১. 'সাহিত্য', ১৩০৭ পৌষ। রচনাটির শেষে 'সংযোজন' দ্রষ্টব্য।

২২. দেবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে-থাকতে যাতে কন্যাদের বিবাহ হয় সে বিষয় ভেবেচিন্তে রবীন্দ্রনাথ বেলা ও রেণুকার বিবাহ অল্প বয়সে দেন।

২৩. শান্তিনিকেতন, ২৯ আষাঢ় ১৩৪০।

৩. আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)

১. 'সাহিত্য', ১৩২৫ অগ্রহায়ণ।

২. এই কথাটি প্রথম বলেছিলেন কবি পো (Poe)।

৩. 'Impression' শব্দটি মূলত চিত্রশিল্পের (অবশ্য কবিতার terminology সবই প্রায় চিত্রশিল্প থেকে এসেছে) উনিশের শতকের মধ্যভাগে Monet-এর সূর্যোদয়ের ছবি থেকে এই প্রবণতার সূচনা হয়। "ফরাসী দেশের নবযুগের সমালোচকেরা নিজেদের ইমপ্রেশনিস্ট বলে পরিচয় দেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে কাব্যবস্তু হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী"—'চিত্রাঙ্গদা', প্রমথ চৌধুরী।

৪. কবিতাটির Agnes Lee-কৃত ইংরেজি অনুবাদ গতিয়ে-র Enamels and Cameos কাব্যগ্রন্থে আছে। এই মূল্যবান তথ্যটি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান্ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানিয়েছেন।

৫. Brereton, Geoffery, *A Short History of French Literature*, p. 203.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৬. প্রবন্ধটি প্রকাশের পর 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় কবি বার্নস্ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা প্রকাশ করেন শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় "কৃষক কবি বার্নস্" নামে।

৭. প্রিয়নাথ সেনও এডগার অ্যালান পো-র কবিতার অনুরাগী ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

> পোর (Poe) কবিতা পাঠে আমরা যেন একটি অদৃষ্টপূর্ব জগতে যাই—নূতন রসের আস্বাদন পাই—অপরিচিত স্পর্শের পুলক-হর্ষ অনুভব করি। পাঠমাত্রেই বোধ হয় ইহার তুল্য বা অনুরূপ কিছুই ইতিপূর্বে দেখি নাই। —রস্কিন, প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ১৯৭।

৮. 'হেলেন' নামটি রূপকাশ্রিত।

৯. 'সাহিত্য', আষাঢ় ১৩২০।

১০. 'সবুজপত্র', ১৩৩৪, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা।

শুন নলিনী

১. 'তীর্থংকর', দিলীপকুমার রায়, পৃ. ২০৭-০৯, জেনারেল প্রিন্টার্স সং।

২. 'প্রার্থনাসমাজ'-এর পূর্বরূপ 'পরমহংসসভা' (১৮৪২)। পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্জন তার লক্ষ্য ছিল। খ্রীস্টানের হাতে তৈরি পাউরুটি ও মুসলমানের হাতে জল গ্রহণ করে 'সংস্কার' ভাঙতে হতো সভ্যদের।

৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা 'কবিকাহিনী' সম্পর্কিত চিঠির আবিষ্কর্তা সজনীকান্ত দাস।

৪. ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পরে সত্যেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিকে 'বোম্বাইচিত্র' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' রূপে গ্রন্থভুক্ত করেন। উক্ত প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু দাদাজির মুখে বসিয়েছেন "কঠোর লৌহশৃঙ্খল ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু প্রেমের মোহন শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার নহে। ইংরাজেরা যদি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে চান ত আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে—আপনার মতো ব্যবহার করুন, কৃষ্ণবর্ণের জন্য এক নিয়ম, শ্বেতবর্ণের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম, এ ভাব পরিত্যাগ করুন।"

৫. 'বিশ্রব্ধ সারদা' vol. I (বিভিন্ন ব্যক্তির সটীক পত্রসংকলন) H. B. Mote Prakashan, Bombay-14. কলিকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের পদস্থ কর্মী ডি. বি. যোশী 'অন্নপূর্ণা' বা অ্যানা সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত করেছেন ঐ গ্রন্থে।

Journal of Indian Association, 1882—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে ছিল। তিনি সেগুলি শ্রীযুক্ত যোশীকে দান করেন। তার মধ্যে অ্যানার 'Lotus Flower' স্বাক্ষরিত চিঠিটি পান।

৬. 'বামাবোধিনী পত্রিকা', ১২৯৮, আশ্বিন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৭. 'Who was Who' (1929-1940) গ্রন্থ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে বৃটিশ কাউন্সিল (লণ্ডন)-এর সৌজন্যে।

শকুন্তলা : গ্যেটে, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ

১. "শকুন্তলা", 'প্রাচীন সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী।

২. 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব;' ১৮৫৩ মার্চ। প্রবন্ধটি ১৮৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে ইংরেজিতে অনূদিত ও পঠিত হয়েছিল।

৩. 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা', সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১

৪. The German Sakuntala Experience, India and the Germans. Walter Lifer, Sakuntala Publishing House, 1971

৫. Goethe, Werke, Sophien—Ausgabe, 1, 4, 22

৬. Monier Williams, Sakoontala or The Lost Ring, 1853.

৭. Goethe, Poetical Works, vol I, John C. Nimmoltd, MDCCCC III.

৮. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

৯. Letters from Italy, Translated by Rev. A. J. W. Morrison M. A. London, George Bell and Sons, Convent Gardens, 1881.

১০. DER AUTENTHALT IN ITALIEN (1786-1788) Sept-May, p. 95, VEB BIBLOGRAPHISCHES INSTITUT, Leipzig, 1959.

১১. প্রখ্যাত কবি ডব্লিউ. এইচ. অডেন 'Italienischer Reise'-এর ইংরেজি অনুবাদে মন্তব্য করেছেন যে গ্যেটে প্রথমে লিখেছিলেন 'S—' অর্থাৎ সম্ভবত Spinoza। কিন্তু শ্রীমতী ক্লাউস জানিয়েছেন অডেনের মন্তব্য যথার্থ নয়। "The conclusion, that the passage in question presumably did not refer to Sakontola, but to Spinoza is not convincing since no letter in the usual sense has a role to play here but a manuscript, for which the letter-form was applied and which despite its date of March 1, 1787 originated considerably later. Not before 1796 did Goethe decide upon working on "Italian Travel". In the manuscripts the abbreviations of names by Goethe is not usually found. He could have therefore reffered to the text of *Sakoontala* while preparing the manuscripts without reminding himself that in 1787 he did not yet know of it.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

১. অবশ্য কৃষ্ণপ্রসন্ন সম্পর্কে এইটুকু জানলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁর 'গীতার্থ-সন্দীপনী' শ্রীমদ্ভগবদগীতার উল্লেখযোগ্য টীকা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শ্রীমদ্ভগবদগীতার' ভূমিকায় লিখেছেন—

"শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন...নিজকৃত অনুবাদের সহিত 'গীতাসন্দীপনী' নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে 'গীতাসন্দীপনী'তে গীতার মর্ম পূর্ব পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন সেইরূপ বুঝান হইতেছে।"

(১২৯৩)

২. বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে 'যামিনাং পুষ্পিতাম্' ইত্যাদি শ্লোকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—

এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ।...অর্থাৎ বৈদিক কর্ম বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। অথচ কর্ম করিতেই হইবে।... যাহা কাম্য নহে তাহাই নিষ্কাম।

—চতুর্দশ অধ্যায়—ভক্তি ; ভগবদ্‌গীতা।

৩. 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', শিক্ষা, বিশ্বভারতী সং।

৪. এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মহর্ষি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানির প্রথম খন্ডকে "শ্রুতিশাস্ত্র" এবং দ্বিতীয় খণ্ডকে "স্মৃতিশাস্ত্র" রূপে সংকলন করেন। দ্বিতীয় খণ্ড অনুশাসনের জন্য মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি থেকে শ্লোক সংগ্রহ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষৎ, মহাভারত, গীতা ও মনুস্মৃতির যে শ্লোকগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডভুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্। প্রাপ্তমপ্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥' শ্লোকটি প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রে ও ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত পত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উদ্‌ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শ্লোকটি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড, অনুশাসন অংশ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। মূল মহাভারত থেকে নয়।

৫. দেবেন্দ্রনাথ সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্লোকটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সে স্থান থেকেই শ্লোকটি সংগ্রহ করেন। মূল মনুসংহিতা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন কিনা বলা কঠিন।

ডন কুইকসোট, রবিনসন্ ক্রুশো ও রবীন্দ্রনাথ

১. "কমলাকান্তের পত্র", প্রথম সংখ্যা।
২. 'পুরাতন প্রসঙ্গ', প্রথম পর্যায়।
৩. "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে,' পৃ. ১৪৩, বিশ্বভারতী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪. 'রবীন্দ্র স্মৃতি,' পৃ. ৪৪, বিশ্বভারতী।

৫. "The Teacher", The Religion of Man, p. 173. G. Allen & Unwin Ltd, 1931।

৬. তদেব, p. 174।

৭. তদেব।

৮. "বঙ্কিমচন্দ্র," 'সাধনা', ১৩০১।

৯. ঘরের পড়া, জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে।

১০. গোয়ালন্দের পথে, ২১ জুন ১৮৯২, 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ৮৮।

১১. শিলাইদহ, ২০ আগস্ট ১৮৯২, 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ৭০।

১২. আমার বাল্যকথা, পৃ. ৪৬।

১৩. বইটির পুরো নাম The Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner.

১৪. "The Teacher", The Religion of Man, p. 174।

১৫. ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১, 'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি : বুয়র যুদ্ধ

১. Mr. Cecil Rhodes, brother of Colonel Rhodes of Lord Harris' staff, has been appointed Premier of Cape Colony, in the place of Sir Gordon Spring, resigned. —The Statesman, July 26, 1890

২. দি ইংলিশম্যান, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০০।

৩. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত "বুয়ার ও ভারতবাসী" প্রবন্ধে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

"দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, তাহাতেও সমগ্র সৈন্যসংখ্যা চল্লিশ সহস্র অর্থাৎ ইংরাজ সেনার এক-পঞ্চমাংশ অতিক্রম করে নাই। অনেকস্থলে পুরুষবেশে বুয়ার রমণীদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে।" —১৩০৭, ভাদ্র সংখ্যা।

৪. দি ইংলিশম্যান, ২৪ জানুয়ারি ১৯০০।

৫. 'সমূহ' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ১০।

৬. Nehru, *Glimpses of World History*.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'ছবির ঘর' বা জীবনস্মৃতি

১. রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গ্রন্থটিকে কখনো বা নানা রঙের সুতোয় বোনা নক্‌শার সঙ্গে উপমিত করেছেন—

"অপর লোকের জীবনের প্রধান উপকরণ ঘটনা নহে, ভাবনা। কোন্‌টা তাহার কাছে কেমন লাগিয়াছে, সংসারের কোন্‌ ব্যাপারে তাহার মানবজন্মের টানা-পোড়েনে কোন্‌ রঙের সুতা পরাইয়া কী নকশা আঁকিয়াছে ইহাই তাহার জীবনে দেখা যায়। আমার এ লেখাটিও তাহা লইয়া।"

('জীবনস্মৃতি'র দ্বিতীয় খসড়া : রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে)

২. এই সূত্রে 'জীবনস্মৃতি' রচনার কারণ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর মন্তব্য উৎকলনযোগ্য—

"As though aware that the major phase of his development was at an end and an entirely new chapter was to begin, he wrote his reminiscenes of the earlier days up to the threshold of manhood."

(Rabindranath Tagore : A Biography, p. 277)

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণে যান; ১৯১৩ সালের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্য, উপন্যাস, এমন কি গদ্যরীতি সবই আগের যুগ থেকে 'দুঃসহ নূতন'।

৩. 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত, বিশ্বভারতী।

৪. 'উৎসর্গ' কাব্যে সংকলিত ২১-সংখ্যক কবিতা।

৫. গ্যেটে জীবনের শেষপর্বে পৌঁছে দীর্ঘকাল ধরে এটি লিখেছিলেন। ১৮১১ সালে এই গ্রন্থের প্রথম কিস্তি রচিত হয়। শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ১৩১৮ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৯-এর শ্রাবণ অবধি প্রকাশিত হয় ও ১৩১৯ সালেই গ্রন্থাকারে বার হয়।

৬. 'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬।

৭. দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, 'জীবনস্মৃতি'।

৮. আসন্ন-প্রকাশ "বাংলা আত্মচরিত সাহিত্য" বইটিতে এদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

৯. সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৮, পৃ. ৫৭১।

১০. সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ. ৮৬।

১১. মনে হয় সমাজপতি গ্যেটের 'Dichtung und Wahrheit' গ্রন্থের G. H. Lewes কৃত সমালোচনারই প্রতিধ্বনি করেছেন। Lewes লিখেছিলেন —"Wherein the old man depicts the youth, as the old man saw him, not as the youth felt and lived." গ্যেটের আত্মজীবনী-র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যাসত্য বিচারে সমালোচক মহলে ঐক্যমত্য দেখা যায়নি। G. H. Lewes-এর কাছে বহু তথ্যই 'Inaccurate' অথচ Bielschowsky-র মতে সব তথ্যই 'accurate'। কিন্তু Lewes-এর অভিযোগ তথ্যগত ততটা নয়, যতটা 'Inaccuracy of tone'-এর বিরুদ্ধে।

১২. এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য মনে রাখা ভালো—"শেক্‌সপীয়রে, বায়রণে এবং সাধারণ ভাবে ইংরেজি সাহিত্যে যে হৃদয়াবেগের প্রবণতা পাওয়া যায় জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তার নিন্দা করেছেন, কিন্তু ঠিক ঐ উন্মাদনা বাংলা কবিতায় এনেছিলেন বলেই আমরা অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরকালের মতো বিকিয়ে আছি"—'কবি রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১০০-১০১।

১৩. মনে রাখতে হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তাঁর তিনটি 'মহৎ' চরিত্র—চতুরঙ্গের 'জ্যাঠামশাই', ঘরে বাইরে-র 'নিখিলেশ', ও যোগাযোগের 'বিপ্রদাস' সকলেই পজিটিভিস্‌ট (Positivist) কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, আপন মহিমায় দীপ্যমান হলেও তাঁরা তাঁদের নিকটতম জনকেও নিজেদের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৪. জীবনস্মৃতি, পৃ. ১০৩।

১৫. তদেব, পৃ. ৭৭; এই গানটি প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে (১৮৭৮) রচিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকে (১৮৭৯) গানটি আছে।

১৬. তদেব, পৃ. ১১৪।

১৭. অধ্যাপক জে. সি. ঘোষ লিখেছেন—"জীবনস্মৃতিতে Tagore has recorded the inner history of his early poetry. It is the history of his emergence from the unreal and self-centred world of adolescence into the adult and super-personal world of man and nature." —*Bengali Literature*, p. 177.

১৮. রয় পাস্‌কাল মন্তব্য করেছেন—"It is true that writers with a poetic gift come nearer to a reconstruction of the 'feel' of past experiences than to autobiographers".

—*Design and Truth in Autobiography, 1960.*

১৯. ভারতী, ১২৮৫ কার্তিক। গ্যেটের প্রণয়-জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা দেখা যায় না, দেখা যায় দান্তে ও পিত্রার্কার ক্ষেত্রে। তাই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম, প্রেমের আদর্শ, আর গ্যেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুধু যে গ্যেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না।"

২০. "When I was eighteen, all my country was eighteen too—Feb 15, 1824, (Geothe's conversations with

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Eekermann) শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭।

২১. তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'তে এর কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

২২. এই প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর অভিমত উদ্ধৃত করি—

"কবি গ্যয়টে তাঁহার আত্মজীবনী যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের কোনো কবির দ্বারা সম্ভাবনীয় বলিয়া মনে করি না। তাহার কারণ মানুষের জীবন যে একটা অভিব্যক্তির লীলাক্ষেত্র সেই কথাটা আমাদের চেতনায় যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই।" —'জীবনস্মৃতি', কাব্য পরিক্রমা, পৃ. ৬৩।

২৩. 'দুদিন' কবিতাটি স্কট দুহিতাদের উদ্দেশে লেখা। 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে স্থান দেবার সময়ে কবি 'ভারতী'তে প্রকাশিত কবিতাটির যে স্তবকটি বর্জন করেন তার থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হল—

কিন্তু, এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কী বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে।
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
দুদিনের পদচিহ্ন চিরকাল তরে
অঙ্কিত রহিবে শান্ত বরষের শিরে—

['সন্ধ্যাসংগীত', পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত]

তৃতীয়া দুহিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন এবং তিনি কবিকে কয়েকটি ইংরেজি ও আইরিশ গান শেখান। কবিও তাঁকে বাংলা শেখাতেন।

২৪. Clark, A. M., Autobiography: Its Genesis and Phases, p. 15

রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত

১. "আনন্দরূপ", 'পথের সঞ্চয়'।
২. সূচনা, 'বাল্মীকি প্রতিভা', রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী।
৩. 'জীবনস্মৃতি'।
৪. 'বিসর্জন', তৃতীয় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য।
৫. "চেয়ে থাকা"
৬. "সাধ"
৭. "সমাপন"
৮. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪
৯. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাধবপুরের ধনঞ্জয় ও মহারাষ্ট্রের টিলক

১. 'বউঠাকুরানীর হাট' প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮৮ কার্তিক—১২৮৯ আশ্বিন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ পৌষ মাসে (জানুয়ারি ১৮৮৩)। ঐ উপন্যাসকে ভেঙে পরে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রথম প্রবেশ কালে পাদটীকায় জানিয়েছেন যে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি "এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত" (১৩২৯ বৈশাখ)। কাজেই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পান্ডুলিপি ১৩১৪ (১৯০৭) সালে শেষ হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে অদ্যাবধি নাটকটির কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।

২. "টলস্টয় যাহা নীতিরূপে প্রচার করেন, শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহা জীবনে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাকে সাহিত্যরূপ দিলেন —ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁহার অহিংসনীতির প্রতীক"।—'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতী খন্ড, পৃ. ১৭৫।

৩. ধনঞ্জয় বৈরাগী, "ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ", পৃ. ১৯০।

৪. Jog, N. G., B. G., Tilak, p. 55. অপিচ When a terrible famine broke out in Bombay in 1896, Tilak acquianted the peasants with their rights under the Relief Code (1876) and asked not to be cowards and not to pay the Government dues at the cost of their lives and property. This activity of Tilak was described in official circles *as the no rentcampaign.*—"Genesis of Exteremism", R. C. Majumder, Studies in Bengal Renaissance. p. 193.

৫. Times of India, Sept 20, 1906. Tilak and the Struggle for Indian Freedom গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

৬. টিলকের পত্রিকা 'মারাঠা' লিখেছিল—প্লেগ দমনকারী কর্তৃপক্ষের অপেক্ষা প্লেগের আক্রমণ বরঞ্চ দয়াশীল।

৭. Wolpert তাঁর 'Tilak and Gokhale' বইটিতে দেখিয়েছেন র‍্যান্ড হত্যায় টিলকের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। Tilak and Gokhale —Wolpert, Stanley, A., "Revolution & Reform in the Making of Modern India", University of California Press, 1962.

৮. রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৪৬।

৯. বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩। টিলকের পক্ষে মামলার মূল সওয়াল-জবাব করেন মি. পিউ (Pugh) ও মি. স্ট্রাংম্যান (Strangman)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১০. Tahmankar, D. V., *Lokamanya Tilak : Father of Indian Unrest and Maker of Modern India*, 1956, p. 94.

১১. ভারতী, ১৩০৫ বৈশাখ। 'রাজা প্রজা' গ্রন্থে সংকলিত।

"The same year, again bills were introduced in the Viceroy's Legislative Council to stiffen the already wide language in which section 124 A was drawn and to insert a new section 153A, so that convictions for sedition could be more easily obtained"—India Struggles for Freedom, H. Mukherji, p. 78.

১২. নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে Bombay Regulations XXV of 1827 অনুযায়ী নির্বাসন দন্ড নেওয়া হয়। একেই রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন আইন-শৃঙ্খলার মরিচা সাফ' বলেছেন।

১৩. সিডিশন বিল রচনার প্রসঙ্গ।

১৪. প্রসঙ্গ কথা, ১, 'আত্মশক্তি ও সমূহ, পৃ. ৮৪৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত)।

১৫. টিলক বলেছিলেন—"Hero-Worship is a thing deeply implanted in human nature and our political aspirations need all the strength which the worship of an Indian hero is likely to inspire into our minds. For this purpose there can be no better person than Sivaji. We are not against a festival being started in honour of Akbar or any other figures from Indian History". বিপিনচন্দ্র পালও এই কথা বলেছিলেন। "The Sivaji Festival", Speech delivered in 1903. Swadeshi and Swaraj গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৬. 'কথা' কাব্যে সংকলিত।

১৭. শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে ঐ কবিতাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিবাজী-সম্পর্কিত রচনা—"শিবাজী ও ইতিহাসের শিক্ষা", 'ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ ২৫৩-৬৫।

১৮. শ্রীযুক্ত অমল হোম লিখেছেন—"১৩১১ [১৯০৪] সনে রচিত 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। কবির নিকট শুনিয়াছি যে কবিতাটি দেউস্কর মহাশয় মারাঠীতে তর্জমা করিয়া টিলককে পাঠাইলে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে তাঁহার কবিতাই "বঙ্গমারাঠারে এক করি দিবে বিনা পণে।" পারবাতে অবশ্য লিখেছেন যে একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি পাঠ করেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। টিলক ঐ সভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন।
Bal Gangadhar Tilak—Parvate, T. V., p. 135.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৯. রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন, ১৩১১ আশ্বিন।

২০. রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ ১৬১।

২১. সভাপতি অভিভাষণ, 'আত্মশক্তি ও সমূহ', পৃ. ৮:১-১২, রবীন্দ্র রচনাবলী (পঃ বঃ সরকার সং)।

২২. রামমোহন লাইব্রেরি হলে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধ পাঠ।

২৩. শ্রীযুক্ত অমল হোমের পূর্ব-প্রবন্ধ।

২৪. 'অযোগ্য ভক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী ১২, পৃ. ২৫১-২৫৮

২৫. B, G. Tilak, Jog. N, G. p. 157

২৬. রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-১০১

আয়ার্ল্যাণ্ড, বঙ্গদেশ ও রবীন্দ্রনাথ

১. মিরাৎ-এর মূল ফাইল পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজি সাময়িক পত্র The Calcutta Journal-এ 'মিরাৎ'-এর প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের উদ্‌ধৃতি থাকত, ইংরেজি অনুবাদে। যে-সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির কথা বলা হচ্ছে তার নাম অনুবাদে ছিল *Ireland : The Causes of its Distress and Disappointment.*

২. Nag and Burman, English works of Raja Rammohan Roy, Pt. IV, pp. 102-03.

৩. রামমোহন সমীক্ষা, দিলীপকুমার বিশ্বাস, পৃ-৫৭২।

৪. Memoir of Dwarakanath Tagore, pp. 115-16,

৫. য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, চতুর্থ পত্র, [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮২]

৬. Dated 25th July 1906.

৭. বেশান্ত বলেছেন—"The Irish tongue musical to my ear and the Irish nature dear to my heart".

৮. "This was the policy initiated by the genius of Parnell, when by the plan of a campaign he prevented the payment of rents in Ireland."—'Bandemataram, 16th April 1907.

৯. Ghosh Shankar, 'The Renaissance to Militant Nationalism in India, p. 268.

১০. "তাঁর মধ্যে ছিল আইরিশ রক্তের অগ্নিশিখা আর তা থেকেই তিনি তাঁর বিপ্লবী আবেগকে ভারতবর্ষের খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন"।

—রমাঁ রলাঁ, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৮। অনু. অবন্তী সান্যাল।

১১. 'সিন্‌ফিন্‌' দলের মূল সংগঠক আর্থার গ্রিফিথ রচিত গ্রন্থ "The Resurrection of Hungary : A parallel to Ireland" দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১২. 'বয়কট' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় আয়ার্ল্যাণ্ডে। বৃটিশ রাজকর্মচারী আইরিশ কৃষকপ্রজা বিরোধী ক্যাপ্টেন বয়কট (Captain Boycott) প্রোটেস্ট্যাণ্ট জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। আইরিশ 'ল্যাণ্ড লীগ' তাঁকে বর্জনের ও বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেয়। তার পর থেকে শব্দটির অর্থবিস্তার ঘটে এবং সারা পৃথিবীতে গৃহীত হয়। বঙ্গদেশে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিলিতি দ্রব্য 'বয়কটের' যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার উৎস আইরিশদের অবলম্বিত 'বয়কট' নীতি।

১৩. ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫) উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রে অরবিন্দকে আঁকতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন—

"What I myself feel for him is not mere admiration but reverence for his depth of spirituality, his largeness of vision and his literary gifts, extraordinary in imaginative in sight and expression. He is a true Rishi and a poet combined and I shall repeat my 'নমস্কার' which I offered to him when he was first assailed by the troubles which ultimately made him an exile from the soil of Bengal". (Nov. 30, 1919)

১৪. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃ. ৩২৭-২৮।

১৫. Duff Charles, Six Days To Shake An Empire. p. 78.

১৬. "দি আইরিশ ভলান্টিয়ার্স"-এর অনুসরণে মনে হয় 'দি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বা 'বি ভি' নামকরণ ঘটে ১৯২৮ সালে। হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) সঙ্গে দেখা করেন (১৯০১) ও বাছাই করা যুবকদের নিয়ে গড়েন বিপ্লবী দল 'মুক্তিসঙ্ঘ (১৯০৫)'। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কন্‌গ্রেসের যে-অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G. O. C.) ছিলেন সেখানে হেমচন্দ্র ঘোষ প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকদলের নাম হয় 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স'। শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ বি. ভি. র সভ্য ছিলেন।

১৭. ১৫ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৮. কবিতাটি গোপনে ছাপা হয় জানুয়ারি ১৯১৭। A. E.-র collected Poems-এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বারো বছর পরে তিনি জানিয়েছেন—"These men had died for their country. None could laugh at them any more". (January 1929)

রবীন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ বিপ্লবী অরবিন্দের উদ্দেশে যে 'নমস্কার' কবিতা রচনা করেছিলেন তাকেও কোনো কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। এই সূত্রে 'Salutation' ও 'নমস্কার'-এর নামকরণের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১৯. Lenin, *"The Discussion of Self-Determination Summed up"*, collected works, vol. 22. Lawrence and wishart Edition.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২০. 'হাতে কলমে', ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১, পৃ. ২৩২।
সাবিত্রী লাইব্রেরীর অঙ্গস্বরূপ 'সাবিত্রী সভা'র ষষ্ঠ অধিবেশনে (২৪ আগস্ট, ১৮৮৪) পঠিত।

২১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর শেষের কথা—"তখন সহসা সেই বিষ্ণু-মণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল ; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না।"

২২. Curtis, Edmund. A History of Ireland. p. 408.

২৩. ২১ জুন ১৯৩০ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র), প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৮ সংখ্যায় মুদ্রিত।

২৪. Letters to a Friend, pp. 143-44.

২৫. এখানে, 'কৃষ্ণ পিঙ্গল' না লিখে 'রক্ত পিঙ্গল' লিখেছেন। বোধ করি 'Blood and Iron' এবং 'Black and Taus'—উভয়ে মিলে এই 'জোড়কলম' (hybrid) শব্দটি হয়েছে।

২৬. ১৮মে, ১৯৩৪ এই প্রচেষ্টা হয়।

২৭. এই সূত্রে 'ল্যাণ্ড লীগে'র প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ড্যাভিট-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—"The Land struggle must go along with the national struggle." তাঁর পরিচালিত 'Boycott' নীতি ও 'No-Rent' আন্দোলন জমিদার তন্ত্রকে অনেকটা নতজানু হতে বাধ্য করেছিল।

২৮. "The peasant's wild justice of revenge displayed itself in the shooting of many landlords and their agents. 'Captain Moonlight' was the phrase for the secret terror, and in the towns secret societies were pledged to obtain Ireland's independence by methods of assassination"—Curtis, Edmund, A History of Ireland. p. 379-80.

২৯. Kling, B. The Blue Mutiny : Indigo Disturbances in Bengal (1859-60.)

৩০. রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪)-র সম্পাদিত 'Bengal Magazine', Sept. 1873, দ্রষ্টব্য। দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'।

৩১. "Lord Dufferin showed in the House of Lords, the new landlords were harder masters than those of the old stock, who even if the tenant had little legal right, recognized customary and un-written right".
Curtis, Edmund, A History of Ireland, ch. XIX, pp. 379-83.

৩২. Chandhusi, B. B, 'Agrarian Relations in Bengal'. History of Bengal (1857-1905) University of Calcutta, p. 303.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৩৩. কবি য়েটস্, পথের সঞ্চয় ১৩১৯ (১৯১২)।

৩৪. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার তারিখ হলো ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩)। প্রথমে নাম ছিল "The Bengal Academy of Literature কিন্তু পরবৎসর উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবক্রমে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামকরণ হয়। ১৩১৫ (১৯০৮) বঙ্গাব্দে ২১ অগ্রহায়ণ পরিষদের নবগৃহপ্রবেশ উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আজি গো তোমার দুয়ারে জননি !' গানটি রচনা করেন। এর 'কোরাস' অংশটি উৎকলন করি—

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।

৩৫. ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, বৈশাখ ১৩১২।

৩৬. Duff, C, Six Days to Shake An Empire, p. 3.

৩৭. ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন—"Henry II described the Irish people as 'barbarians' at a time when Irish scholars had long been helping to civilize a great part of Europe including England itself".

স্যর হেনরী ম্যেন বলেছেন—"The connection between pupil and teacher was regarded as peculiarly sacred by the ancient Irish."

৩৮. ন্যাশনাল ফন্ড, ভারতী, কার্তিক ১২৯০ (১৮৮৩)।

৩৯. 'শিক্ষাসংস্কার' (১৯০৬)। এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে 'শিক্ষাসমস্যা' (১৯০৬) 'জাতীয় বিদ্যালয়' (১৯০৬)। প্রবন্ধ দুটি ১৯০৫ সালে কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে 'ন্যাশনাল স্কুল' স্থাপিত হয়, বঙ্গের হিন্দুমুসলমান বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সমর্থনে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' (National Council of Education)। অনুরূপভাবে ডাবলিন শহরে স্থাপিত হয় আইরিশদের নিজস্ব 'National University' (1908)। এর সঙ্গে উনবিংশ শতকে ১৮৩১ সালের বৃটিশ রাজ-শক্তির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত 'ন্যাশনাল স্কুলে'র মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আইরিশদের জোর করিয়া স্যাক্সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে সেই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। মনে রাখতে হবে উভয়েরই প্রতীক চিহ্ন এক।

৪০. থিয়েটারটি 'অ্যাবি স্ট্রীটে' ছিল বলে এর নাম হয় Abbey Theatre। ১৯০৪-এর ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এই রঙ্গমঞ্চের উদ্‌বোধন হয়।

৪১. রঙ্গমঞ্চ, পৌষ, ১৩০৯ (বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত) ১৯০২।

৪২. O'h AODHA, Michael, Theatre in Ireland, Oxford, 1974. তদ্‌সঙ্গে The Irish Dramatic Movement, Ed. by Una Ellis-Fermor, 1954. বইটি দেখতে অনুরোধ করি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৪৩. ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯। আরো বলেছেন—"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলে-মানুষি! লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ও গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার 'পর দাবি রাখে।" —'তপতী' নাটকের ভূমিকা। এর অনেক আগে 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটকে জানিয়েছিলেন 'চিত্রপট' অপেক্ষা 'চিত্তপট-এর গুরুত্ব।

৪৪. 'রঙ্গমঞ্চ', বিচিত্র প্রবন্ধ।

৪৫. 'রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব', রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু, পৃ. ৪।

৪৬. অনুবাদক শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। লণ্ডনের অ্যালবার্ট হলে আইরিশ অভিনেতারা অভিনয় করেন (১৯১৩)।

৪৭. O'h AODHA, Theatre in Ireland—

'As a tribute to Terence Macswiney, yeats rewrote the ending of 'The King's Threshold'.

৪৮. কবি য়েটস, পথের সঞ্চয়, ১৩১৯।

৪৯. শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী রচিত 'Rabindranath Tagore : A Biography' গ্রন্থে উৎকলিত (p.241) বিশ্বভারতী সংস্করণ।

৫০. Moore's Irish Melodies/London/Illustrated by Maclise R. A./Printed for Longman, Brown, Green, and Longmains/ Paternoster-Row/1846. বইটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এনেছিলেন বলে মনে হয়। এই বইটিকে 'Preface' অংশে 'This New Edition' বলা হয়েছে।

৫১. বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত। বইটিতে কয়েকটি গানের শিরোনামের পাশে রবীন্দ্রনাথের পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া আছে।

৫২. জীবনস্মৃতি, 'বাল্মীকি প্রতিভা' অধ্যায়, পৃ. ১০৬। কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮৩ কার্তিক) 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' কাব্য তিনখানির সমালোচনায় লেখেন—"আমাদের মতে Lalia Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য।"

৫৩. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, বিশ্বভারতী।

প্রণয়কুমার কুণ্ডু, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, দ্বিতীয় খন্ড, প্যাপিরাস।

৫৪. পল্লীর উন্নতি, ১৩২২, বৈশাখ।

৫৫. শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, ১৩৪৬ (১৯৩৯)।

৫৬. সমবায়নীতি, ১৩২৫, শ্রাবণ।

৫৭. রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৯।

"আয়র্ল্যান্ডে সার হরেশ প্লাঙ্কেট যখন সমবায় জীবিকা প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা, কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল ; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিরকম শুরু হয়েছে National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে।" —চরকা, কালান্তর, পৃ. ২৭১।

৫৮. ১৩৩৭।

৫৯. THE / NATIONAL BEING/some thoughts On An Irish Polity/By A.E./Munsel & Company Ltd./Dublin and London/ 1916. (রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বইটিতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাপ মারা। এর থেকে মনে হয় 'বিশ্বভারতী'র ছাপ পড়বার আগেই বইটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন) লেখক তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছিলেন To/The Right Honourable/Sir Horace Plunkett. A.E.-র অপর উল্লেখযোগ্য বই 'Co-operation and Nationality.

৬০. পত্র, ৯ আশ্বিন ১৩২৮ (27 Sept. 1921) 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত ১ পৌষ ১৩৬২ সংখ্যায়। এই পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পাল।

৬১. Modern Review, June, 1921.

৬২. পরবর্তী কালে 'দুর্বলে' কেটে করা হয় 'ধর্মেরে'।

৬৩. এই বক্তৃতাগুলি তাঁর 'Nationalism' গ্রন্থে সংকলিত। ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন রমাঁ রলাঁ।

৬৪. Seventy Years (1852-1922), Colyn Smythe, Gerrards cross, 1974.

৬৫. বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে বইটি সংরক্ষিত।

প্রকাশক: Wlliam Heineman, London 1911, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র ছাপমারা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্দেশিকা

অক্টেভিয়ান হিউম ১৯৮
অক্ষয়কুমার দত্ত ৫
অক্ষয়কুমার বড়াল ৫১, ৬৮, ৮৬
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ৩৪, ৭৭, ১৫৩
২০৮
'অচলায়তন' ১২১, ১৬৪, ১৭৯—
১৮৪
অদ্বৈতবাদ ৭
'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ১০৭
অনন্ত সিং ১৯২
অন্নপূর্ণা তরখড় (অ্যানা) ৯১—
৯৬, ১৫৬
অপ্সার প্রেম' ৯৩
অবনীন্দ্রনাথ ১৮, ১৯
অবিনাশ চক্রবর্তী ৭০
'অবোধবন্ধু' পত্রিকা ১৩৭
'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' ৯৭—৯৯
১০২, ১০৩
অমল হোম ১৭০, ১৮৩
অমৃতবাজার পত্রিকা ১৭১
অরবিন্দ ঘোষ ১৭৪, ১৭৬,
১৮৮—১৯১
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ১৭৭
'অলীকবাবু' ৬৩
'অশ্রুমতী' ৬২
আইজ্যাক্ বাট ১৮৮
আইরিশ ফ্রিডম ১৯০
'আইরিশ মেলোডীজ' ২০৮
আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড
১৯১
আইরিশ হোমরুল ১৮৭
আইরিশ হোমরুল অ্যাক্ট ১৯১
'আগমনী' (বার্ষিকী) ২০
আঁতোয়ান লিওনার দ্য শেজি ১০২
'আত্মচরিত' ১৫১
'আত্মজীবন চরিত' ১৫১
'আত্মজীবনী' (গিরিশচন্দ্র সেন
রচিত) ১৫১
'আত্মজীবনী' (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রচিত) ৮
'আত্মীয় সভা' ২
আনন্দমোহন বসু ৩, ৫
অ্যানাতোল ফ্রাঁস ৯৭
'আমার জীবন' (নবীন সেন রচিত)
১১৬, ১৫১
আমার জীবন' (রামসুন্দরী দাসী
রচিত) ১৫১
'আমার বাল্যকথা' ১৬, ১৩৭
'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'
১৪৭
'আমার সুখ' ৪৮
আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ১৮৯
আয়ার্স্ট ১৭০
'আরব্য উপন্যাস' ১৩৬
আর্থার গ্রিফিথস্ ১৯০, ১৯৪
'আর্য ও অনার্য' ১১৮
'আর্যদর্শন' ১০৪, ১০৫
আলবের্ট ৮৩
আলেকজাণ্ডার ডাফ ২
আলেকজান্দ্রা গার্লস নেটিভ
ইনস্টিটুশন ৯২
'আলোচনা' ৪১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশুতোষ চৌধুরী ৪৯, ৬৪, ৬৭, ৬৮
৭৭—৯০, ১৭১
আশুতোষ দেব ১১৩
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩, ৪৯,
২০০
অ্যানডারসন, জন (স্যর)
১৯৫, ১৯৬
অ্যানি চক্রবর্তী ৩৪
অ্যানি বেসান্ত ১৭৪, ১৭৭, ১৮৮
অ্যাবি থিয়েটার ২০৩
অ্যারিস্টটল ৪৪
অ্যাসকুইথ, এইচ. এইচ. ১৭১
ইউনাইটেড আইরিশম্যান' ১৯০
ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর ১৪১
ইণ্ডিয়ান ফেমিন কমিশন ১৯৮
ইন্দিরা দেবী ২৩, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭
৬৪, ১৩৪, ১৩৭, ১৫০, ১৬২
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭
ইবেটসন্ ১৭৭
'ইম্পীরিয়লিজম্' ১৪৩
'ইলবার্ট বিল' ১৯৯
ইস্টার বিদ্রোহ আয়ারল্যাণ্ড ১৯৩,
১৯৪
ঈশ্বর (ভৃত্য) ১৫৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১, ২, ৪, ৯৭,
৯৮, ১০১, ১০২, ১১২, ১১৩,
১৩৩, ১৫১
উইনস্টন চার্চিল ১৪১
উইলকিন্স ১, ১১২
উইলসন ১
উইলহেল্ম (দ্বিতীয় কাইজার) ১৪০
উইলি, কার্জন ১৮৯
উইলিয়ম কেরী ১১১
উইলিয়ম জোনস্ ১, ৯৮, ৯৯, ১১১
১১২
উইলিয়ম বাটলার য়েটস্ ১৯৩
উইলিয়ম রাথবোন ১৮৬
'উদাসিনী' ৭৭
উপনিষৎ ৬
উল্ফটোন ১৯০
'ঋণশোধ' ১৬৩
এডওয়ার্ড টমসন ৬৬
এডওয়ার্ড ড্যালি ১৯২
এডওয়ার্ড মার্টিন ২০৩, ২১৪
এডগার অ্যালান পো ৬৩, ৬৪, ৬৮,
৮০, ৮৬—৮৮
এণ্ডরুজ ১৬৯, ১৯৫, ২১৩
এমেট রবার্ট ১৮৮, ২০৮
এমোন ডি ভ্যালেরা ১৯৩
এলিজাবেথ ১৯৬
এশিয়াটিক সোসাইটি ৯৮, ১১১,
১১২
ও' কোনেল, ডানিয়েল ১৮৬, ১৯৬
ও' ডোনেল ১৮৭
'ওমর খৈয়াম' ৫১, ৬৯
'ওমার খ্যায়ামের রুবাই' ৭২-৭৬
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ২২, ৪৩, ৮০, ৮২
কটন, হেনরি ১৭৫
'কড়ি ও কোমল' ৬৭, ৭৮, ৮০, ৮৪,
৮৮, ১৫০
'কণ্ঠ বোধ' ১৭২
কনস্ট্যানস্ জর্জিয়ানা মার্কিয়েভিচ
১৯২, ১৯৩
'কাবকাহিনী' ৬৩, ৯৩
'কবি জীবনী' ১৪৯
'কমলাকান্তের দপ্তর' ১৩৩
(লর্ড) কর্ণওয়ালিশ ১৯০, ১৯৭
'কর্ণকুন্তী সংবাদ' ১২৯, ১৩০
'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ১২৬-১২৮, ১৮৮
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কলিনস্, মাইকেল ১৯৫
কল্পনা দত্ত ১৯৩
কাদম্বরী দেবী ১৯, ১৫৬
কানিংহাম ১৯৮
'কাব্য জগৎ' ৮০, ৮২, ৮৫
কার্জন, জর্জ ন্যাথানিয়েল ১৭৫, ১৭৭
কার্ডিন্যাল নিউম্যান ১০
কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ১৫১
কার্পেন্টার, মেরি ৯২
কার্লাইল ১১৪
'কালান্তর' ১৯৫
কালিদাস (মহাকবি) ৯৭, ৯৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১১২-১৪
কাশীদাসী মহাভারত ১১২, ১১৩
কাশীরাম দাস ১১১, ১৩৬
কিশোরী চাটুজ্জে ১৫৩
কিশোরী চাঁদ মিত্র ১৮৬
কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী ১১৩
কীটস্ ৮০, ৮৫
'কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা' ১৩১
'কুরুক্ষেত্র' ১১৬
কৃত্তিবাস ১০৭, ১১০, ১৩৬
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১০৬, ১১২, ১৫৮
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৩৩, ১৩৭
কৃষ্ণকৃপালনী ১৫৬
'কৃষ্ণ চরিত্র' ১১৪, ১১৫, ১২২
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১১৭
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১, ৪৯, ১১২, ১১৩
কেতকী কুশারী ডাইসন ২৩, ২৪
'কেলটিক রিভাইভ্যাল' ১৯৯
কেশবচন্দ্র সেন ৭, ৮, ৯২
'কেশরী' পত্রিকা ১৬৯, ১৭৩
কোঁত ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১৫৩
কোলব্রুক , ১১২
ক্যাথলিন নি হউলিহান ১৯৩
ক্যাপটেন কুক ৯৯
ক্যাভেনডিশ, ফ্রেডারিক ১৯৪
ক্রফোর্ড, জে. ১৮৫
ক্রমওয়েল, ১৯৬
ক্রুগার, পল ১৪০
ক্রোচে, বেনেদেত্তো ১১
ক্লাউস, (শ্রীমতী) ১০৩
'ক্ষণিকা' ৩৮, ৬৮
ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ৩৩
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৭৫
ক্ষুদিরাম ১৯০
ক্ষেত্রমোহন দত্ত ৩৩
খিলাফৎ আন্দোলন ১৬৮
'খেয়া' ৮২, ২০৫
'গণপতি উৎসব' ১৭৩
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৩
গণেশ ঘোষ ১৯২
গান্ধারীর আবেদন' ১২৯, ১৩১
গান্ধী (মহাত্মা) ৪, ১৩৯-১৪৬, ১৬৮, ১৬৯-১৭৭
গারনেট, রিচার্ড ৭৮
(মিঃ) গার্থ ১৭১
'গালিভার্স ট্রাভেলস' ১৩৭
গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫
'গীতা' ৬
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, ৪৩, ৭৯, ১৪৩, ২০০
গেলিক লীগ' ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৩
গোখেল, গোপালকৃষ্ণ ১৬৯
গোতিয়ে, থিওফিল ৪৩, ৪৪, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৮০, ৮৩, ৮৪
গোপালকৃষ্ণ গোখেল ১৬৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'গোরা' ২১, ১৬৫, ১৮৯
গোলডস্টুকর ২৯, ৩০
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ ২
গ্যেটে ৯৭, ৯৮, ১০০-১০৩, ১৫০, ১৫৫, ১৫৬
'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' ১৫৫
'গ্যেটে ও শীলার প্রক্রশালা' ১০৩
গ্রিফিথস, আর্থার ১৯৪
(লেডি) গ্রেগরি ২০০, ২০৩. ২১৩, ২১৪
গ্লাডস্টোন ১৩৯, ১৮৭
গ্লেজিয়ার ১৯৭
চন্দ্রনাথ বসু ৩৭, ৫০, ৫১, ১১৭
'চন্দ্রবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' ৫০
চন্দ্রমাধব ঘোষ ১৪৩
চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় ১৭০, ১৮৯
চার্চিল, উইনস্টন ১৪১
চার্লস ডিকেন্স ৩৯
চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল ১৯৮, ১৯৬
চিত্তরঞ্জন দাশ ৩৩, ১৭৭
'চিত্রা' ৪৭, ৬৭, ৮৮
'চিত্রাঙ্গদা' ৬৬
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৯৩, ১১৭
চেম্বর্স সাহেব ১৩৭
'চোখের বালি' ২১
(মিঃ) চ্যাপম্যান ১০
'ছবি ও 'গান' ১৫৫
'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' ২০২
'ছেলেবেলা' ২৫, ৯১
'ছোট ও বড়' ১২৮
জগদীশচন্দ্র বসু ৭—২৯, ৭০
জন অ্যানডারসন্ ১৯৫, ১৯৬
জন ব্রাইট ১৮৭
জন ম্যাকব্রাইড ১৯২
জন স্টুয়ার্ট মিল ১৫১, ১৫৩
জয়গোপাল তর্কালংকার ১১২
জর্জ উইলিয়ম রাসেল ১৯৩, ২০৯, ২১১
জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন ১৭৫
জর্জ ম্যুর ২০৭, ২১৪
জর্জ লয়েড ১৯৫
'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' ২০০
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ১, ৫১, ৭৯
'জিল ব্লা' ১৩৭
'জীবন উৎসর্গ' ২০৮
'জীবন স্মৃতি' ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৩, ৩১, ৪০, ৬৫, ৭৭, ৯১, ১৩৬—১৩৮, ১৪৭—১৫৬, ১৬২, ২০৮
'জুরী অ্যাক্ট' ১৮৫
জে. এন. রায় ৩৩
জে. পিটার ফিশার (প্রকাশক) ৯৯
জে. রবিন্সন্ ১৩৮
জেমস্ কনোলি ১৯২
জোগ ১৭৮
জোন্স্ উইলিয়ম ১, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১১১
'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' ৫, ৬
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৭, ২৩, ২৪, ৩৩, ১৫৯
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৪, ৬১—৬৩, ৭৭, ৯৩, ১৫৫
টমসন, এডওয়ার্ড ৬৬
টমাস কেন্ট ১৯২
টমাস ব্রাউন ২৬
টমাস ম্যুর ২০৭, ২০৮
টিলক, বালগঙ্গাধর ১৬৭—১৭৮, ১৮৮, ১৯০
টেনডুলকর ১৪১
টেরেন্স ম্যাকস্যুইনি ২০৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডগ্‌লাস হাইড ১৯৯
ডন কুইকসোট ১৩২—১৩৮
'ডাকঘর' ১৬৫, ১৭৭, ২০৬
ড্যানিয়েল ও' কোনেল ১৮৬, ১৯৬
ডাফরিন ১৯৭, ১৯৮
ডাফো (ড্যানিয়েল) ১৩৭
ডি. এল. রিচার্ডসন ৭৮
ডিকেন্‌স চার্লস ৩১
ডিরোজিও ১
ডেভিড হেয়ার ২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৩, ৪
'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' ২, ৩
তত্ত্ববোধিনী সভা ২, ৩, ১০
'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' ২
'তপতী' ২০৬
'তরুণ বৎসরের ফুল' ১০১
তারকনাথ তর্কবাচস্পতি ১১১—১১৩
তারকনাথ পালিত ২৪, ২৫, ৩১—৩৩, ৩৫, ১৭১
'তারকার আত্মহত্যা' ৪৯
তুলসীদাস ১০৭
থিয়োডোর পার্কার ১০
থাকিদদাস ১১৪
থ্যাকার স্পিংক ৬৫
দাদাভাই নওরোজি ১৭৬
দাদোবা পাণ্ডুরঙ তড়খড় ৯১
'দি আইরিশ পিপল্‌' ১৮৯
দি আইরিশ ভলানটিয়ার্স ১৯১
'দি আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড' ১৯০
'দি ইংলিশম্যান' ১৪২
'দি ঈগল' ৭৮
'দি ফেনিয়ান ব্রাদারহুড' ১৮৯
'দি হিস্‌ট্রি অব আইরিশ লিটারেচার' ২০০
দিকশূন্য ভট্টাচার্য ৯৪, ১৫৬
'দিবাকমল' ২১
'দিব্যাবদানমালা' ১৭৯
দিলীপকুমার রায় ২৬, ৯১, ১৫৬
দীনেশচন্দ্র সেন ২০০, ২০১
'দুঃখ' ১২৮
'দু' দিন' ৯৪
দুর্গাদাস চৌধুরী ৭৮
দেউস্কর, সখারাম গণেশ ১৭৪
দেকার্তে ৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১—১৬, ২০, ৪৯, ১১২, ১১৩, ১২০, ১২৬, ১৫০, ১৫১, ১৫৩
দেবেন্দ্রনাথ সেন ৮৬, ৮৮
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ৯৬
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৫, ১৭৬, ১৮৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ৩৪, ৬১, ৯৩, ১২২, ১২৬, ১৫৩
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩৯, ৪০, ৪৮, ৬৫, ৬৬, ৯১, ১৪৯
'ধর্মতত্ত্ব' ১১৫, ১১৬
'ধর্মের অধিকার' ১২৬, ১২৭
'ধর্মের সরল আদর্শ' ১২৮
'ধুলামন্দির' ১৮২
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২১২
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬৫
নন্দগোপাল পণ্ডিত ১১১
নবগোপাল মিত্র ১৩, ১৫৩
'নবজাগরণ' ১
'নবজীবন' ১১৭
'নববর্ষ' ১৪৩
'নববর্ষের গান' ২০৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নবীনচন্দ্র সেন ১১৬, ১১৭, ১২৩
১২৬, ১৫১
'সব্যভারত' ১৪
'নরকবাস' ১২৯
নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (রাজা) ১৪৩
নরেন্দ্রনাথ সেন ১৪৩
নাটু ভ্রাতৃদ্বয় ১৭০, ১৭৩
নিউম্যান, কার্ডিনাল ১০, ৬৫
(সিস্টার) নিবেদিতা ১৮৯
নিমাইচাঁদ শিরোমণি ১১১, ১১২
'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ৮৪
'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ১৫৫
নির্মলকান্ত রায় ৩৩
'নিশীথে' ৮৮
'নিষ্ফল কামনা' ৪৯
'নীড় ও আকাশ' ৮২
'নূতন ও পুরাতন' ১৮৩
নেহেরু ১৪৬
নৃপেন ঘোষ ৩৩
'নৈবেদ্য' ১১, ১৩১, ১৪৪, ২১৩
ন্যাথানিয়েল, জর্জ ১৭৫
ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন
৫১
ন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটি ২০৩
ন্যাশনাল লীগ ১৭৭
'পকেট বুক' ৩৭
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
'পথ ও পাথেয়' ১৪৪, ১৯৪
'পথপ্রান্তে' ১৫৪
'পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য' ২০৭
'পরিণত বৎসরের ফল' ১০১
পল ক্রুগার ১৪:
পাওয়েল, বেডেন ১৪২
'পারস্য উপন্যাস' ১৩৬
পার্কার, থিয়োডোর ১০
পার্নেল, চার্লস স্টুয়ার্ট ১৮৮, ১৯৬
(মিঃ) পিউ ১৭১
'পিতৃস্মৃতি' ১৩
পিয়ার্সন ১৬৯, ২১২, ২১৩
'পুনর্বসন্ত' ৬১
'পুনশ্চ' ১৩৪
'পুরস্কার' ১৩১, ১৫৭
'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ২০১
'পৃথিবী' ৫
পেত্রার্ক ৬৮
পেনেরাণ্ডা ১৫৩
'পো, এডগার অ্যালেন ৬৩, ৬৪, ৬৮
৮০, ৮৬—৮৮
'পোলভর্জিনি' (পোলভর্জীনী) ১৩৭
প্যাট্রিক পিয়ার্স ১৯২
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৪৩
'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ১০৮, ১৫৯—
১৬১
'প্রচার' ১১৭
প্রণয়কুমার কুণ্ডু ২০৮
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৯২, ৯৩, ১৪৩
প্রতাপচন্দ্র রায় ১১৩
'প্রতাপাদিত্য' ১৭৫
'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ১৭৫
'প্রতিনিধি' ১৭৩
প্রতিভাদেবী ৭৮, ৭৯, ১০৪
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৮৮, ১৭১
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ১৪৩
(আচার্য) প্রফুল্লচন্দ্র ২৬
প্রফুল্লময়ী দেবী ১৭
'প্রবাসী' ১২২, ১৫২
প্রবোধচন্দ্র সেন ১৬৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫, ৩৪
৯৩, ১৬৮, ২১০
'প্রভাত সংগীত' ১৫৫, ১৬১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'প্রভাস' ১১৬
প্রমথ চৌধুরী ৩৬, ৬৬, ৮৯, ১২১, ১৩৪
প্রমথনাথ বসু ২০১
প্রমথনাথ বিশী ১৬৮
প্রশান্ত পাল ২০৮
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ১৩৮
'প্রাচীন সাহিত্য' ৯৭
'প্রায়শ্চিত্ত' ১৬৭—১৬৯, ১৭৫
'প্রার্থনা' ১২৮
'প্রার্থনা-সমাজ' ৯২
প্রিন্সেপ ১, ১১২
প্রিয়নাথ সেন ৩৩, ৩৪, ৩৭—৩৯, ৫১, ৬১—৭৭, ৮৪, ১১৮, ১৩৮, ১৫০
'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' ৭১
প্রীতিলতা ওহদেদার ১৯৩
'প্রেমের অভিষেক' ৪৭, ৪৮
প্লাঙ্কেট, হরেস ২০৯, ২১০ ২১৩
ফজলুল হক ১৮৭
ফরস্টর ৯৯, ১০২, ১০৩
ফরাসি বিপ্লব ১৮৯
'ফুলের ধ্যান' ৯৩
ফেনিয়ান দল ১৮৯
ফেনিয়ান বিদ্রোহ ১৮৮
ফেনেলাঁ, ফেনেলন ৭
ফ্যানি কেম্বল ১০২
ফ্রান্সিস্ ডিক ১৮৯
ফ্রাঁস, আনাতোল ৯৭
ফ্রেডারিক ক্যাভেনডিশ্ ১৯৪
ফ্রেডারিক লিস্ট ১৯০
ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ১৮৭
'বউঠাকুরানীর হাট' ১৬৫, ১৬৮, ১৭৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১, ৩, ৪, ৬, ৪৯, ১১৪—১১৭, ১২৬, ১৩৩, ১৫২, ১৫৩, ১৯৭, ২০০
'বঙ্গদর্শন' ৩ ৯৮, ১৪৪, ১৭৪
'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) ৯৭
'বঙ্গবাস' ১১৭
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৭৯, ১৭৫
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ২০১
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ৪, ১৩৭
'বঙ্গভাষাভিধান' ২
'বঙ্গভাষার লেখক' ১৪৯
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী ৩
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২০০, ২০১
'বন্দেমাতরম' পত্রিকা ১৭৬
বয়েজ স্কাউট ১৪২
বরকতউল্লাহ ১৯১
বর্ধমানী—মহাভারত ১১৩
'বহু বিবাহ' ১৩৩
'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' ২১৯
বামাবোধিনী' পত্রিকা ৯৬
বায়রণ ৮০, ১৫৩, ২০৭
(মিঃ) বার্ক ১৯৪
বার্কলে, হেনরী ১৩৯
বার্ণস ৮৬
বার্ণাড শ ১৪১
'বালক' পত্রিকা ১২৬, ১৫৯, ১৬১
বালগঙ্গাধর টিলক ১৬৭—১৭৮, ১৮৮, ১৯০
বাল্মীকি ১০৪—১১০
'বাল্মীকি প্রতিভা' ৭৯, ১০৪, ১০৬, ১১০, ১৫৮, ১৬০, ১৬১
বাল্মীকি রামায়ণ ১১৪
'বিচ্ছেদ' ২০৮
(মিঃ) বিটসন ১০
'বিদায়' ৪৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' ১২০
'বিব্বজন সভা' ১০৪
বিনয় চৌধুরী ১৯৯
বিপিনচন্দ্র পাল ১৭৪, ১৭৭
বিপিন [illegible]হারী গুপ্ত ১৩৩
'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ১৩৬
(স্বামী) বিবেকানন্দ ১৮৯
'বিবেচনা ও অবিবেচনা' ১২১
'বিরোধমূলক আদর্শ' ১২৮
'বিশ্বপরিচয়' ৫
বিশ্বভারতী ৪, ১৯৬, ২১১
বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি ১২২
বিসমার্ক ১৪০
'বিসর্জন ১০৮, ১৬০, ১৬১
বিহারীলাল গুপ্ত ২৮, ৩০
বিহারীলাল চক্রবর্তী ৩৯, ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৭০, ১০৪—১০৬, ১১০, ১৫৩, ১৫৮
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮১
বুদ্ধদেব ১১৫
বুদ্ধদেব বসু ৮৪
বুয়র যুদ্ধ ১৩৯—১[illegible]৬, ১৬৮
বুলার ১৪২
বেকন ১৩৭
বেঙ্গল টেনানসি অ্যাক্ট ১৯৮
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স ৭৯
বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন ৭৯
বেডেন পাওয়েল ১৪২
'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১৩৬
বেদ ৬
বেনেদেত্তো ক্রোচে ১১
বেন্থাম ১১৫, ১৫৩
বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৭৭
বোদলেয়র ৬১, ৬৪, ৮৩, ৮৬, ৮৭
'বোম্বাই প্রবাস' ৯২
'ব্যাধি ও প্রতিকার' ১২০
ব্যাস—মহাভারত ১১৩, ১১৪
ব্রজেন্দ্রকিশোর ৩
'ব্রহ্মচর্য-আশ্রম বিদ্যালয়' ৩, ১১, ১৬২
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৭৬, ১৮৯
ব্রাউন, টমাস ২৬
ব্রাহ্মধর্ম ৬
ব্রাহ্মসমাজ ৯২
ব্রিটিশ মিউজিয়ম ৬৮, ৭৮
ব্রুনেলেস্কি ৮৩
'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান্স' ১৯৫
ভগ্নহৃদয়' ৬৩
ভারতচন্দ্র ৬৬
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৮
'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ১২২, ১৮১
'ভারতী' ৩৮, ৪০, ৬[illegible], ৮৩, ৮৪, ৯৩, ৯৪, ১৪৭, ২০১, ২০৮
ভারতী বালক ১৬২
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৮
'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' ১৮৭
'ভাষা ও ছন্দ' ১০৮—১১[illegible]
ভিক্তর হুগো [illegible]৪, ৮৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১
ভ্যালোনটাইন চিরোল ১৭৮
ভ্যালোরা, এমোন. ডি. ১৯৩, ১৯৪
'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ১৪৭
মডার্ন রিভিউ' ১২২
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৭
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৪৩
মতিলাল ঘোষ ১৭১, ১৭৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মদনমোহন মালব্য ১৭৭
মদনলাল ধীংড়া ১৮৯
মধুসূদন দত্ত ১২, ৬৩, ৬৪, ৬৮, ২০৭
মনিয়র উইলিয়ম্‌স ৯৯, ১০০, ১০২
'মনু সংহিতা' ৬, ১২৭
(মিসেস, মরলি) ৩০
মরলি, হেনরি ২৫—৩২, ১৭৭
মরিস ৬৭
'মস্কো আর্ট থিয়েটার' ২০৩
মহাভারত ৬, ১১১—১৩১
মহিম ঠাকুর ৩
মহেন্দ্রপ্রতাপ ১৯১
মহেন্দ্রলাল সরকার ৫
মাইকেল কলিন্‌স ১৯৫
মাতৃব দনা' ২০
মাধব কন্দলী ১০৭
মাধবগোবিন্দ রাণাডে ৯২
মাধুরীলতা (বেলা) ৩৯, ৬৪, ৬৮, ৭০
'মানব প্রকাশ' ৪৬, ৪৭
'মানস সুন্দরী' ৮৪
'মানসী' ৪৯, ৬৬, ৬৭
মানেকজী করসদজী ৯২
'মায়ার খেলা' ৩
মার্কিয়েভিচ, কনস্‌ট্যানস্‌ জর্জিয়ানা ১৯২, ১৯৩
মার্গারেট নোবল ১৮৯
মার্টিন, এডওয়ার্ড ২০৩, ২১৪
'মালতী পুঁথি' ৯৩
'মালিনী' ১৭৯
'মিরাৎ-উল-আখবার' ১৮৫
মিল,জন স্টুয়ার্ট ১১৫, ১৫১, ১৫৩
মিলটন ২৬, ৮০, ৮২, ৮৩, ১৫৩
মীরাদেবী ৩৪
'মুক্তধারা' ১০৮, ১৬৪
'মুদ্রারাক্ষস' ৬২
মুর্শিদকুলি খাঁ ১৩৭
মুলকাহাই, রিচার্ড ১৯৫
মৃণালিনী দেবী ১৬৩
মেকলে ১১৪
'মেঘদূত ১৪
'মেঘনাদ বধ কাব্য' ১২
'মেদিনা ফিলাস' ২২—২৪
মেবল দত্ত ৩৩
মেরি কার্পেণ্টার ৯২
মোহিত সেন ১৬২
'মৈমনসিং গীতিকা' ২০১
'মৌনভাষা' ৪৮
ম্যাক্‌ফার্‌সন ২০১
ম্যাক্সমুলার ৩০
ম্যাকস্যুইনি, টেরেন্স ২০৬
ম্যুর, জর্জ ২০৭, ২১৪
যতীন দাস ২০৬
যতীন মুখার্জি ('বাঘা যতীন') ১৯২
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৪৩
যদুনাথ সরকার ১২২
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯১
যীশুখ্রীষ্ট ১১৪
যোগেশচন্দ্র বসু ১১৭
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ১৭১
যোগেশচন্দ্র দত্ত ২৮
'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ২২—২৪
'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' ৩৬, ১১৮
য়েটস, উইলিয়ম বাটলার ১৯৩, ২০০ ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭
'রক্তকরবী' ৪
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৭
রজার ক্লেজমেণ্ট ১৯১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬
রবার্ট এমেট ১৮৮
রবিনসন ক্রুশো ১৩২—১৩৮
রবিনসন, জে ১৩৮
'রবীন্দ্রজীবনী ২৩
রমেশচন্দ্র দত্ত ১, ৪, ২৮—৩০, ১৪২
১৮৭, ১৯৭, ২০১
'রয়্যাল আইরিশ কনস্ট্যেবুলারী'
১৯৫
রসেটি ৬৭
রসার ৮২
'রাখীবন্ধন' উৎসব ১৭৫
রাজর্ষি ১০৮, ১২৬, ১৫৯—১৬২
রাজনারায়ণ বসু ৩, ৪, ৭, ১২, ১৩,
১৫১
'রাজাপ্রজা' ১৪৪
'রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন-
চরিত' ১৩৬
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১, ১১২, ১১৩
১৫৩, ১৭৯
র‍্যাথবোন, উইলিয়াম ১৮৬
রাধাকান্ত (দেব) ৯৯, ১১২
রাধাচরণ পাল ১৪৩
রামকৃষ্ণ পরমহংস ৮
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ২
রামনারায়ণ চৌধুরী ১৫
রামমোহন রায় ১, ২, ৬, ১০২,
১১২, ১১৩, ১১৮, ১৮৫, ১৮৬
'রামমোহন রায়' (প্রবন্ধ) ১.৮
রামলোচন ৯৯
রামহরি ন্যায়পঞ্চানন ১১২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৬০, ১৪৯
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১, ২, ৫,
১২০, ১৭১, ১৭৫
রাসবিহারী ঘোষ ১৯০
রাসবিহারী বসু ১৯০
রাসসুন্দরী দাসী ১৫১
রাসেল, জর্জ উইলিয়ম ১৯৩, ২০৯
২১১
রিচার্ড গারনেট ৭৮
রিচার্ড মুলকাহাই ১৯৫
রিচার্ডসন, ডি. এল. ৭৮, ১৩৭
রিপন ১৯৯
'রিফর্ম বিল' ১৮৬
'রুদ্ধগৃহ' ১৫৪
'রুদ্রচণ্ড' ৬৩
'রুবাই/রুবায়াৎ' ৫১—৫৫, ৬৯
রুশো ১১৬
'রৈবতক' ১১৬
রোডস, সেসিল ১৪০, ১৪৩, ১৪৪
(মিঃ) র‍্যাণ্ড ১৭০
র‍্যাবো ৮৪
লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি ২৬
লঙ, জেমস্ ৪
লব্ সাহেব ১৩
লয়েড জর্জ ১৯৯
লা-মার্টিন ১৪৪
লালবিহারী দে (রেভাঃ ৪, ৪৯
লাসিংটন, ই. এইচ, ৪
(লর্ড) লিটন ১৮৭
লিটলডেজ, হ্যারলড ৯৪, ৯৬
লিভিংস্টোন ১৪০
লুবেক' ১৯১
লেনিন ১৯৩
লোকনাথ বল ১৯২
'লোকমাতা নিবেদিতা' ১৮৯
লোকেন্দ্রনাথ পালিত ২৪, ২৭, ৩১,
৩২—৬০, ৬৯, ৭৭, ৮৪, ৯৩
ল্যসাজ ১০৩
ল্যাণ্ড পারচেজ বিল ১৯৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ, বার্নার্ড ১৪১
শকুন্তলা ৯৭—১০৩
'শক্তিপূজা' ১২৬, ১২৭
শঙ্করাচার্য ৭
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১১১
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী/শরৎ চক্রবর্তী ৩৯, ৬৯, ৭০
শরৎ কুমার রায় ১৭৪
শশধর তর্কচূড়ামণি ৫০, ১১৭
শান্তিদেব ঘোষ ২০৮
'শান্তিনিকেতন' ১১
'শারদোৎসব' ১৬৩, ১৬৪, ২০৫, ২০৬
'শিক্ষা সংস্কার' ২০২
'শিক্ষার মিলন' ৪
'শিক্ষার হেরফের' ২০০, ২০২
শিবনাথ শাস্ত্রী ৫
'শিবাজী উৎসব' ১৭৩—১৭৫
'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' ১২৭, ১৭৪
'শিবাজীর দীক্ষা' ১৭৪
শিশিরকুমার ঘোষ ১৭১
'শিশু' ১৬২
'শিশুতীর্থ' ১৬৬
শীলার ৯৯
'শুন নলিনী' ৯১
শেক্সপীয়র ২৬, ৪১, ৪২, ৮০, ১৫৩
শেখ সাদী ১৮৫
শেলি/শেলী ৮, ৮২
'শেষ উপহার' ৪৮
শ্রীকণ্ঠ সিংহ ১৫৩
শ্রীনিকেতন ২১১
'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ১১৪, ১২৭
শ্রীরামপুর প্রেস ১১১, ১১২
'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ৯৮
সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৭৪
সত্যপ্রসাদ (সত্যপ্রকাশ) গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫, ৬৩, ৭৭
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা) ১৬, ২২—২৪, ২৮, ৩২—৩৪, ৪৮, ৬১' ৬৭, ৯১, ৯৩, ৯৪, ১৩৭, ১৪৭, ১৫৯, ১৬২
'সত্যের আহ্বান' ১২৬, ১২৭
'সন্ধ্যা' ৪৮
'সন্ধ্যা' পত্রিকা ১৮৯
'সন্ধ্যা সংগীত' ৪৯, ৬৩, ৬৪, ৭৭, ১৫২, ১৫৫
'সবুজপত্র' ১২১
সভ্যতার সংকট ' ১২৮
'সমাচার-দর্পণ' ১১২
সমাজভেদ' ১৪৪
সরলাদেবী ৩৮, ৪০, ৫১, ১৭৪
সরোজিনী নাইডু ১৯১
'সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা' ২
'সাধনা' পত্রিকা ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ১১৭
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ৪
সারদা দেবী (জননী) ১৫—২১
'সারদামঙ্গল' ১০৪, ১০৫, ১৫৮
সারভ্যানটিস্ ১৩২—১৩৪
'সার্বজনিক সভা' ১৭৮
'সাহিত্য' (গ্রন্থ) ১১৯
'সাহিত্য' (পত্রিকা) ৫০, ৫১, ৬৮, ৭৬, ১৫২
'সাহিত্যে নব্য লয়তত্ত্ব' ৫০
'সাহিত্যের পথে' ১৩৪
'সাহিত্যের প্রাণ' ৪৪
'সিডিশন বিল' ১৭২, ১৭৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'সিন্ধুপারে' ৮৮
'সিন ফিন' ১৮৯—১৯১, ১৯৪, ১৯৯
সীতারাম ঘোষ ৫
'সীতারাম' ৮০
সীতারাম রায় ১৪৩
সীলি ১১৫
সুইনবর্ণ ৬৭
সুইফ্‌ট ১৩৭
সুকুমার সেন ২ ৫
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩, ৬৯, ১৬২, ১৭১
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮, ৩০, ১৭৫, ১৭৬
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ২০, ১৫২
'সুশীলার উপাখ্যান' ১৩৬
সূর্য সেন ১৯২
সেসিল রোডস ১৪০, ১৪৩, ১৯৪
সৈয়দ আমীর হোসেন ১৪৩
'সোনার তরী' ৮৪, ১৫৭
সৌদামিনী দেবী ১৩, ১৬, ১৯
স্কট ২০৭
স্কুল বুক সোসাইটি ১৩৮
স্টান্‌লি ১৪০
স্টিফেনস ১৮৯
স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকা ১৭৬
স্পেনসার ৮২, ১১৫
স্বদেশী আন্দোলন ১
স্বদেশী সমাজ' ১৩, ২০৯
স্বরচিত জীবনচরিত, ১৫১
স্বর্ণকুমারী দেবী ৫, ১৫, ২১, ৩৭, ১৪৭
স্বাদেশিকতা' ১৩
স্বাধীন ভারত কমিটি' ১৯১
(মিঃ) স্যামুয়েল ১০
হথর্ণ ৬৩, ৬৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৪, ৯৮, ১০১ ১০২, ১৪৩
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৪৯
হরিনাম গোয়েঙ্কা ১৪৩
হরিশ্চন্দ্র শর্মা ১৩৮
হরেস্‌ প্লাংকেট (স্যর) ২০৯, ২১০, ২১৩
হাইড, ডগলাস ১৯৯—২০১
'হারামণি' ২০১
হার্ডার ৯৯, ১০০
'হিং টিং ছট্‌' ১১৭
হিউম, অক্‌টেভিয়ান ১৯৮
'হিজলী ও চট্টগ্রাম' ১৯৪
হিন্দু কলেজ ১
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১২০
হিন্দুমেলা ১৩
হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ৪
হিবার্ট বক্তৃতা ১৩৫
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৭, ৪৯, ১৭০ ১৭৪, ১৭৭
হুগো, ভিক্‌তর ৮৪—৮৬
হুগো, হিউগো ৬৪
'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১১৩
হেনরি কটন ১৭৫
হেনরি মরলি ২৫—৩২, ১৭৭
হেনরী বার্কলে ১৩৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩, ৬৪
হেমচন্দ্র বসু মল্লিক ১৭০
হেমলতা দেবী ১৬২
হেমেন্দ্রনাথ ৭৮
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ৬৮
হেয়ার, ডেভিড ২
'হোমরুল অ্যাসোসিয়েসন' ১৮৮
'হোমরুল কনফেডারেশন' ১৮৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'হোমরুল বিল' ১৯৫
হোমরুল লীগ ১৬৭, ১৭৭
'হ্যামলেট' ৪১
হ্যাগার গ্রেন ১২০
হ্যারলড লিটলডেল ৯৪, ৯৬
হ্যালাম টেনিসন ১৫০
সংকলক : প্রদীপ চৌধুরী

A. E. (George william Russell) ১৯৩, ২০৭, ২১০, ২১১, ২১২ ২১৩
A Plea for a National Theatre in Ireland ২০৩
A Vision of India's History ১২২, ১২৩
(Mr.) Alger ১৪২
Amiel's Journal ৩৬, ৩৭
Annelise Clauss ১০৩
Archydae ১৯৭
Aristotle ১৩২
Assembly of Ireland ১৯৪
Aus meinem Lebeu : 'Dichtung und wahrheit' ১৫০
(Mr) Banerjea ৩৫
Bel Ami ৮৯
Bengal Hurkaru ১৩৭
Bengal Tenancy Hct of 1885 ১৯৭
Black and Tans ১৯৫
Boer War ১৯৯
Brighton Proprietory School for Boys' ২৪
Buller ১৪২
Capon, P. ২৪
Casement, Roger ১৯১
Catholic Emancipation ১৯৫, ১৯৬
Cervantes ১৩৪
Chezy, A. L. ১০২
Cicero ১৩২
Clauss, Anneliese ১০৩
'Confessions' ১৫৬
Constance Georgina Markievicz ১৯৩
Cotton, Henry ১৮৭
Datta, R. C. ৩৭
Daudet ৮৯
Deak, Francis ১৮৯
'Deutsche Monatss-chrift ১০০
Devendranath Tagore ১২
'Don Quixote de la Mancha' ১৩২, ১৩৩, ১৩৪
Dauglas Hyde ১৯৯
Dutt, Mabel ৩৩
Dwarakanath Tagore ১৮৬
Fenelon ৮৯
Flaubert ৮৯
Francis Deak ১.৯
'Fruitless Cry' ৫৮-৬০
Gaelic League ১৯৯
Gandhiji ১৪১
Garcin de Tassy ১০২
Gautier ৮৯
'Gil Blas de Sant Ilane' ১৩৩
Gokhale ১৮৭
'Golden Book of Tagore' ৬০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Guy de Maupassant ৮৯
'Hail and Farewell' ২১৪
Hammergren, Karl ১২০
Heimo Rou ১০১
Henry Cotton ১৮৭
Henry Morley ২৬
Hugo, Victor ৮৯
Hume ১৮৭
Hurkaru Library ১৩৭
Hyde, Douglas ১৯৯
Indian Association for the Cultivation of Scicnce ৫
'Indian Unrest' ১৭৮
'Indu Prakash' ১৭৪
Irish Coercion Act ১৮৭
Irish Coercion Bill ১৮৬
Irish Emigration and the Tenure of Land in Ireland ১৯৮
'Irish Melodies' ২০৭
Isaac Butt ১৮৮
'Italian Travels' ১০৩
'Jesus Christ : Europe & Asia' ৮
John Morley ১৮৭
Journal of Indian Association ৯৪
'Julius Ceasar' ৬২
Jyotirindranath Tagore ৬২
Karl Hammergren ১২০
King Henry II ২০১, ২০২
Kruger ১৪৩
LA RECONNISSANCE/ DE/SACOUNTAL / DRAME SANSCRIT ET/ PRACRIT DE CALIDASA/PARIS 1830 ১০২
Land League ১৯৭
Le Sage ১৩৩
List, Frederick ১৯০
Lobb ১৩
London Missionary Society ১৪০
Loti ৮৯
'Madame Bovary' ৮৯
'Mademoiselle de Maupin' ৮৯
'Markievicx, Constance Georgina ৯৩
'Marriage de Loti' ৮৯
Maupassant ৮৯
'Medina Villas' ২২
Modern Review ৫৭
Morley, Henry ২৬
Morley, John ১৮৭
Mulkahay, Richard ১৯৫
'My Interpretation of Indian History' ১২২
Natianal Literary Society ২০০
National University ১৮৮
'Nepalese Buddhist 'Literature' ১৭৯
O' Connell, D. ১৮৬
O' Donnel ১৮৭
'Poetry and Truth : From my own Life' ১৫০, ১৫৫
'Practical Swaraj' ২১২
Press Act ১৮৭
R. C. Datta ৩৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'Rabindranath Tagore : a Biography' ৬:
Rent Bill ১৯৮
Rent Law Commission ১৯৮
'Robinson Crusoe' ১৩৫, ১৩৮
'Sacontala/or/The Fatal Ring' ৯৯
St. Andrews Library ১৩৭
St. Basil ১৩২
'Sakontala' ১০১, ১০৩
'Sakoontala' ১০০
Sangit Samaj ৬২
Sappho ৮৯
Secret Press Committee ১৭১
'Seventy years' ২১৪
Shelly ৮১
'Six Months in India' ৯২
Society for the Promotion of Technical Education ৫১
'Sorrows of young Werther' ১৫৫
'Spectator' ৯৪
'Tattabodhini Patrika' ৪
'Telemaque' ৮৯
'Thalia' ৯৯
The Bengalee ১৮৮
The Celtic Revival ১৯৯
'The Death of a Star' ৫৬, ৫৭
The Ihterment of Mrs. Besant ১৮৮
The Iris Agriculture Organisation Society ২১০
'The Irish Citizen' ২০৭
The Irish Renaissance' ১৯৯
'The Irish Statesman' ২১২
'The King's Threshold' ২০৬
The Mental Seclusion of India' ৯৪
'The National Being' ২১১ ২১২, ২১৪
'The Post Office' ২০৬
The Republic of Ireland ১৯৪
The Tenancy Act of 1859 ১৯৭
'The Untilled Field, ২১৪
'Three years in Europe' ২৮
'To a Skylark' ৮১
'To the Skylark' ৮১
'Travels in Italy' ১০২
'Truth and Poetry : From My Own Life' ১৫০, ১৫৫
University College, South Wales and Monmouth, Cardiff ৯৬
Valentine Chirol ১৭৮
Vernacular Literature Society ১৩৭
Victor Hugo ৮৯
Wordsworth ৮১
Yeats, W. B. ১০১

CC-7008
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC7008

GURUKUL KANGRI LIBRARY
Accession
Class on
Cat on
Tag etc.
Checked
Any Other

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য এপার বাংলা ওপার বাংলার শিক্ষা জগতে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর বৈদগ্ধ্য বাংলাভাষা-ভাষীদের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃততর হয়েছে। অধ্যাপনা কার্যে, প্রশাসনিক দক্ষতায়, ব্যক্তিত্বময় সমালোচনায় তিনি তাঁর কালে লব্ধ-কীর্তি। গ্রন্থ সম্পাদনার কাজেও অধ্যাপক ভট্টাচার্যের খ্যাতি প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রজীবনের নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল বহুধা-বিস্তৃত। তাঁর জিজ্ঞাসু ও প্রশ্নচারী মনের উজ্জ্বল দীপ্তি বিধৃত রয়েছে বর্তমান গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-চর্যা'য়।

বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার সেরপুর শহরে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতৃভূমি যশোহর জেলার ভুগিলহাট গ্রাম। খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেছেন। সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অধ্যাপনা ক্ষেত্র। ১৯৭৯-৮২ তিনবছর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করে পুনরায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ফিরে এসেছেন। অধ্যাপনার জগৎই তাঁর কাম্য ক্ষেত্র।

চল্লিশ টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar